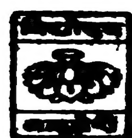
বঙ্কিম-বরণ

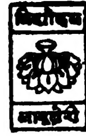


মোহিতলাল মজুমদার

বঙ্কিম-বরণ



বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটে



নূতন একটি প্রবন্ধ সংযোজিত



২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৭০০০০৯

১৬ কার্তিক ১৩৫৬

BANKIM-BARAN
by
MOHITLAL MAJUMDAR

Paper used for the printing of this book was made available by the Government of India at concessional rates.

মূল্য
পনেরো টাকা

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস, ১৭ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত ॥

শ্রীমান্ মথুরেন্দ্রনাথ নন্দী
কল্যাণীয়েষু

গ্রন্থকারের নিবেদন

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমি এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু লিখিয়াছি সেই সব প্রবন্ধ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা এই গ্রন্থে একত্র সংগ্রহ করিয়া দিলাম; ইহার দুই-একটি ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত বা গ্রন্থিত হয় নাই। এইরূপ সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল; বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমার নানাবিধ আলোচনা এমনভাবে ছড়াইয়া আছে যে, সকলের পক্ষে তাহা এককালে পাঠ করা সহজসাধ্য নয়, অথচ সেই আলোচনার সকল দিক এক সঙ্গে না দেখিলেও আমার বঙ্কিম-পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে না। তাই আমি এইরূপ একটি সংগ্রহ অত্যাবশ্যক মনে করিয়াছি।

এই পুস্তকের নামকরণের একটু তাৎপর্য্য আছে। 'বঙ্কিম-বরণ' নামটির সার্থকতা এই যে, আমি এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাকে নানা প্রসঙ্গে ও নানা উপলক্ষে বরণ করিয়াছি; সেইরূপ বরণ করিবার কালে বারবার ইহাই চোখে পড়িয়াছে যে, বঙ্কিমের সাহিত্যিক ব্যক্তি-চরিত্র, তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্মমন্ত্র, এবং তাঁহার প্রতিভা, এই সকলের মূলতত্ত্ব একই; তাহা এতই সুচিহ্নিত যে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই এক প্রাণ ও মন, এবং সেই ধ্যান-দৃষ্টির সম্মুখীন হইতে হয়; তাঁহার বাণী একটা বড় চরিত্রের মতই,—যেমন সবল তেমনই বলিষ্ঠ, যেমন সুবলয়িত তেমনই অসন্দিগ্ধ। বাণীর এমন দৃঢ়তা ও সুস্পষ্টতা আমাদের সাহিত্যে আর কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না। এজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কোন একটা উক্তি বা চিন্তাপদ্ধতির পৃথক্ বিচার সুসাধ্য নয়। বঙ্কিমকে বুঝিতে হইলে সেই একটি বাণীকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে, তারপর যে-প্রসঙ্গে যে-প্রশ্নই উত্থাপিত হউক সহজেই তাহার উত্তর মিলিবে। এই পুরুষের দৃষ্টি ছিল স্থির ও একাগ্র, তাহাতে সুন্দরের পিপাসাও যেমন, সত্য ও শিবের পিপাসাও তেমনই প্রখর ছিল; সেই পিপাসা ভাবসর্ব্বস্ব কবি বা আর্টিষ্টের মত, বৃন্তহীন কুসুমচয়নেই চরিতার্থ হয় নাই। আমিও যতবার যত প্রসঙ্গে বঙ্কিমের সমীপবর্ত্তী হইয়াছি ততবার সেই এক বাণীমূর্ত্তিকে বরণ করিয়াছি; পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, বঙ্কিম-প্রতিভার ব্যাখ্যায় এক-একটি নূতন দিক আবিষ্কার করিতে গিয়াও আমাকে প্রতিবারে সেই একটি মূল কথায় ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। ইহাতে দুইটা উপকার হইবে; প্রথমতঃ, বঙ্কিমচন্দ্রের সেই বাণী-মূর্ত্তিটি তাঁহাদের চিত্তে দৃঢ়-মুদ্রিত হইবে; দ্বিতীয়তঃ, ঐ যে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই একই কথায় উপনীত হইতে হয়—তাহা দ্বারা প্রমাণ হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে যাহা ধরা দিয়াছিল তাহা সত্যেরই একটা রূপ, নহিলে তাহা এমন সর্ব্বতোগ্রাহ্য ও সুসংলগ্ন হইত না।

তথাপি, এই গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধটির সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। ঐ প্রবন্ধে ('বঙ্কিম-প্রতিভার মহত্ত্ব-বিচার') আমি বঙ্কিম-বরণের শেষে, একটা নূতন সংশয়-সঙ্কটে, সেই প্রতিভার পানে আর একবার চাহিয়াছি। এই প্রবন্ধ আমি সম্প্রতি লিখিয়াছি,—অর্থাৎ অধুনা মহাকালের যে অট্টহাস বাঙালীর বক্ষঃপঞ্জর ধ্বসিয়া দিতেছে, তাহার অর্থ বুঝিবার জন্য আমি নূতন করিয়া আমার সেই বরণ-দীপ তুলিয়া ধরিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র এই যুগ, জাতি ও দেশের প্রবক্তা ঋষি ও নবধর্ম্ম-প্রণেতা কবি-মনীষী; অতএব আজিকার দিনে তাঁহার সেই ঋষি-দৃষ্টি ও মন্ত্রবাণীর সফলতা বা ব্যর্থতা বিচার করিবার প্রয়োজন অত্যধিক। একথাও অতিশয় সত্য যে, বঙ্কিম ও গান্ধী এই দুইজনের সাধনা ও সাধন-মন্ত্র সম্পূর্ণ বিপরীত, একজন অপরের প্রতিবাদী বলিলেও হয়। তাই এই প্রবন্ধে বঙ্কিমের স্বাজাত্য-বাদ ও গান্ধীর মানব-মহাধর্ম্ম বাদ এই দুইয়ের যে তুলনামূলক বিচার আছে তাহা একটা কঠিন প্রশ্নের সমাধান-চিন্তা না হইয়া পারে না। এক্ষণে যুগ, জাতি ও দেশের যে শেষ মহা-সঙ্কট অত্যাসন্ন হইয়াছে—উনবিংশ শতাব্দীর সেই সমস্যাই আজ বিশ্ব-সমস্যার সহিত যুক্ত হইয়া যে করাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে—তাহা হইতে ভারতের উদ্ধারলাভের চিন্তা বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম করিয়াছিলেন; ভবিষ্যতে সেই সঙ্কট যে আকারই ধারণ করুক, উদ্ধারের একটা মূল উপায় তিনিই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। আমি আজিকার এই দারুণ দুর্দ্দিনে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই বাণী—তাঁহার প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান—দেশবাসীর সমক্ষে উন্মোচিত করিয়াছি। ইহাতেও দেখা যাইবে, আমি ঐ প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহার প্রায় সকলই কোন না কোন প্রসঙ্গে পূর্ব্ব-প্রবন্ধগুলিতে উঁকি দিয়াছে—তাঁহার সম্বন্ধে সেই এক কথাই বলিতে হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এমনই বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ, তাঁহার কথা এখনও এক,—এবং অব্যর্থ!

এই গ্রন্থে আমি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার একটা দিক—তাঁহার মনীষা ও ঋষিত্বের দিকই প্রধানতঃ আলোচনা করিয়াছি; আশা করি, সে আলোচনা অসম্পূর্ণ বা ব্যর্থ হয় নাই। তথাপি প্রাসঙ্গিকভাবে কবি-বঙ্কিমের পরিচয়ও ইহাতে আছে, কিন্তু সে পরিচয় আংশিক। কবি-বঙ্কিমের পূর্ণ পরিচয়-রচনা বাংলাসাহিত্য-সমালোচনার একটি মহতী কীর্ত্তি; এ কাজ যিনি করিবেন, তিনি বাংলা কাব্য-সমালোচক, তথা সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে অত্যুচ্চ আসন দাবী করিতে পারিবেন। আমি এখনও এই কার্য্যে ব্রতী হইতে পারি নাই, এ পর্য্যন্ত আমার সে সাহস হয় নাই; স্বাস্থ্যভঙ্গ এবং অন্য অনেক কারণে, হয়তো আমি আর তাহা পারিব না, আমার সাহিত্যিক জীবনের একটা বড় সাধ অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তথাপি ভগবৎ-কৃপায় যদি এখনও তাহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে, ইংরেজ সমালোচক ব্র্যাড্‌লীর (A. C. Bradley) 'Shakespearian Tragedy'-নামক গ্রন্থের আদর্শে আমি 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া সাহিত্যিক ঋষি-ঋণ পরিশোধ করিব। তাহাতে কোন

উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকিবে না, কারণ একালে তেমন গ্রন্থের কোন মূল্য নাই। বঙ্কিম-চন্দ্রের নামে আমাদের বড় বড় অধ্যাপকেরা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন; একজন উদ্গত-পক্ষ অধ্যাপক-পতঙ্গ (দুই পক্ষই উদ্গত হইয়াছে—পি-আর-এস ও পি-এইচ্-ডি) নাকি বলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রকে লইয়া এত মাতামাতি কেন? ইনি বাংলাসাহিত্যের একজন অথরিটি! আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়টিও যাহা হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে বিদ্যার জাত-জন্ম আর রহিল না—বিশ্ববিদ্যার লয় হইয়াছে! ইহার উপর, একদল ইঙ্গ-বঙ্গীয় সাহিত্যিক বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উপরে যেরূপ দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে শুধুই দেশে নয়, বিদেশেও—অর্থাৎ তাহাদের পিতৃভূমিতে—বাংলা সাহিত্যের সুনাম বৃদ্ধি পাইতেছে। এই শ্রেণীর এক জীব একখানি বিলাতী গ্রন্থে নাকি লিখিয়াছে—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলা কিছু নয়। আবার বিলাতে ছাপা ইংরেজী বই হইলে, এই সব পিক্ক-গোমেসরাই মহামহোপাধ্যায় হইয়া বসেন—বই এবং লেখক উভয়ের প্রতি আমাদের কুলধ্বজদিগের ভক্তি দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে ঐরূপ গ্রন্থ-রচনার অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না—জাতির পিতৃপুরুষের তর্পণ ছাড়া। আমি বলিতেছিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের সেই কবি-পরিচয় এই গ্রন্থে বিশেষ কিছু নাই, তথাপি বঙ্কিম-বরণ অসম্পূর্ণ থাকিবে বলিয়া দুই একটি প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, বঙ্কিমের কাব্য-কীর্ত্তিও কত গভীর, কত প্রমেয়।

বড়িশা, ২৪ পরগণা
মহালয়া, ১৩৫৬

গ্রন্থকার

তৃতীয় সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন

'বঙ্কিম-বরণ' গ্রন্থখানি বরেণ্য কবি-সমালোচক পরলোকগত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের বহুলপঠিত ও বহুশ্রুতনাম গ্রন্থগুলির অন্যতম, ইহা তাঁহার সাহিত্যজীবনের অন্যতম কীর্তিস্তম্ভ। বলা বাহুল্য, বঙ্কিম-প্রতিভার সামগ্রিক পরিচয় পাইতে হইলে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, দীর্ঘদিন যাবৎ ইহার তৃতীয় সংস্করণ বা মুদ্রণ প্রকাশিত না হওয়ায় অগণিত বঙ্কিম-অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও শিক্ষার্থী প্রতিনিয়ত গ্রন্থখানির অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতেছিলেন। বর্তমানে ইহার তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করিতে পারিয়া আমরা সবিশেষ আনন্দিত।

এই সংস্করণে গ্রন্থশেষে নূতন একটি প্রবন্ধ সংযোজিত হইল।

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

সূচী

বঙ্কিমচন্দ্র	১
বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্র	১৩
বঙ্কিম-সাহিত্যের ভূমিকা	৪০
কপালকুণ্ডলা	৫৩
বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-জীবন	৮১
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-প্রসঙ্গ	১০০
বঙ্কিম-প্রতিভার একটি বৈশিষ্ট্য	১১০
বঙ্কিমচন্দ্রের জাতি-প্রেম	১১৯
বঙ্কিম-সাহিত্যের রসবিচার	১২৯
অতি আধুনিক সমালোচক ও বঙ্কিমচন্দ্র	১৩৮
বঙ্কিম-প্রতিভার মহত্ত্ব-বিচার	১৫২
সংযোজন	
বঙ্কিম ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের যোগসূত্র	১৭৪

বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিম-প্রসঙ্গের আরম্ভে, নর, নারায়ণ, নরোত্তম ও সর্ব্বশেষে দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয়োচ্চারণ* করি। ইহার কারণ, বঙ্কিম যে জীবনব্যাপী তপস্যা করিয়াছিলেন তাহাতে এই চারি দেবতারই উপাসনা ছিল। এই জন্যই আজ তাঁহাকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করি। আজ আমরা তাঁহার প্রাণের মর্ম্মটি বুঝিতে চেষ্টা করিব। তিনি যে ভাষার মন্দির গড়িয়াছিলেন, তাহার কারুশিল্পের বিশ্লেষণ আজ করিব না,—সেই মন্দিরের মধ্যে তিনি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিয়া যে দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহারই আরতি করিব।

বঙ্কিমের সাহিত্য-সাধনার প্রেরণা যোগাইয়াছিল, প্রত্যক্ষভাবে—স্বজাতি, স্বদেশ ও স্ব-সমাজ, এবং পরোক্ষভাবে—মানবের অদৃষ্ট ও মনুষ্যত্বের আদর্শ-সন্ধান। যে-জ্ঞান তত্ত্ব মাত্র, যে-ধর্ম্ম শুষ্ক তর্ক মাত্র, এবং যে-কাব্য আর্ট মাত্র, বঙ্কিম তাহাকে বরণ করেন নাই—বুঝিতেন না বলিয়া নয়, তিনি তাহা চান নাই, তাঁহার প্রাণ নিষেধ করিয়াছিল। যে-ধর্ম্ম মানুষের সত্যকার প্রকৃতি বা চরিত্রগত স্বধর্ম্ম, যাহা জীবনের সর্ব্ববিধ প্রয়াসের মধ্যে সার্থক হইতে চায়—যে-ধর্ম্ম জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও কর্ম্মের সঙ্গতি রক্ষা করিয়া, পূর্ণ মনুষ্যত্ব-সাধনের উপায়, বঙ্কিম তাহাকেই বরণ করিয়াছিলেন। আবার যে-দেশ, যে-জাতি ও যে-কুলে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—সেই দেশের ইতিহাস, সেই জাতির সাধনা, সেই সমাজের ধর্ম্মকে উদ্ধার করাও তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, নিজের মহতী প্রতিভা তিনি তদর্থে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি সরস্বতীকে সেবায় প্রসন্ন করিয়া শ্রেষ্ঠ বর লাভ করিয়াছিলেন, অথচ নর, নারায়ণ ও নরোত্তমকে কদাপি বিস্মৃত হন নাই।

আজ সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি কিছুরই জন্য আমাদের চিন্তা নাই; শিক্ষিত বাঙালী এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। আত্মরক্ষার জন্য যে চিন্তাশক্তি ও হৃদয়-বলের প্রয়োজন তাহা অতিশয় ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে; অন্ন ও স্বাস্থ্য— এই দুইটি প্রাথমিক প্রয়োজন-সাধনেও আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা নিরুপায়। উচ্চচিন্তার পরিধি অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; সাহিত্যের নামে যাহা করিতেছি তাহা দুর্ব্বলচিত্ত অশিক্ষিতের আত্মপ্রসাদ মাত্র; রাজনীতির সঙ্গে স্বধর্ম্মের যোগসাধন করিতে পারি নাই—ঘোর অচৈতন্য অবস্থায় বৃথা হাত-পা ছুড়িতেছি। সকল চিন্তা ও সকল কর্ম্মের মূলে যে আত্মজ্ঞান, ধর্ম্মবল ও পৌরুষের প্রয়োজন তাহারই একান্ত অভাব হইয়াছে। আমরা জাতীয় সাধনার ধারা হারাইয়াছি, ইতিহাস ভুলিয়াছি,—দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেও যে সহস্র বৎসরের ইতিহাস আছে, তাহার মধ্যে আমাদের জাতীয় প্রকৃতির পরিচয় কিরূপ, উত্থান ও পতনের কোন্ নিয়ম বা হেতু রহিয়াছে, কীর্ত্তি বা অপকীর্ত্তির পরিমাণ কি, এক কথায় আমরা কি ও কে, তাহা একেবারে ভুলিয়াছি।

*এখানে মূল সংস্কৃত শ্লোকটির অর্থ রক্ষা করি নাই—তজ্জন্য পণ্ডিতগণ যেন ক্ষুণ্ণ না হন।—গ্রন্থকার।

এজন্য আমরা স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছি, এবং বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচ্ছিন্ন বাক্য-সমষ্টির তাড়নায়, প্রতি দশ বৎসর, পলকে প্রলয় জ্ঞান করিয়া প্রবল মন্বন্তরমুখে ভাসিয়া চলিয়াছি। তাই আজ বঙ্কিমের যুগ ও বঙ্কিমকে জানিতে ইচ্ছা হয়। বঙ্কিমের চরিত্রে ও প্রতিভায় সেই যুগের বাঙালী হিন্দুর আত্মজাগরণের প্রয়াস ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মৃতকল্প জাতির সুপ্ত প্রাণ-শক্তি ও অধ্যবসায় এই যুগন্ধর ব্যক্তিকেই বিশেষ করিয়া আশ্রয় করিয়াছিল। বাঙালী যদি কখনো আত্মপ্রবুদ্ধ হয়, তবে যতই দিন যাইবে ততই বঙ্কিম-প্রতিভার এই দিকটার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বাড়িবে, বঙ্কিমকে সে ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য চেষ্টিত হইবে—কেবল সাহিত্যস্রষ্টা বঙ্কিমকে নয়, খাঁটি দেশ-প্রেমিক, আধুনিক বাঙালী জাতির ঋষিকল্প শিক্ষাগুরু, দৈবী প্রতিভার অধিকারী বঙ্কিমকে চিনিয়া লইবে।

সে যুগে পশ্চিমের সঙ্গে হঠাৎ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে—ইংরেজী দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রচণ্ড প্রভাবে বিস্মিত ও সচকিত বাঙালী-সন্তানের যে নবজাগরণ ও ভাবান্তর উপস্থিত হইল, তাহার ফলে সে 'স্বনুষ্ঠিত পরধর্ম্মে'র প্রতি অবশে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। সেই আধ্যাত্মিক সঙ্কটে সত্যপিপাসু শিক্ষিত বাঙালীর অনেকেই সহজলব্ধ পন্থায় গা ভাসাইবার উপক্রম করিলেন। চুপ করিয়া থাকিবার সময় সে নয়, স্ব-সমাজ ও স্বধর্ম্মের নিদারুণ অধোগতি তখন চাক্ষুষ হইয়া উঠিয়াছে। সত্যসন্ধ চিন্তাশীল পুরুষের মনে তখন একটা প্রবল কর্ত্তব্যের তাগিদ আসিয়াছে। য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানের নির্ভীক তথ্যসমুচ্চয়, এবং তাহারি আলোকে এক অভিনব মানব-ধর্ম্মের আদর্শ প্রাচীন বিশ্বাসের মূল পর্য্যন্ত বিচলিত করিয়া তুলিল। বিশ্বাস বলিতেছি এই জন্য যে, তখন চিন্তাশক্তি লোপ পাইয়াছে, বিচারবুদ্ধি অন্ধসংস্কারে পরিণত হইয়াছে, জাতীয় সাধনার অন্তর্নিহিত তত্ত্বগুলির সঙ্গে জ্ঞানবৃত্তি বা প্রাণবৃত্তি কোনটারই আর জীবন্ত যোগ ছিল না। এজন্য এই বীর্য্যবান পরধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত মুক্তিপন্থাই উদার, প্রশস্ত ও সুগম বলিয়া মনে হইল। জাতির পক্ষে ইহাই হইল কঠিন সঙ্কট। তথাপি সে ভালই হইল—এইরূপ সঙ্কটেরই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সঙ্কটকে কল্যাণে পরিণত করিবার মত মনীষা ও হৃদয়বলের প্রয়োজন। বঙ্কিমের মধ্যে আমরা সেই দুর্লভ প্রতিভার পরিচয় পাই। বঙ্কিম য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার ধারা শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিয়াছিলেন। এই প্রভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁহার যাবতীয় রচনা ও সাহিত্যসৃষ্টির আদর্শে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইলেও,* তিনি তাহাকে যতটুকু সত্য বলিয়া মানিয়াছিলেন ঠিক ততটুকুই হিন্দুর সাধনা ও সভ্যতারও অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

*"তবে ইহাও আমাকে বলিতে হইতেছে যে, যে ব্যক্তি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং দর্শন অবগত হইয়াছে, সকল সময়েই সে যে প্রাচীনদিগের অনুগামী হইতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা নাই। আমিও সর্ব্বত্র তাঁহাদের অনুগামী হইতে পারি নাই। যাঁহারা বিবেচনা করেন, এদেশীয় পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন তাহা সকলই ঠিক এবং পাশ্চাত্ত্যগণ জাগতিক তত্ত্বসম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা সকলই ভুল, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই।" বঙ্কিমচন্দ্রকৃত 'শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা'র অনুবাদ ও টীকার ভূমিকা।

ইহাই বঙ্কিম-প্রতিভার বৈশিষ্ট, এই জন্যই য়ুরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষা অন্তরায় না হইয়া, তাঁহার মধ্য দিয়া, এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার দ্বারাই, স্বধর্ম্ম, স্বসমাজ ও স্বজাতির কল্যাণপ্রসূ হইয়াছিল।

বঙ্কিমকে বুঝিতে হইলে তাঁহাকে কেবল জ্ঞানী চিন্তাবীর হিসাবে পরীক্ষা করিলে চলিবে না। জ্ঞানের সাধনা বা সত্যের প্রতিষ্ঠায় আরও অনেকে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, জাতির মুক্তিপথ-নির্দ্দেশে তাঁহাদের সহায়তা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া, আমরা সেই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙালীর চরিত কীর্ত্তন করিব। রমেশচন্দ্র দত্ত বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রকে 'The greatest man of the Nineteenth Century' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্কিমের সেই greatness-এর অর্থ কি? বঙ্কিম কেবলমাত্র চিন্তাবীর বা সত্যপরায়ণ সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না—আরও বড় ছিলেন। দেশপ্রেমের প্রেরণাযুক্ত এক অপূর্ব্ব প্রতিভায় তিনি সে-যুগে স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্মের বিরোধ নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহার চিন্তায় শুধুই বিশ্লেষণী শক্তি নয়, সৃজনী শক্তি ছিল। মৃতপ্রায় বৃক্ষকাণ্ড উৎপাটন করিয়া তাহার স্থানে সুদৃশ্য ও সুদৃঢ় লৌহস্তম্ভ স্থাপন করিবার বুদ্ধি তাঁহার ছিল না—সেই মৃত বৃক্ষের মূলে তাহারই জন্মমৃত্তিকা হইতে রসসঞ্চার করাইয়া তাহার বৃক্ষত্ব সম্পাদন করিবার প্রতিভা একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রেরই ছিল। 'Our greatest thoughts come from the heart'—এই রহস্যময় চিত্তবৃত্তি, হৃদয়ের গভীর গহনের অনুভূতি না থাকিলে, কেহ সৃষ্টি করিতে পারে না। এইজন্য বঙ্কিম কবি; কিন্তু কবিত্বের অপেক্ষা বড় ছিল তাঁহার যে শক্তি—তাঁহার কবি-কল্পনা যে শক্তির একটা অংশমাত্র, একটা সাধনপ্রণালী মাত্র—আমি সেই শক্তির কথাই বলিতেছি। তিনি প্রকৃত জীবনের সমস্যা, পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শ,—জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, কর্ম্ম—সর্ব্ববৃত্তির সামঞ্জস্য-মূলক একটি সত্যের সন্ধান করিয়াছিলেন, এবং তাহাকে নিছক জ্ঞান বা ধ্যানের মধ্যে নয়, জীবনের সমগ্র বাস্তবতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এই সত্যের সন্ধানই তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব।* হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার যে প্রীতি, তাহার কারণ তিনি তাহার নিগূঢ় তত্ত্বসকলের উদারতায় মুগ্ধ হইয়া-

*"মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আপনি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছেন। সেইগুলির অনুশীলন প্রস্ফূরণ ও চরিতার্থতাই মনুষ্যত্ব। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম। সেই অনুশীলনের সীমা পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য। তাহাই সুখ। এই সকল বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হইলে ইহারা সকলেই ঈশ্বর-মুখী হয়। সেই অবস্থাই ভক্তি।" অনুশীলন, অষ্টাবিংশ অধ্যায় [উপসংহার]।

"বৃত্তি নিকৃষ্ট হউক বা উৎকৃষ্ট হউক, উচ্ছেদমাত্রই অধর্ম্ম। লম্পট বা পেটুক অধার্ম্মিক; কেন না, তাহারা আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া ওই একটির অনুশীলনে নিযুক্ত। যোগীরাও অধার্ম্মিক; কেন না তাঁহারাও আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া দুই একটির সমধিক অনুশীলন করেন।......

"আর, আমি কোনো বৃত্তিকেই নিকৃষ্ট বা অনিষ্টকর বলিতে সম্মত নহি। জগদীশ্বর আমাদিগকে নিকৃষ্ট কিছুই দেন নাই। আমাদের সকল বৃত্তিগুলিই মঙ্গলময়। যখন তাহাতে অমঙ্গল হয় সে আমাদেরই দোষে। নিখিল বিশ্বের সর্ব্বাংশই মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিরই অনুকূল, প্রকৃতি আমাদের সকল বৃত্তিগুলিরই সহায়। তাই যুগপরম্পরায় মনুষ্যজাতির মোটের উপর উন্নতিই হইয়াছে। যে বৈজ্ঞানিক নাস্তিক ধর্ম্মকে উপহাস করিয়া বিজ্ঞানই এই উন্নতির কারণ বলেন, তিনি জানেন না, বিজ্ঞানও এই ধর্ম্মের এক অংশ, তিনি একজন ধর্ম্মের আচার্য্য।" অনুশীলন, ষষ্ঠ অধ্যায়।

ছিলেন। প্রাণের সত্যকার পিপাসা, গভীর শ্রদ্ধা ও নিরন্তর যুক্তি-বিচারের সংযম তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির প্রাণপণ প্রয়াসকে মহিমান্বিত করিয়াছে। †

আমি বঙ্কিমের সৃজনী শক্তির কথা বলিয়াছি। সকল সৃষ্টির মূলেই আছে একটি সমগ্র-দৃষ্টি। এক খণ্ড বস্তু হইতে আর একটা বৃহত্তর খণ্ডবস্তুতে উপনীত হওয়াই সৃষ্টির লক্ষণ নয়। যাহা খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন তাহাকেই এমন একটি আলোকে উদ্ভাসিত করা যে, তাহারই মধ্যে সর্ব্বসামঞ্জস্য লক্ষিত হইবে—ইহাই সৃষ্টিশক্তি। কবিরা particular-কে universal-এর গৌরব দান করেন। শ্রেষ্ঠ কবির personality যতই সুনির্দিষ্ট, ততই তাহার মধ্যে impersonal দিকটি পরিস্ফুট হইয়া থাকে। ইহাই অঘটনঘটনাপটীয়সী প্রতিভা। বঙ্কিমের প্রতিভায় আমরা ইহাই লক্ষ্য করি। যাহা সর্ব্বকালাতীত, যাহা নিত্য ও শাশ্বত, তাহাকে তিনি কখনও ভুল করেন নাই, কিন্তু তাহাকে দেশকালের ইতিহাসের মধ্যে মূর্ত্তি ধরিতে দেখিয়াছিলেন। ধর্ম্মকে তিনি মানুষের সত্যকার জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি তত্ত্বরূপে উপলব্ধি করিয়া পরে তাহাকে মানুষের উপর চাপাইবার চেষ্টা করেন নাই। মানুষের বাস্তব প্রকৃতির মধ্য দিয়াই যে মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ খুঁজিতেছে, তাহাকেই তিনি সত্যকার ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। হিন্দুজাতির ইতিহাসে, এই ধর্ম্মের বিশিষ্ট ধারাকে তিনি কোনও একটি যুগ বা দূর অতীতের একটি উৎসের মধ্যেই সম্পূর্ণ হইতে দেখেন নাই—তাহার সমগ্র ইতিহাসের মধ্য দিয়া তিনি সেই ধারাটিকে অনুসরণ করিয়াছিলেন, সেই বহুবিচিত্র প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্যে তাহার মূল প্রেরণাটিকে বুঝিয়া লইয়াছিলেন। এজন্য হিন্দু-ধর্ম্মের অন্তর্গত কোনও একটি তত্ত্বকে তিনি সত্য বলিয়া অপর সকলকে পরিহার করেন নাই। সুদীর্ঘ কালের বিস্তারের মধ্যে একটা জাতির জীবন তাহার সকল চেষ্টা ও প্রবৃত্তির রঙে ও রূপে, যে চাক্ষুষ দেহ ধারণ করিয়াছে তাহার হৃদস্পন্দন তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি তাহার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেখানে তাহার হৃদয়ের সহস্রদল একটি বৃন্তে বিধৃত হইয়া আছে—সেই বৃন্তমূলটিকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সেইখানে পৌঁছিতে না পারিলে সামঞ্জস্য বোধ হয় না, বিরোধ ঘুচে না। এমনি করিয়া বিশেষকে ধরিতে পারিলে নির্ব্বিশেষের উপলব্ধি হয়। ইহাই প্রতিভার কাজ, ইহার জন্য শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভার প্রয়োজন। এই জন্যই এক অর্থে কবিও ঋষি, ঋষিও কবি। এই সমগ্র-দৃষ্টিই সৃষ্টিশক্তি। বঙ্কিম এই দৃষ্টির দ্বারা হিন্দুর বিশিষ্ট সাধনাকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন—সৃষ্টি করিয়াছিলেন। Particular-কে এমনি করিয়া দেখিতে

---

† "তিন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের জন্য যে বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল আজিকার দিনে ঠিক সেইগুলি অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া চালাইতে পারা যায় না। সেই ঋষিরা যদি আজ ভারতবর্ষে বর্ত্তমান থাকিতেন, তবে তাঁহারাই বলিতেন, "না, তাহা চলিবে না। আমাদিগের বিধিগুলির সর্ব্বাঙ্গ বজায় রাখিয়া এখন যদি চল, তবে আমাদিগের প্রচারিত ধর্ম্মের মর্ম্মের বিপরীতাচরণ করা হইবে। হিন্দুধর্ম্মের সেই মর্ম্মভাগ অমর, চিরদিন চলিবে, মনুষ্যের হিতসাধন করিবে, কেন না মানব-প্রকৃতিতে তাহার ভিত্তি। তবে বিশেষ বিধিসকল সকল ধর্ম্মেই সময়োচিত হয়। তাহা কালভেদে পরিহার্য্য ও পরিবর্ত্তনীয়।" অনুশীলন, পঞ্চম অধ্যায়।

জানিলে তাহার মধ্যে Universal আপনিই প্রতিফলিত হয়। এই যোগসাধন কেবল যুক্তিতর্কের দ্বারা হয় না। মানুষ যে শুধুই জ্ঞানসাধনের যন্ত্র নয়—অতীতের ঐতিহ্য ও বর্তমানে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে তাহার প্রাণের একটি বিশিষ্ট রূপ আছে, তাহা তিনি ভুলিয়া যান নাই, অথচ তাহারই মধ্যে সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্বের বীজ রহিয়াছে, ইহাও তিনি সব দিক দিয়া ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন। এই বুদ্ধির মূলে ছিল তাঁহার প্রবল দেশাত্মবোধ, পরে এই বুদ্ধি হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মোদ্ধারকালে আরও দৃঢ় হইয়াছিল। যাহা দেশে, কালে ও পাত্রে খণ্ডরূপে দেখা দেয়, তাহাকেই অখণ্ডরূপে উপলব্ধি করা শ্রেষ্ঠ মনীষার লক্ষণ। আবার, অখণ্ডকে উপলব্ধি করিয়াও খণ্ডের মধ্যেই রসাস্বাদন করা অধিকতর শক্তির প্রমাণ—জ্ঞান তখন শাখাপল্লবেই শেষ হয় নাই, পুষ্পিত হইয়াছে—এই Concrete, Particular-এর প্রীতিই সকল সৃষ্টির মূলে। কি সাহিত্যে, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে, বাস্তবের সহিত এই সহানুভূতি যাহার নাই, যে বাস্তবের রসরূপের পরিচয় পায় নাই, কেবল তত্ত্বসন্ধান করিয়াছে, সে কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না। তাহার মন্ত্র যত উৎকৃষ্ট হউক, সে মন্ত্র প্রাণদ হয় না। কথাটা অবান্তর নয়। যে দেশাত্মবোধ বঙ্কিমের প্রতিভাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে, তাহার মধ্যে যদি এই গভীর অনুভূতি ও দৃষ্টিশক্তি না থাকিত, তাহা হইলে স্বধর্ম্মের সঙ্গে পরধর্ম্মের বিরোধে তিনি সার্ব্বজনীন ও শাশ্বতকে হারাইয়া স্বধর্ম্মকেও হারাইতেন, তাহাকে উদ্ধার করিতে পারিতেন না।

এই দেশাত্মবোধ তাঁহার প্রতিভার মূল উৎস। এ-মন্ত্রে কেহ তাঁহাকে দীক্ষিত করে নাই,—ইহা শিক্ষালব্ধ নয়, সহজাত মনীষার মত ইহা যেন তাঁহার প্রাক্তন সম্পদ। জাগ্রতে-স্বপনে, ধ্যানে-জ্ঞানে, এক মুহূর্ত্ত তিনি ইহা হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চায়, ধর্ম্মতত্ত্বের বিচারে, সাহিত্যসৃষ্টির অপূর্ব্ব উন্মাদনায়—যৌবনের স্বপ্নে, প্রৌঢ়ের কর্ম্মজিজ্ঞাসায়, বার্দ্ধক্যের স্মৃতি-কল্পনায়—এই দেশপ্রেম তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল, দেশের নামে তিনি আত্মহারা হইতেন। অত বড় গম্ভীর প্রকৃতিও দেশের কথায় বালকের মত অধীর হইয়া উঠিত—ক্ষোভে, লজ্জায়, হর্ষে, শোকে, ক্রোধে ও গর্ব্বে আত্মসংযম হারাইত। এই দেশ কোনও মনঃকল্পিত দেবতা নয়—যেন সাকার বিগ্রহ; এ প্রেম যেন রক্তের ধর্ম্ম—ব্যক্তিগত সম্পর্কের নিবিড় চেতনা। কত ভাবে, কত প্রসঙ্গে, যে তিনি এই গভীর চেতনা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু সকল ভাবের মধ্যে যে ভাবটি তাঁহার হৃদয়ে আমরণ জাগরূক ছিল, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ কমলাকান্তের 'একটি গীত' হইতে এখানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। সত্যকার অনুভূতি এবং তাহারই প্রকাশ-বেদনা যদি সাহিত্যসৃষ্টির কারণ হয়, এবং সে প্রকাশভঙ্গী অনবদ্য হইলে যদি তাহা সাহিত্য হয়, তবে কাব্যের মধ্যেই কবির অন্তরতম প্রকৃতির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। সেই পরিচয় এই পংক্তিগুলিতে আমরা পাইতেছি—

"আর বঙ্গভূমি! তুমিই বা কেন মণিমাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন আমি হার করিয়া কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না? তোমায় সুবর্ণের আসনে বসাইয়া, হৃদয়ে

দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউরোপে, আমেরিকায়, মিসরে, চীনে দেখিত, তুমি আমার কি উজ্জ্বল মণি।...

"সম্পূর্ণ অসহ্য সুখের লক্ষণ শারীরিক চাঞ্চল্য, মানসিক অস্থৈর্য্য। এ সুখ কোথায় রাখিব, লইয়া কি করিব, আমি কোথায় যাইব? এ সুখের ভার লইয়া কোথায় ফেলিব? এ সুখের ভার লইয়া আমি দেশে দেশে ফিরিব; এ সুখ একস্থানে ধরে না। এ জগৎ সংসার এ সুখে পূরাইব। সংসার এ সুখের সাগরে ভাসাইব।.....

"এ সুখে কমলাকান্তের অধিকার নাই—এ সুখে বাঙালীর অধিকার নাই। গোপীর দুঃখ, বিধাতা গোপীকে নারী করিয়াছেন কেন,—আমাদের দুঃখ বিধাতা আমাদের নারী করেন নাই কেন—তাহা হইলে এ মুখ দেখাইতে হইত না।

তোমায় যখন পড়ে মনে
আমি চাই বৃন্দাবন পানে,
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।

"এই কথা সুখ-দুঃখের সীমারেখা। যাহার নষ্ট সুখের স্মৃতি জাগরিত হইলে সুখের নিদর্শন এখনও দেখিতে পায়, সে এখনও সুখী—তাহার সুখ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। যাহার সুখ গিয়াছে, সুখের নিদর্শন গিয়াছে—বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে, এখন আর চাহিবার স্থান নাই—সেই দুঃখী, অনন্ত দুঃখে দুঃখী।

"আমার এই বঙ্গদেশে সুখের স্মৃতি আছে, নিদর্শন কই? দেবপালদেব, লক্ষ্মণ সেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ,—প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী রীতি, এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে পড়িল, কিন্তু চাহিব কোন্ দিকে? সে গৌড় কই? সে যে কেবল যবনলাঞ্ছিত ভগ্নাবশেষ। আর্য্য রাজধানীর চিহ্ন কই? আর্য্যের ইতিহাস কই? জীবনচরিত কই? কীর্ত্তি কই? কীর্ত্তিস্তম্ভ কই? সমরক্ষেত্র কই? সুখ গিয়াছে—সুখচিহ্নও গিয়াছে, বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—চাহিব কোন্ দিকে?"

এ স্বদেশপ্রীতি আমাদের আধুনিক কালের Nationalism নয়। বিজাতি প্রভুর নিকট স্বরাজের অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্য, সেই বিজাতির অনুকরণে কতকগুলি ছেঁদো বুলি আওড়ান নয়। যে দেশপ্রেমে দেশের সঙ্গে পরিচয় নাই, দেশের ইতিহাস, অতীত কীর্ত্তির অনুশীলন নাই, নিজের বংশপরিচয় নাই, জাতির বিশিষ্ট সাধনার ধারাকে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা নাই—ইহা সেই স্বরাজকামনা হইতে স্বতন্ত্র। বঙ্কিমের দেশপ্রীতি ছিল যেন দেহেরই ক্ষুধা—মার্জ্জিত শিক্ষিত বুদ্ধিবৃত্তি নয়—একেবারে রক্তমাংসের সহজ-সংস্কার। এই দেশপ্রীতির দ্বারাই তিনি আধ্যাত্মিক ক্ষুধার নিবৃত্তি করিয়াছিলেন। মনুষ্যত্ব-ধর্ম্মের বিচারে তিনি যে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, তাহারও একটি প্রধান অর্থ হইল এই স্বদেশপ্রীতি।*

*"যে আক্রমণকারী তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিব, কিন্তু তাহার প্রতি প্রীতিশূন্য হইব কেন? পর-সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া আমার সমাজের ইষ্টসাধন করিব না, এবং আমার অনিষ্টসাধন করিয়া কাহারেও আপনার সমাজের ইষ্টসাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সমদর্শন, এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশ-প্রীতির সামঞ্জস্য।......আমি তোমাকে যে দেশপ্রীতি বুঝাইলাম তাহা

'গীতার ব্যাখ্যা', 'অনুশীলন', 'ধর্ম্মতত্ত্ব'—সর্ব্বত্র উদার যুক্তি-বিচারের ফাঁকে ফাঁকে তাঁহার হৃদয়ের এই শিখা স্ফুরিত হইতেছে ; এই প্রাণের প্রেরণাই যেন সর্ব্বসমস্যার মধ্য দিয়া তাঁহার পথটিকে সুগম করিয়া দিয়াছে। মনে হয়, সত্যই—'Our best thoughts come from the heart.'

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বঙ্কিম পথ খুঁজিয়াছিলেন, পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কবি হইয়াও কাব্যকলাই তাঁহার মুখ্য ভাবনা ছিল না। তিনি সারাজীবন সমগ্র জাতির জীবনপথের পাথেয় সংগ্রহের চিন্তায় ব্যাপৃত ছিলেন। জাতির জীবনে যে যুগান্তরের সমস্যা বিরাট হইয়া দেখা দিয়াছিল তাহারই স্পন্দনে তাঁহার সারাচিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। জাতির জাতিত্ব বজায় রাখিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁহার একমাত্র সাধনা। আত্মনিহিত শক্তির প্রেরণায় বাংলা ভাষার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। যে নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচণ্ড আক্রমণে প্রাচীন সমাজের ভিত্তি দুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাকে অবিলম্বে ধারণ করিয়া আত্মসাৎ করিবার জন্য উপযুক্ত ভাষা নির্ম্মাণ করিতে হইবে—'বঙ্গদর্শনের প্রথম সূচনায়' সেই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হইয়াছে। নিজ ভাষার ভিতর দিয়া পরিচয় না হইলে কোন বিদ্যাই জাতির পক্ষে স্বাস্থ্যকর হয় না—নিজ ভাষার ভিতর দিয়াই তাহাকে আত্মসাৎ করা সম্ভব। এই ভাষার সাহায্যে যে সাহিত্য তিনি গড়িয়াছিলেন, নিছক সৌন্দর্য্যপিপাসা চরিতার্থ করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি জাতির মধ্যে চিন্তাশীলতা, রসবোধ, ইতিহাস-বিজ্ঞানের আলো না প্রসারিত করিবার জন্যই বঙ্গভারতীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন,—তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্মসংস্থাপন ও চিত্তশুদ্ধি। কৃষ্ণচরিত্রে তিনি যে আদর্শ-মানবের চরিত্র-কীর্ত্তন করিয়াছেন, 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ও অন্যান্য প্রবন্ধে তিনি যে মানব-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—সেই আদর্শ-মানবতার মন্ত্রে দেশবাসীকে দীক্ষিত করিবার জন্যই এই সাহিত্য-যজ্ঞে সকলকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ভারতী তাঁহার লীলা-সহচরী ছিল না— এই যজ্ঞেরই দেবতা ছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

ইয়ুরোপীয় patriotism নহে। ইয়ুরোপীয় patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইয়ুরোপীয় patriotism-ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই যে, পর-সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়দের কপালে এরূপ দেশ-বাৎসল্য-ধর্ম্ম না লিখেন।......

"মানুষের সকল বৃত্তিগুলি অনুশীলিত হইয়া যখন ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হইবে, মনের সেই অবস্থাই ভক্তি। এই ভক্তির ফল জাগতিক প্রীতি। এই জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, এবং স্বদেশপ্রীতির প্রকৃত পক্ষে কোন বিরোধ নাই।......আত্মরক্ষা হইতে স্বজন-রক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম, স্বজন-রক্ষা হইতে দেশ-রক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম। যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্ব্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন, দেশপ্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম।......

"ভারতবর্ষীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্ব্বলোকে সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহারা দেশপ্রীতি সেই সার্ব্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যযুক্ত অনুশীলন নহে। দেশপ্রীতি ও সার্ব্বলৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই। তাহা ঘটিলে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবে।" 'অনুশীলন', চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় [স্বদেশপ্রীতি]।

'সাহিত্যের মধ্যে দুইশ্রেণীর যোগী দেখা যায়, জ্ঞানযোগী ও কর্ম্মযোগী। বঙ্কিম সাহিত্যের কর্ম্মযোগী ছিলেন।' বঙ্কিম সম্বন্ধে এই কথাটি বিশেষ করিয়া মনে রাখা উচিৎ। তিনি যদি সাহিত্যসৃষ্টির আনন্দেই বিভোর থাকিতেন তবে আপনার সাধনা লইয়া আপনিই থাকিতেন, অপরকে এমন করিয়া যোগ দিতে আহ্বান করিতেন না। যে সকল বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল না, অপরকে উৎসাহিত করিবার জন্য, নিজের প্রতিভাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া, তিনি যে সকলের বোঝা বহিয়াছেন। বিজ্ঞান ও ইতিহাস, এবং বিশেষ করিয়া ইতিহাস-উদ্ধারের জন্য তাঁহার সেই ব্যাকুলতা যখন লক্ষ্য করি, তখন দেশের কল্যাণ-কামনায় তাঁহার এই আত্মাহুতির পরিচয়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। আত্মহুতি নয় ত কি? এত বড় কবি হইয়াও কাব্যরচনায় ভ্রূক্ষেপ নাই—উপন্যাস অপেক্ষা বাঙালীর ইতিহাস গড়িবার জন্য কি ব্যাকুল বাসনা! ইতিহাস না জানিলে বাঙালী যে মানুষ হইবে না।

"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই।...নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না··· বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে?

"তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্ব্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালা দেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদের আনন্দ নাই?···

"ইয়ুরোপ সভ্য কতদিন? পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ইয়ুরোপ আমাদিগের অপেক্ষাও অসভ্য ছিল। একটি ঘটনায় ইয়ুরোপ সভ্য হইয়া গেল। অকস্মাৎ বিস্মৃত অপরিজ্ঞাত গ্রীক সাহিত্য ইউরোপ ফিরিয়া পাইল; ফিরিয়া পাইয়া, যেমন বর্ষার জলে শীর্ণা স্রোতস্বতী কূলপরিপ্লাবিনী হয়, যেমন মুমূর্ষু রোগী দৈব ঔষধে যৌবনের বল প্রাপ্ত হয়, ইয়ুরোপের অকস্মাৎ সেইরূপ অভ্যুদয় হইল। আজ পেত্রার্ক, কাল লুথার, আজ গেলিলিও, কাল বেকন,—ইয়ুরোপের এইরূপ অকস্মাৎ সৌভাগ্যোচ্ছাস হইল। আমাদিগেরও একবার সেই দিন হইয়াছিল। অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্যচন্দ্রোদয়; তারপর রূপ-সনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি, ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। এদিকে দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ; স্মৃতিতে রঘুনন্দন, এবং তৎপরগামিগণ। আবার বাংলা কাব্যের জলোচ্ছ্বাস। বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস চৈতন্যের পূর্ব্বগামী। কিন্তু তাহার পরে চৈতন্যের পরবর্ত্তিনী যে বাঙ্গালা কৃষ্ণবিষয়িণী কবিতা, তাহা অপরিমেয়, তেজস্বিনী, জগতে অতুলনীয়! সে কোথা হইতে?

"আমাদের এই Renaissance কোথা হইতে? কোথা হইতে সহসা এই জাতির মানসিক উদ্দীপ্তি হইল? এ রোশ্‌নাইয়ে কে কে মশাল ধরিয়াছিল? ধর্ম্মবেত্তা কে? শাস্ত্রবেত্তা কে? দর্শনবেত্তা কে? ন্যায়বেত্তা কে? কে কবে জন্মিয়াছিল? কে কি লিখিয়াছিল? কাহার জীবন-চরিত কি? কাহার

লেখার কি ফল ? এ আলোক নিবিল কেন ? নিবিল বুঝি মোগলের শাসনে। সকল কথা প্রমাণ কর।…"*

হায় বঙ্কিম! তুমি কি স্বপ্নই দেখিয়াছিলে—দিবাস্বপ্নই বটে! আজিকার দিনে বাঙালীর জীবনে যে বান ডাকিয়াছে তাহা কি বঙ্কিমেরও কল্পনার অগোচর ছিল! আজ আবার যে Renaissance আসিয়াছে—সে রোশ্‌নাইয়ে কাহারা মশাল ধরিয়াছে?—ন্যূট হামস্থন, গোর্কি, যোহান বোয়ের! মেটারলিঙ্কীয় কাব্যবাদ, নব্য জ্যার্মনির চিন্তাধারা, 'পীত-নাট্য' প্রভৃতির গবেষণায় বাঙালীর ললাট উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শ্মশান-ভূমির পচ্যমান আবর্জ্জনায় আলেয়ার দীপ্তি দেখা যাইতেছে! কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। বঙ্কিম সাহিত্যের ধ্যানযোগী ছিলেন না, কর্ম্মযোগী ছিলেন, এই কথা মনে না রাখিয়া আজ যখন আমরা তাঁহার উপন্যাস-গুলিরই বিচার করি, আর কোনও সম্পর্কে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করি না, তখন শুধু মূর্খতা নয়—গুরুতর পাতকের ভাগী হই।

বঙ্কিম বলিয়াছিলেন, "কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে, কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য—অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি।"‡ কিন্তু চিত্তশুদ্ধি না হইলেও কাব্যের রসাস্বাদন সম্ভব। অথবা কাব্যের রসাস্বাদন সময়ে সেই মুহূর্ত্তের জন্যও চিত্তশুদ্ধি ঘটে। এই জন্যই—'Music hath charms to soothe a savage breast.' আসল কথা, খাঁটি কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান ত নহেই, কাব্যের কোনও লৌকিক উদ্দেশ্য নাই; তথাপি উৎকৃষ্ট কাব্য পাঠ করার ফলে চিত্তশুদ্ধি হয়; বরং যে কাব্য যত খাঁটি, অর্থাৎ যাহা যত উদ্দেশ্যহীন, স্বাধীন, লীলাময়—তাহার দ্বারা তত উৎকৃষ্ট রসের উদ্বোধন হয়, তাহাতেই চিত্তশুদ্ধি হয়। কিন্তু তাহা স্থায়ী নয়, ক্ষণিক। এজন্য বঙ্কিম স্বতন্ত্র কাব্যনীতি স্বীকার করেন নাই। তিনি কুকাব্য ও সুকাব্য ভেদ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "যাহারা কুকাব্য প্রণয়ন করিয়া পরের চিত্ত কলুষিত করিতে চেষ্টা করে তাহারা তস্করদিগের ন্যায় মনুষ্যজাতির শত্রু, এবং তাহাদিগকে তস্করদিগের ন্যায় শারীরিক দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত করা বিধেয়।"* তথাপি সমাজ-নীতির বিরোধী হইলেই কাব্য যে কুকাব্য হয়, এমন কথা তিনি বলেন নাই। এক স্থানে কৃষ্ণের ব্রজলীলাকীর্ত্তন সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, "যে এই ব্রজলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়াছে, এবং যাহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, তাহার পক্ষে ইহার ফল সুফল।" অর্থাৎ প্রকৃত রসিক না হইলে এইরূপ কাব্য তাহার পক্ষে অনিষ্টকর। এখানে চিত্তশুদ্ধির অর্থ রস-জ্ঞান। তাহা হইলে কথাটা দাঁড়ায় এইরূপ। কাব্যের কোনও উদ্দেশ্য নাই; কারণ কাব্যরচনার মূলে যে প্রেরণা আছে তাহা কোনও উদ্দেশ্য নয়—সেটা কবিচিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত্ত লীলা। তথাপি, তাহার ফলে, কবির কোনও উদ্দেশ্য ব্যতিরেকেই, পাঠক-চিত্তে রস-সঞ্চার হয়। যেখানে রসের উদ্রেক না হইয়া একটা কু বা সু প্রবৃত্তির উত্তেজনা হয়, সেখানে পাঠকই দায়ী—

* 'বিবিধ প্রবন্ধ', দ্বিতীয় খণ্ড ['বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা']।

‡ 'উত্তরচরিত'-সমালোচনা দ্রষ্টব্য—বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম খণ্ড।

* 'অনুশীলন', সপ্তবিংশ অধ্যায়।

কাব্যের ফলাফল পাঠকের চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ বা অপকর্ষের উপর নির্ভর করে। কিন্তু যেখানে লেখকই দায়ী, অর্থাৎ, যে-লেখার মধ্যে একটা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ফুটিয়া ওঠে, এবং সে উদ্দেশ্য কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা—বঙ্কিম তাহাকেই কুকাব্য বলিতেছেন। বলা উচিৎ—কুৎসিত অ-কাব্য। সবল সুস্থ স্বতঃস্ফূর্ত্ত রস-কল্পনায় যাহার জন্ম হয় নাই, তাহার ফলে রসোদ্রেক হইতে পারে না। এজন্য রসবিচারে এ সকল রচনার স্থান নাই। যেমন সদুদ্দেশ্যপূর্ণ অকাব্য-পাঠে নীতিজ্ঞানী অরসিক ব্যক্তির হৃদয় প্রফুল্ল হয়, তেমনি অসৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ অ-কাব্য পাঠ করিয়া নীতিহীন অরসিক ব্যক্তির সুখ হয়। এ সকল রচনা-সম্বন্ধে বঙ্কিমের শাসন-ব্যবস্থাই সমীচীন। বলা বাহুল্য, এ আলোচনায় আমি যাহা বলিলাম তাহার সবটাই বঙ্কিমের কথা নয়। বঙ্কিম সুকাব্য ও কুকাব্য-ভেদ মানিতেন, এবং কাব্যের উদ্দেশ্যও স্বীকার করিতেন।* তিনি পূর্ণ-মনুষ্যত্বের আদর্শ-সন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন, তাঁহার ধ্যান ছিল ধর্ম্ম ; এ ধর্ম্মের লক্ষ্য মানুষের মনুষ্যত্ব-সাধন। একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাই বঙ্কিমের উপন্যাসে আদর্শবাদ প্রবল। যাহাকে আমরা সাহিত্যের Realism বলি, সেই Realism-এর প্রেরণায় তিনি অল্পই লিখিয়াছেন। সর্ব্বত্র তিনি একটা বড় ভাব ও বৃহৎ আদর্শ ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সাহিত্যকে খাঁটি শিল্প-কলার আদর্শে কল্পনা না করিয়াও তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কাব্যাংশেও কি মহৎ, কত সুন্দর ও মহিমময়!

তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'তে সাহিত্যিক প্রেরণা ছাড়া আর কিছু ছিল না। 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলা ভাষার প্রথম রোমান্স—ইংরেজী রোমান্সের বাঁধা আদর্শে রচিত। 'মৃণালিনী', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'রাধারাণী'ও এই একই আদর্শে রচিত। কেবল, 'মৃণালিনী'র কল্পনা-মূলে স্বদেশপ্রেম সর্বপ্রথম দেখা দিয়াছে। দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। তারপর সমাজ-সমস্যা ও চরিত্রনীতির প্রেরণায় চতুর্থ উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' ; 'চন্দ্রশেখর' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই একই প্রেরণার ফল। 'আনন্দমঠ' ও 'রাজসিংহে' দেশাত্মবোধ, 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামে' ধর্ম্মসমস্যা, 'রজনী'তে মনস্তত্ত্ব এবং 'ইন্দিরা'য় শুধু গল্প-রচনার আনন্দ আছে। খাঁটি উপন্যাস, অর্থাৎ যেগুলিতে সমাজনৈতিক বা ধর্ম্ম-নৈতিক কোনও অভিপ্রায় নাই, সেগুলির সংখ্যা খুবই কম, এবং তাহার মধ্যে 'কপালকুণ্ডলা'ই উৎকৃষ্ট কাব্য হইয়াছে। যেগুলিতে স্বদেশ, সমাজ, ধর্ম্ম বা নীতির প্রেরণা আছে, সেইগুলিতেই স্থানে স্থানে বঙ্কিমের কল্পনার চরম স্ফূর্ত্তি হইয়াছে ;

* "তবে এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুচিত অনুশীলন ও স্ফূর্ত্তিতে আর কতকগুলি কার্য্যকারিণী বৃত্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই জন্য সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে কবিরা কাব্য ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে অকর্ম্মণ্য হয়। এ কথার যাথার্থ্য এই পর্য্যন্ত যে, যাহারা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুচিত অনুশীলন করে, অন্য বৃত্তিগুলির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টা পায় না, অথবা 'আমি প্রতিভাশালী, আমাকে কাব্যরচনা ভিন্ন আর কিছুই করিতে নাই' এই ভাবিয়া যাঁহারা ফুলিয়া বসিয়া থাকেন তাঁহারাই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন।.........বিজ্ঞান ও ধর্ম্মোপদেশ মনুষ্যত্বের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, কাব্যও সেইরূপ। যিনি তিনের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দিতে চাহেন, তিনি মনুষ্যত্ব বা ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম বুঝেন নাই।" 'অনুশীলন', সপ্তবিংশতি অধ্যায় ['চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি']।

চরিত্রের মহিমা ও ঘটনাসন্নিবেশের চাতুর্য্যে সেগুলি নাটকীয় সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়াছে। সমস্যার আওতায় বহুস্থানে গুরুতর ত্রুটি ঘটিলেও বঙ্কিমের যাহা কিছু শক্তি, তাহা যেন এই সমস্যার সংঘাতেই উপলাহত ইস্পাত-ফলকের মত স্ফুলিঙ্গ-বৃষ্টি করিয়াছে! অথচ এই ব্যক্তিই ভারতীয় অতুলন স্নেহ-হাস্য উপেক্ষা করিয়া, বেদীর নীচে না বসিয়া—মন্দির-রক্ষায় তৎপর হইয়াছিল! চিত্তশুদ্ধি ও মনুষ্যত্ব আগে, কাব্য পরে—এ কথা বলিবার বঙ্কিমের কি প্রয়োজন ছিল? এ ভাবনা তাঁহার কেন?—কি জন্য? বঙ্কিমসম্বন্ধে সেই কথাটাই ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

তথাপি বঙ্কিমের উপন্যাসের চেয়ে বঙ্কিম বড়। তিনি শুধু সাহিত্যস্রষ্টা শিল্পী নহেন—নব্য বঙ্গসাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা। যে গুণে তাহা সম্ভব হইয়াছিল তাহা এই যে, তিনি যত বড় শিল্পী ছিলেন তার চেয়ে বড় ছিল তাঁহার পৌরুষ। তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে করিতে সর্ব্বাগ্রে এবং সর্ব্বদাই মনে হয়—Ecce Homo! Behold the Man! "The first and last word in literature as in life is character."—এই character আমাদের সাহিত্যে এত বড় আর কাহারও ছিল না। সজ্ঞান আদর্শ-নিষ্ঠা, নিজের প্রতি গভীর বিশ্বাস, সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তি, এবং সর্ব্বশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিবার নিয়ত আকাঙ্ক্ষা—এই সকল গুণ একত্র হইলে জীবনে যে সত্য আচরিত হয়, সাহিত্যেও সেইরূপ সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই সত্যের জোরেই সাহিত্য বড় হয় ও বাঁচিয়া থাকে। সাহিত্য-রচনায় আত্মবিস্মৃত শিল্পী যে আনন্দ-মুক্তির আস্বাদ পায়, বঙ্কিমের তাহাতে লোভ ছিল না; সে বিষয়ে এতখানি শক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজের সেই মুক্তির পরিবর্ত্তে জাতির চিত্তশুদ্ধি চাহিয়াছিলেন। যে মনুষ্যত্বের বিকাশ হইলে, জাতির জীবনে উৎকৃষ্ট সাহিত্য আপনি সম্ভব হয়, বঙ্কিম সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠায় তাঁহার সকল শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক জন মর্লির সাহিত্য-সাধনার পরিচয় দিয়া একজন সমালোচক বলিয়াছেন—"Literature, in a word, was with John Morley not so much an end in itself as a means to a farther end, which was social, not individual".—বঙ্কিমের মত একজন সাহিত্যস্রষ্টার পক্ষেও এ কথা খাটে, ইহাই বঙ্কিম-প্রতিভার গৌরব।

বঙ্কিম যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা হয় নাই। আমরা বঙ্কিমকে ভাল করিয়া বুঝি নাই, এমন কি ইতিমধ্যেই তাঁহাকে ভুলিতে বসিয়াছি। আমরা তাঁহার উপন্যাসই পড়ি—হয় ত' তাহাও আর পড়ি না—পড়িয়া Literary Aesthetics-এর সূত্র ধরিয়া তাহার দোষগুণ বিচার করি; হয় ত 'ভালো লাগে না' বলিয়া এই সাহিত্যিক উন্নতির যুগে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সূক্ষ্ম ও মার্জ্জিত রুচির পরিচয় দিই। বঙ্কিম যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা হয় নাই; যেটুকু মোড় ফিরিতেছিল, অর্দ্ধপথেই তাহা ঘুরিয়া গিয়াছে। তিনি যে-ধর্ম্মের উপর মনুষ্যত্ব এবং মনুষ্যত্বের প্রয়োজনে সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাকে দূর করিয়া আমরা এখন সর্ব্ববন্ধনমুক্ত হইয়া সাহিত্যের কামলোকে বিচরণ করিতেছি—জাতিহিসাবেও

ভব-বন্ধন-মুক্ত হইতে বোধ হয় আর বেশী বিলম্ব নাই! আমরা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-আলোচনা করি—সৃষ্টি করিতে পারি না; বিশুদ্ধ আর্টতত্ত্বের রোমন্থন করি—কিন্তু জীবনে শক্তি সঞ্চার হইবে কিসে সে ভাবনা ভাবি না। জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তির মূলে যে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মসাধনার প্রয়োজন আছে তাহা আমাদের নিকট এতই তুচ্ছ, এবং সাহিত্যের আদর্শ এতই উচ্চ যে, যে-বস্তু সাহিত্যও নয়—যাহার পঙ্কিল উচ্ছ্বাসে জাতীয় জীবনের অধঃপাত সূচিত হইতেছে, তাহার সমালোচনাও আর্টের দিক দিয়াই করিতে হইবে, ধর্ম্ম বা সমাজনীতির কথা সেখানেও চলিবে না! যদি সাহিত্যহিসাবে আলোচনার যোগ্য হয়—আলোচনা কর, না হয়, কোন আলোচনাই করিও না—ইহাই dilettante-দিগের অভিমত! যেন সাহিত্যের আদর্শই জীবনের একমাত্র আদর্শ, আর যাহা কিছু—তাহার পক্ষ হইতে কোন বিষয়েই কিছু বলিবার নাই। তাই এ দুর্দ্দিনে বিশেষ করিয়া বঙ্কিমকেই স্মরণ করি।

বৈশাখ, ১৩৩৫

বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্র

১. যুগসঙ্কট ও যুগধর্ম্ম

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসই এ যুগের সারা ভারতের ইতিহাস। ওই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই এই বাংলা দেশে যুগব্যাপী প্রাচীন সংস্কারের জড়ত্ব আঘাত পাইতে থাকে।

আমার এই আলোচনা মুখ্যত সাহিত্যিক, নতুবা দেখা যাইত, কত রূপে ও কত দিকে এই যুগধর্ম্মের লক্ষণ সেকালে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আন্দোলনেও যেমন, ব্যক্তির জীবনেও তেমনই, ইহার প্রভাব অল্প অনুভূত হয় নাই। আমাদের জীবনে যেটুকু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছিল—এখনও আছে, তাহা অধ্যাত্ম-জীবনের—মোক্ষমার্গের; ওই অধ্যাত্মিক প্রয়োজনে সমাজের বিধি-বিধানের মূলে—মুখ্যভাবে না হইলেও, গৌণভাবে—যে বেত্রদণ্ড উদ্যত ছিল তাহাতে মানুষের সহজ বিচার-বুদ্ধিও যেমন পথ পাইত না, তেমনই তাহার পৌরুষও পদে পদে খণ্ডিত হইত—ব্যক্তিরই স্বাধীন কর্ম্মে তাহা চরিতার্থ হইতে পারিত না।

নব্য বাংলা-সাহিত্যে নবযুগের বোধন—একটা নূতনের প্রবল প্রেরণা—ভাবে, কর্ম্মে ও চিন্তায় এ জাতির জীবনীশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। তখন একটা নূতন পথে যাত্রার ব্যাকুলতা—অন্তরের অন্তরে কেবল বন্ধন-ছেদনের অধীরতাই প্রবল। একদিকে সমাজ একটা বিরাট অচলায়তন হইয়া ব্যক্তির শ্বাসরোধ করিতেছে, অপরদিকে একটা অজ্ঞাত অপরিচিত গতি-পথ নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাস-দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও যুক্তিমন্ত্রে আকর্ষণ করিতেছে। এ পথ একরূপ মুক্তিপথই বটে, তখন মুক্তির আশ্বাসই বড় আশ্বাস; অধিক ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ তখন কোথায়? বাঙালীর প্রাণ নিছক চিন্তাবিলাস অথবা ভাবের উন্মাদনায় অতি সহজেই তৃপ্তিলাভ করে, তাই তত্ত্বের সত্য অপেক্ষা তত্ত্বের ভাবাবেগ তাহাকে বিচলিত করিল, এবং জীবনের ক্ষেত্র-বিশেষে কর্ম্মের আদর্শহিসাবেও এই মুক্তিমন্ত্র বরণীয় হইয়া উঠিল। তথাপি সংশয় ঘুচিল না, বরং তাহার সমাধান-চেষ্টা ভিতরে ভিতরে আরও বাড়িয়া উঠিল। রামমোহনে যাহা প্রধানতঃ বিচারের ক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল, বিদ্যাসাগরে যাহা সেবা-ধর্ম্মের আবরণে কতকটা আবৃত ছিল, এবং মধুসূদনে যাহা নিরুপদ্রব রসসৃষ্টিতেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল,—কোনখানে সমাজকে প্রত্যক্ষভাবে অস্বীকার করে নাই, তাহাই শেষে গুরুতর সমস্যারূপে ব্যক্তির চিত্ত আক্রমণ করিয়াছে,—শুধুই মানবধর্ম্ম নয়, ব্যক্তির স্বতন্ত্র ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসারূপে এক নূতন প্রেরণা হইয়া উঠিয়াছে। এইবার সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বে, নবযুগের সেই নবধর্ম্মের—মানব-ধর্ম্মেরই—কঠিন পরীক্ষা আরম্ভ হইল। দেশের ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় ঘোরতর সংশয়বাদী হইয়া উঠিলেন, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা অর্দ্ধপথেই দ্বিধাগ্রস্ত হইল। মনুষ্য-জীবনের অর্থ কি? মানুষের জ্ঞানে সত্যের ধারণা সম্ভব কি না? লোকহিতের

আদর্শ কি? ধর্ম্ম কাহাকে বলে? সমাজের মুখাপেক্ষিতা ব্যক্তির পক্ষে কতদূর আবশ্যক? ব্যক্তির যে স্বাধীনতা—মানুষের যাহা অপেক্ষা অধিক গৌরব নাই, তাহার সহিত শেষ পর্য্যন্ত সামাজিক জীবনের আপোস আদৌ সম্ভব কি না? নূতন মানব-ধর্ম্মের যে উদার ভাবাবেগ, মানুষের হৃদয়-মনের শক্তিসম্বন্ধে যে অপরিমিত আশ্বাস—তাহার প্রেরণা ও উল্লাস এমনই নানা চিন্তায় সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া উঠিল; ব্যক্তি-ধর্ম্ম ও সমাজ-ধর্ম্মের মধ্যে যে সঙ্গতির প্রয়োজন, তাহার উপায়-সন্ধানে সেকালের ভাবুক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। এই সমস্যাই প্রধান সমস্যা হইয়া উঠিবার কারণ—ব্যক্তির স্বাধিকার-বোধের উগ্রতা; এবং ইহারও কারণ, বিদেশী শিক্ষার প্রভাবে স্বদেশীয় সমাজের সেই অবনত অবস্থার প্রতি প্রবল অশ্রদ্ধা ও অসহিষ্ণুতার উদ্রেক। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাঙালীর নব-জাগরিত ব্যক্তিমানসে সেই যুগ-প্রবৃত্তিই একটা গভীরতর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।

চাঞ্চল্যের একটা বড় কারণ নিশ্চয় এই যে, ওই নূতন মানব-ধর্ম্মের প্রেরণা সার্ব্বভৌমিক হইলেও, এ জাতির সাধনায় তাহাকে সত্য করিয়া তুলিতে হইলে তাহাকে তাহার রক্তগত সংস্কারের অনুকূল করিতে হইবে, এদেশের জলমাটিতেই তাহাকে রোপণ করিতে হইবে। প্রাণের নির্জ্জীবতা দূর করিবার পক্ষে এমন রসায়ন আর নাই, শুধু রসায়ন নয়, ইহা স্বর্ণঘটিত সালসাই বটে। মানবত্বের এই মহিমা-বোধই—সমগ্র জগতে মানবজাতির নব-জাগরণ, মানবেতিহাসে যুগান্তর সূচনা করিয়াছে, ইহার ফলেই মধ্যযুগের অবসান হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য এই যে, তাহার অতি প্রাচীন সাধনা ও সংস্কৃতির ধারা এখনও লুপ্ত হয় নাই, যখনই কোন নূতন ভাব-চিন্তা বা নবধর্ম্মের আঘাতে তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, তখনই সে তাহার সেই চিরন্তন সংস্কৃতি স্মরণ করে; নূতনকে পুরাতনের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া যুগধর্ম্মকেও সনাতনের সঙ্গে মিলাইয়া, তবে সে তাহার সঙ্গে রফা করিয়া থাকে। এবারেও সে যতক্ষণ না এই নূতন মানুষকে ও তাহার নূতনতর মহিমাকে সেই পুরাতন অধ্যাত্ম-তত্ত্বের দ্বারা শোধন করিয়া লইতে পারিয়াছে, ততক্ষণ সে তাহাকে অন্তরের অন্তরে গ্রহণ করে নাই—তাহার পূর্ণজাগরণে বাধা ঘটিয়াছে। এই নূতন মানব-ধর্ম্মের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যে য়ুরোপীয় সংস্কার ক্রমেই উন্মুখ হইয়া উঠিল, তাহা ভারতীয় সংস্কারের বিরোধী; তথাপি এই বিজাতীয় সংস্কার আর সকলের উপরে জয়ী হইবার উপক্রম করিল।

ইহার ফলে, মনুষ্যজীবন বা মনুষ্যহৃদয়-সম্পর্কিত সর্ব্ববিষয়ে আর সেই বিস্ময়, শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি রহিল না, বরং পাপ-পুণ্য, শুচি-অশুচি, শ্লীল-অশ্লীল, ভব্য-অভব্য প্রভৃতির সম্বন্ধে এক নূতন বিবেক-বুদ্ধি অতিমাত্রায় সজাগ হইয়া উঠিল। এই বিবেক-বুদ্ধি আর কিছুই নয়—ইহাও সেই আত্মাভিমান-প্রসূত এক প্রকার মানস-ব্যাধি। বলা বাহুল্য, এই morality-সংস্কার জাতীয় সংস্কৃতির বিরোধী; তথাপি সে যুগের প্রায় সকল মনীষী ও কর্ষিতচিত্ত মানুষ এই সংস্কারের অল্পাধিক বশীভূত হইয়াছিলেন। এক দাসত্বের বদলে আর এক দাসত্ব গৌরবজনক হইয়া উঠিল—যাহারা শাস্ত্রবাক্য বা আপ্তবাক্যের শাসন মানিল না, তাহারাই অতি-সংকীর্ণ অহং-বুদ্ধির দাসত্ব করিয়া

আত্মার মর্য্যাদারক্ষায় অধীর হইয়া উঠিল। এই যে সংস্কার ইহার জন্য যুগ-প্রবৃত্তিই দায়ী নয়, ইহা সেই প্রবৃত্তির একটা বিকার; ইংরাজী শিক্ষার অন্তর্গত খ্রীষ্টানী বা সেমিটিক থিয়লজি, পাপ-বাদ বা দেহ-আত্মার বিরোধ-বাদ হইতেই ইহা সংক্রামিত হইয়াছিল। সেকালের শিক্ষিত বাঙালী বহু সামাজিক প্রথা ও পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে লজ্জাবোধ করিতে লাগিল—এমনই রুচিবায়ু ও শুচিবায়ুগ্রস্ত হইল যে, মানুষহিসাবেই মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা আর রহিল না; তাহার দেহ ও মন—দুইই ধোপা-কাচা করিয়া না লইলে, তাহার ভাষার গ্রাম্যতা-দোষ দূর না হইলে, তাহাকে দূর হইতে কৃপার চক্ষে দেখা ভিন্ন আর কিছু করা চলে না। এই কারণে মানব-ধর্ম্মকেই জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা শোধন করিয়া লওয়া বড়ই আবশ্যক হইল। সে ধর্ম্মের মুখ্য অভিপ্রায়—ওই দেহ-মনের পরিচ্ছন্নতা-সাধন; এজন্য তাহাতেও ভগবৎ-সাধনার যে বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক ক্ষুধা—তাহাকে গৌণ করিয়া ওই morality-ই মুখ্য হইয়া উঠিল। এক বিষয়ে সে ধর্ম্মও যুগ-প্রবৃত্তির অনুকূল, কারণ তাহাতে কোন মিষ্টিক-সাধনার স্থান নাই—মানুষেরই স্বার্থ বা বুদ্ধি-নির্দ্ধারিত কল্যাণ—একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া বরণীয় হইয়াছিল; ভগবানকেও মানুষের উপাস্য হইতে হইলে, তাহর জ্ঞান-বুদ্ধি ও হিতাহিত-ভাবনার দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং নীতি-দুর্নীতি-সংস্কারের অধীন হইয়া আবির্ভূত হইতে হইবে।

সে যুগের সেই নবধর্ম্ম-প্রেরণা অবশেষে এমনই একটা বিপথে পড়িয়া তাহার সেই আদি-প্রবৃত্তির উদাত্ততা ও প্রাণময়তা হারাইতে বসিয়াছিল। মনোধর্ম্মের সহিত হৃদয়ধর্ম্মের বিরোধ বাধিল, তাহার ফলে, মানুষের স্বাধীনতা-গৌরব সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া পড়িল—ব্যক্তির সহিত সমাজের, স্বাতন্ত্র্য-পন্থার সহিত লোক-সংগ্রহের, morality-র সহিত সর্ব্বভূতহিতের সমন্বয়-সাধনে বড়ই বাধা উপস্থিত হইল। একটা তত্ত্বের যুক্তিমাত্রকে বন্ধনরজ্জু করিয়া, তাহারই সাহায্যে দল-বাঁধা—সেও যেমন মানুষকেই ছোট করা, তেমনই সমাজের সহিত কোনরূপ সত্য-বিশ্বাসের যোগ না রাখিয়া সকল বিশ্বাস সকল মতবাদ পরিহার করিয়া স্বাতন্ত্র্য-সুখ ভোগ করা—সেও একরূপ আত্মহত্যা। এমনই একটা আধ্যাত্মিক সঙ্কট ক্রমে দেখা দিয়াছিল, নাস্তিকতাই একটা উচ্চাঙ্গের নীতি হইয়া উঠিয়াছিল। ঠিক এই কালেই বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। যুগ-প্রবৃত্তির সকল লক্ষণ—তাহার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া—তখন চারিদিকে প্রকাশ পাইয়াছে। পাদ্রী কৃষ্ণমোহনের খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচার; বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নব ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মানবসেবা; অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল, মহেন্দ্রলাল প্রভৃতির জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চা; আচার্য্য কৃষ্ণকমলের নিরীশ্বর জ্ঞানযোগ ও মানব-পূজার মন্ত্রজপ;—একদিকে এতগুলি পন্থা, এবং অপর দিকে কবি মধুসূদনের কাব্যচ্ছন্দে মানবগৌরব-গীতির ভেরী-রব—বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য আসর যেন সুসজ্জিত হইয়া আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রও এই যুগেরই সন্তান—নব মানব-ধর্ম্মের মন্ত্র তাঁহার পক্ষে নিষ্ফল হওয়া দূরে থাক, সেই মন্ত্রই তাঁহাকে এমন গভীরভাবে বিচলিত করিয়াছিল যে, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না—তিনিই তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভাবলে সেই

মন্ত্রকে পূর্ণ-সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনিই সেই মন্ত্রকে মন্ত্রদ্রষ্টার মত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—বুঝিয়াছিলেন যে, নবযুগের ধর্ম্ম এই মানব-ধর্ম্মই বটে, পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের উপরেই মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে। কিন্তু আর একটি যে বড় তত্ত্ব তিনি তাঁহার পূর্ব্বগামিগণের পন্থাবিশেষ হইতে লাভ করিয়াছিলেন তাহারই প্রভাব তাঁহার সর্ব্বচিন্তার মূলে চিরদিন বিদ্যমান ছিল, তাহারই অনুচিন্তনে ও একাগ্র ধ্যানে তিনি মানব-জীবনের মহত্ত্ব ও সদর্থ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পরিয়াছিলেন।

এই তত্ত্বটির নাম—মানব-প্রীতি। কবে কেমন করিয়া ইহার বীজ তাঁহার অন্তরে এমন গভীর-প্রবেশ লাভ করিয়াছিল সে সংবাদ আমাদের জানা নাই; বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য জীবনচরিত আজও লিখিত হয় নাই—এ কলঙ্ক রাখিবার স্থান নাই। শোনা যায়, তিনি প্রথম বয়সেই ফরাসী দার্শনিক আগুস্ত কোঁৎ(Auguste Comte)-এর Positivism বা বিজ্ঞানসম্মত মানব-সেবা-ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইহার কারণ এই বলিয়া মনে হয় যে, তিনি মনুষ্য-ব্যক্তি অপেক্ষা মনুষ্য-জাতির কল্যাণকে—ব্যষ্টি অপেক্ষা সমষ্টির গৌরবকে উচ্চতর সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এই বিশ্বাসই ছিল তাঁহার জন্মগত (বা জন্মান্তরীণ) সংস্কার—তাঁহার প্রতিভার মতই প্রাক্তন সম্পদ। ইহারই প্রেরণায় তিনি নবযুগের সেই নূতন প্রবৃত্তিকে একটি পূর্ণ ও সার্থক রূপ দিতে পারিয়াছিলেন—ইহারই প্রেরণায়, তিনি উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্যে, তথা বাঙালীর সংস্কৃতিতে জীবন-সাধনার এক নূতন তন্ত্র—রসে, রূপে, চিন্তায় ও ভাবের ঐশ্বর্য্যে—দশভুজা-মূর্ত্তির মত সাকার করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই তত্ত্বের সজ্ঞান আশ্রয় যে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবেই ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ সেকালের হিন্দু-শিক্ষা-দীক্ষায় বা হিন্দু-ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠানে ইহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ ছিল না। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মগত সংস্কার যেমনই হউক, তাঁহার সজ্ঞান ভাবচিন্তার যাহা কিছু মৌলিকতা তাহার মূলে ছিল নবযুগের নূতন মনোভাব, এবং তাহা যে কতখানি ঐ ইংরেজী শিক্ষার ফল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। এই মনোভাবই জাতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির যোগে তাঁহার প্রতিভাকে এমন সৃষ্টি-সাফল্যে মণ্ডিত করিয়াছিল।

আমরা দেখিয়াছি, মানবধর্ম্মের এক অভিনব প্রেরণাই এই যুগ-ধর্ম্ম বা আধুনিকতার নিদান। ইহাও দেখিয়াছি, যাহা প্রথমে প্রাণ-মনের প্রবল আকুতিরূপেই একটা বিদ্রোহের সূচনা করিয়াছিল—তাহাই শেষে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যস্পৃহাকে প্রবল করিয়া ভাবচিন্তার ক্ষেত্রে, এবং জীবনেও, নানা বিপর্য্যয় উপস্থিত করিয়াছিল, এবং ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও কর্ম্মজিজ্ঞাসাকে যেমন উন্মুখ করিয়াছিল, তেমনই মনুষ্যত্বের উদার আদর্শকেও ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। শেষে ব্যক্তি ও সমাজের সেই চিরন্তন বিরোধই নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল—মনুষ্যত্বের মহিমা নয়, তাহার তলদেশের পঙ্করূপ দুর্ব্বলতাই নূতন ছদ্মে আত্মপ্রকাশ করিল। মানব-সেবার পরিবর্ত্তে সাম্প্রদায়িক শুচিতা-রক্ষাই প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল—জনহিতার্থে আত্মোৎসর্গ অপেক্ষা

উন্নত স্বার্থবুদ্ধিই সংযমশীলতা ও চরিত্রের নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইল। আসল কথা, নূতন মানব-ধর্ম্মের বিকৃত রূপ দাঁড়াইল—ব্যক্তির ব্যক্তিত্বসাধন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম হইতেই এই তন্ত্রের সংকীর্ণতা এবং তত্ত্বহিসাবেও ইহার অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। মানুষের মহিমা তাঁহাকে যেভাবে যতখানি শ্রদ্ধান্বিত করিয়াছিল—তেমন বোধ হয় তাঁহার পূর্ব্বে আর কাহাকেও করে নাই। তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্রে' তিনি যে মূর্ত্তি গড়িবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহাও যেমন মানুষেরই মহিমময় মূর্ত্তি, তেমনই, তাঁহার উপন্যাসগুলিতে—বাংলা সাহিত্যের সেই অতুলনীয় কাব্যকীর্ত্তিগুলিতেও—তিনি মানুষের সেই অভাবনীয় নিয়তিকেই, তাহার দেহ-মন-প্রাণ ও আত্মার ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনিই এ-যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবন-রস-রসিক কবিশিল্পী; তাঁহারই স্রষ্টাসুলভ কবিদৃষ্টিতে—কাম ও প্রেম, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, চরিত্র-নীতি ও প্রাণ-ধর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, প্রাকৃত ও অতি-প্রাকৃত—এক বৃহত্তর সত্যের আশ্রয়ে পাশাপাশি স্থানলাভ করিয়াছে। তিনি মানব-প্রীতি ও চরিত্র-নীতি এই দুইয়েরই অসম্পূর্ণতা ঘুচাইয়া, যত কিছু ব্যর্থতা ও সংকীর্ণতা সত্ত্বেও, মানুষের মহিমাকে আধুনিক যুগ-ধর্ম্মের অনুরূপ করিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

২. বাঙালী-চরিত্র ও বাংলার সংস্কৃতি

আমি অতি-আধুনিক কালের কথা বলিতেছি না, গত শতাব্দীর সেই যুগ সন্ধিক্ষণের কথা বলিতেছি। তখন বাঙালীর দেহ সবল ছিল, মনও সেই হিসাবে সুস্থ ছিল। কিন্তু সে-মন স্বভাবতই অলস; বাংলার জল-মাটির অতিরিক্ত আর্দ্রতা এবং বাঙালীর রক্তগত আলস্যের অহিফেন-রস বাঙালীকে কখনও কোনও দীর্ঘস্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা বৃহদায়তন কীর্তিস্থাপনে উদ্যমশীল হইতে দেয় নাই। সে ক্ষুদ্র আয়তনের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে যেরূপ পটু, বৃহদায়তন দেবমন্দির-নির্ম্মাণে তেমন কৃতী নয়; একখানা বসত-বাটিও দৃঢ় করিয়া বড় করিয়া গড়িবার প্রয়োজন সে কখনও অনুভব করে নাই। এ-জাতির পূর্ব্ব-ইতিহাস এখনও উদ্ধার হয় নাই। যেটুকু নিঃসংশয়ে বলা যায় তাহা এই যে, মাত্র হাজার-বারো-শত বৎসর পূর্ব্বে বাংলা ভাষার উদ্ভব হইয়াছে—অর্থাৎ, প্রায় ওই সময়ে একটা বিশিষ্ট জাতিহিসাবে বাঙালী ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল; নানা জাতির নানা রক্তের স্রোত অবশেষে একটা ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে মিশ্রণের ফলে, সেই সময় হইতে (তৎপূর্ব্বে ঠিক এই type-এর উদ্ভব হয় নাই—বাসের ভৌগোলিক সীমানাও স্থির হয় নাই) একটা অতিশয় অর্ব্বাচীন জাতির ইতিহাস আরব্ধ হইয়াছে। ইহার পরেও ভৌগোলিক সীমানা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মিশ্রণ-ক্রিয়াও চলিয়াছে; কিন্তু তখন সেই race-type—সেই ছাঁচ বাঁধা হইয়া গিয়াছে, নূতন মিশ্রণ পুরাতনকেই পুষ্ট করিয়াছে। কিংবা, যেমন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়—বাংলাদেশের আধুনিক ভৌগোলিক সীমানার চতুষ্প্রান্তে সেই মিশ্রণ সুসাধিত হয় নাই—ঐ সকল প্রত্যন্তবাসী বাঙালীর চেহারায় ও সংস্কৃতিতে বেশ বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যাহা বলিতে-ছিলাম; এ জাতি চরিত্রে যেমন দুর্ব্বল, ভাবুকতায় ও মেধায় তেমনই শক্তিমান—

যেমন কর্মকুণ্ঠ, তেমনই কল্পনা-কুশল। ইহার ফলে, সে যেমন আত্মসুখ-বিলাসী, তেমনই আত্মপরায়ণ—Egoist। বাস্তবের আরাধনায় সে যেমন ক্ষুদ্রচেতা, অবাস্তবের সাধনায় সে তেমনই ভাবের আবেগে আত্মহারা। এই দুই বিপরীত প্রবৃত্তিই তাহার স্বভাবে প্রবল হইয়া আছে, ইহার কারণ—সেই মজ্জাগত আলস্য। তথাপি ভাব বা তত্ত্বকে বস্তুরূপে স্পর্শ করার যে আকাঙ্ক্ষা তাহারই বলে একদা বাঙালী একটি বিশেষ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, এই বাংলাদেশে তন্ত্র-ধর্ম্মের যেরূপ উৎকর্ষ হইয়াছিল তেমন আর কোথাও হয় নাই। ভাবই যে বাঙালীর প্রাণের আরামস্থল, তার প্রমাণ আজিও মিলিবে। এই ভাবকেই আশ্রয় করিয়া সে একদা একবারমাত্র জীবনে যে উন্মাদনা আনিয়াছিল, শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত সেই ভাবোন্মাদনার স্রোত এখনও একেবারে স্থির হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে সেই একবার বাঙালী জাতির ভাবজীবনে জাগৃতি ঘটিয়াছিল—আর একবার তাহার মনের জাগৃতি ঘটিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। এবারে বাহিরে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইলেও ভিতরে তাহার শক্তি—দেহে ও মনে—পূর্ণমাত্রায় ছিল; ছিল না কেবল জীবনে তাহার উৎসরণ। বাহির হইতে একটা বড় ধাক্কা না পাইলে তাহার চৈতন্য সাড়া দেয় না, জীবনে ঢেউ উঠে না। সেবারে ছিল ইসলাম-ধর্ম্ম ও তাহার সংস্কৃতির আঘাত, এবারে ইংরেজী শিক্ষা ও খ্রীষ্টিয়ান-সভ্যতার আক্রমণ।

এবারকার আক্রমণ এক হিসাবে আরও গুরুতর—এ আক্রমণের আঘাত কেবল ভাবজীবনেই সম্বরণ করা সম্ভব নয়। সেবার আক্রমণকারী ও আক্রান্ত উভয়ের মধ্যে বহির্গত বিরোধ যেমনই থাক, ভিতরে একটা সগোত্রতা ছিল,—শেষ পর্য্যন্ত দুই-ই প্রাচ্য আদর্শ; জীবনকে দেখিবার ভঙ্গী যতই ভিন্ন হউক, ধর্ম্ম-তত্ত্বের প্রাধান্য কোনটাতেই কম ছিল না। এবার যাহার ধাক্কা ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিল তাহার প্রধান অস্ত্র ধর্ম্ম-তত্ত্ব নয়—জীবন-তত্ত্ব। এ কোন তত্ত্বও নয়—বাণী, দেহ-মন-প্রাণের উদ্দীপন-মন্ত্র; ইহার শাস্ত্র-গ্রন্থ—প্রকৃতি, সাধন-যন্ত্র—দেহ। প্রাকৃতিক সৃষ্টির মূলে যে নিয়ম রহিয়াছে—মানুষ সেই মহানিয়মের সচেত—বিগ্রহ; সে নিয়মও যেমন স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত, মানুষের মধ্যেই তেমনই তাহার সুস্থ ও স্বাধীন বিকাশ। এজন্য মানুষের ভাগ্য মানুষেরই অধীন; ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ প্রভৃতি যতকিছু ফলাফল তাহা সেই প্রকৃতিদত্ত শক্তিরই বিকাশ-সাপেক্ষ। অতএব মনুষ্য-জীবনের যতকিছু ভাব-অভাব, প্রয়াস-প্রবৃত্তি—সে-জীবনের যতকিছু অভিব্যক্তি—সকলই পরম শ্রদ্ধা ও সাধনার বস্তু। মানুষের দেহলীলার প্রতি এই যে নবজাগ্রত শ্রদ্ধা—এই যে মানুষ কর্ত্তৃক আপন মানুষী মহিমার আবিষ্কার—ইহাই যুরোপীয় ইতিহাসের বহুপ্রসিদ্ধ সেই Renaissance; ইহা হইতেই Humanism নামক এক নব ভাবের উৎপত্তি;—আমাদের ভাষায় এখনও যাহার অনুরূপ শব্দ আমরা তৈয়ার করিয়া লইতে পারি নাই; ইহারই কারণে প্রত্যক্ষ জগৎ ও মানবীয় কীর্ত্তি-সংক্রান্ত যত কিছু বিদ্যার—Humanities নামে নূতন গৌরবলাভ; অতএব এবারে আমাদের অলস, অথবা সুপ্ত চৈতন্যে যে আঘাত লাগিয়াছিল তাহা যেমন রূঢ়, তেমনই মোহকর; বাঙালীর পক্ষে এ আঘাত সহজে সম্বরণ করা অসম্ভব।

আমি বাংলার নবযুগ, সেই যুগের প্রধান প্রবৃত্তি, জাতির চিত্তে তাহার প্রতিক্রিয়া, এবং তদ্ঘটিত যে সমস্যা—ও সেই সমস্যারই সমাধানে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভার যে অনন্যসাধারণ কীর্ত্তি,—এ প্রবন্ধে মুখ্যত তাহারই আলোচনা করিতেছি ; এজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-প্রতিভার বিশেষ পরিচয় এখানে অবান্তর। তথাপি এ আলোচনা মুখ্যত সাহিত্যিক, এ কথাও মনে রাখিতে হইবে ; তাই যুগ ও জাতির নানা তত্ত্ববিচারকালে সাহিত্যের তত্ত্বও আসিয়া পড়িতে বাধ্য ; কেবল লক্ষ্য রাখিতে হইবে, সেই সকলের মধ্যে কার্য্যকারণের সম্বন্ধ কতটুকু, এবং কোথায়। বিষয়টি জটিল ও বিস্তৃত হইবার আরও কারণ, ইহাতে দুইটি বিপরীত কাল্‌চারের সংঘর্ষ ও সমন্বয়-প্রয়াসের তত্ত্ব রহিয়াছে ; সেই সমন্বয়ে শুধুই ব্যক্তির প্রতিভা নয়, একটা জাতির অতিশয় মিশ্র ভাব-সংস্কার, এবং তাহারও অন্তস্তলে এক প্রাচীনতর সংস্কৃতির সমান প্রভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে আমরা সেই সকল সংস্কার ও সংস্কৃতি, ভাব ও চিন্তার—সমাহার ও সামঞ্জস্য সন্ধান করিব ; তজ্জন্য প্রত্যক্ষ ও অনুমান, দুইয়েরই সাহায্য লইতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম, বাঙালীর তথা ভারতীয় মনঃপ্রকৃতিতে মানুষের জীবনকে আধুনিক দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। এই দৃষ্টির মূলে কেবল ব্যক্তির দৈবী প্রতিভাই ছিল না, জাতির বিশিষ্ট সংস্কৃতিও তাহার পক্ষে অল্প সহায়তা করে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই প্রতিভাকে আমি বস্তু ও ভাবের অভেদ-দৃষ্টির প্রতিভা বলিয়াছি ; ইহাও বলিয়াছি যে, য়ুরোপীয় জীবন-বাদ হইতেই তিনি সে বিষয়ে সাক্ষাৎ সজ্ঞান প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। আমি ইতিপূর্ব্বে বাঙালীর জাতিগত সংস্কার ও সংস্কৃতির কথাও কিছু বলিয়াছি ; এ কথাও বলিয়াছি যে, সকল উৎকৃষ্ট কবি-প্রতিভা, যতই ব্যক্তিগত অথবা নৈর্ব্যক্তিক হউক—তাহা জাতি-মানসেরও প্রতিভূ। ভারতবর্ষের নবযুগ-উদ্বোধনে বাঙালীই যে পৌরহিত্য করিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ ইহাই নয় যে, ইংরেজী বা য়ুরোপীয় বিদ্যার সহিত প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাহারই হইয়াছিল—সেই শিক্ষাকে বরণ করিবার আগ্রহ ও আত্মসাৎ করিবার শক্তিই মূল কারণ। ইহারও কারণ কি? পূর্ব্বে বাঙালী-চরিত্র সম্পর্কে তাহা বলিয়াছি। বাঙালী যেমন সূক্ষ্ম ভাব-কল্পনা ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতি-রসের রসিক, তেমনই সে সেই রসকে বস্তু বা বিষয়-নিরপেক্ষরূপে ভোগ করিতে ইচ্ছুক নয় ; সে এই দেহেরই সূক্ষ্মতর অধিষ্ঠানে, সহস্রদল নাড়ী-পদ্মে তত্ত্বমধু-ভুঞ্জনের পক্ষপাতী—সৃষ্টিকে একেবারে অস্বীকার করিয়া মহাকাশের নির্ব্বিকল্প সমাধি-রস আস্বাদন করিতে সে চায় না ; "বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়"—ইহা বাঙালী কবিরই মন্ত্রবচন, এমন কথা কোন যুগের কোন ভারতীয় কবি বলে নাই ; ব্যক্তি-বিশেষের কবি-কণ্ঠে তাহা উদ্‌গীত হইলেও বাঙালীর পক্ষে ইহা নূতন নয়। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, আবার বলি, সকল শ্রেষ্ঠ প্রতিভাই সেই জাতির অবচেতন মন হইতে রস-প্রেরণা লাভ করে ; অতএব এমন প্রতিভার সম্যক বিশ্লেষণ বা পূর্ণ পরিচয় করিতে হইলে জাতির ঐতিহ্য—তাহার চিরাগত সাধনার সন্ধান অত্যাবশ্যক।

আমি পরে ভারতীয় সনাতন-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছি; এক্ষণে আর একবার বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-দর্শনের প্রেরণা ও প্রকৃতি বুঝিবার জন্য বাঙালীর সেই জাতিগত সংস্কার ও সাধনা-বিশেষের একটু পৃথক পরিচয় দিব। ভারতীয় ভাবের দ্বারা যতই প্রভাবিত হউক, দেশের প্রাকৃতিক প্রভাব ও জাতির রক্তগত স্বভাবের গুণে বাঙালীর সাধনায় যে একটা বিশেষ লক্ষণ বা বৈলক্ষণ্য আছে তাহার প্রমাণ, বাঙলার বৈষ্ণব ও তন্ত্রধর্ম্ম। এই দুইয়ের মধ্যে তন্ত্রই আদি বা মূল বলিয়া মনে হয়, কারণ বৈষ্ণব-সাধনার পদ্ধতি তান্ত্রিক না হইলেও তাহার মূলতত্ত্বে তন্ত্রের প্রভাব আছে; তাহার রাধা-তত্ত্ব তন্ত্রের শক্তি-তত্ত্বেরই প্রকারভেদ। বৈষ্ণবের নাম-জপ বা নাম-কীর্ত্তনের তত্ত্বও তন্ত্রের মন্ত্র-তত্ত্বের অনুরূপ। তাহা ছাড়া, তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতিও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে নানা শাখার সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, তান্ত্রিক সাধনা বাঙালীর ধাতুগত। তথাপি, তন্ত্রের জ্ঞানমার্গ ও বৈষ্ণবের ভাবমার্গ যতই বিপরীত হউক, এই উভয় সাধনায়, বেদান্ত যাহাকে নাম-রূপ ও অবস্তু বলিয়া পরিহার করে, বাঙালী তাহাকেই বস্তুর সহিত অভিন্ন করিয়া, সৃষ্টিকে প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া, তাহারই সাহায্যে পরমের উপলব্ধি করিতে চায়। এ জন্য বাঙালীর বৈষ্ণব-মন্ত্র বিশেষ করিয়া 'রসো বৈ সঃ'-এর মন্ত্র; এবং তাহাতে সে যেমন রূপকেই আশ্রয় করিয়া, এই জীবন ও জগৎকে ভাবমন্ত্রে শোধন করিয়া, ইন্দ্রিয়গুলাকেই অতীন্দ্রিয় রসপানের যন্ত্র করিয়া লইয়াছে, তেমনই, তন্ত্রের জ্ঞানমার্গেও সে এই সৃষ্টিকে, এই বিষয়-জগৎকে, আরও সাক্ষাৎ ও দৃঢ়ভাবে ধরিয়া, বস্তুকে—ভাবরূপে নয়, তাহার অন্তরতম বস্তু-রূপেই অপরোক্ষ করিয়া, আত্মার পূর্ণ পরিতৃপ্তি সাধন করিয়াছে। এই দুই সাধনার কোনটিতেই খাঁটি সন্ন্যাস-বৈরাগ্য নাই; একটিতে অতিসূক্ষ্ম আত্মবিগলিত ভোগ, অপরটিতে অপ্রমত্ত বিষয়-সেবা; ভোগের এই দুই রূপেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় রহিয়াছে। তথাপি আমার মনে হয়, বাঙালীর দেহ-মন-প্রাণের পূর্ণ প্রস্ফুটনের ইতিহাস ওই তন্ত্র-সাধনাতেই মিলিবে। একদিকে প্রকৃতির বজ্রকঠিন প্রবৃত্তি-বন্ধন, অপর দিকে পুরুষের আত্মিক মুক্তি-পিপাসা, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য—প্রকৃতি ও পুরুষের সামঞ্জস্য—বাঙালীর সাধনাতেই ঘটিয়াছে।

এ যুগের জীবন-সাধনায় ততখানি তত্ত্বজ্ঞানের স্থান নাই—জীবনকে আর একরূপে দেখিবার প্রয়োজন হইয়াছে; এবং শুধুই জ্ঞান নয়, প্রেমের সাধনাও চাই। ব্যক্তির আত্মাকে দেহের জগতে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া পূর্ণ শক্তিমান করিয়া তোলার উপায় বা অনুকূল অবস্থাও আর নাই। যাঁহাকে এই যুগের প্রতিনিধি বলিয়াছি, সেই বঙ্কিমচন্দ্রও এই সাধনা ও সাধনতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন না, সম্ভবত ইহার সকল সংবাদও তিনি রাখিতেন না। কিন্তু য়ুরোপীয় ভোগ-বাদের স্বরূপ তিনি বুঝিয়াছিলেন,—সেই ভোগ-বাদকে তিনি অশ্রদ্ধা করিতে পারেন নাই; বরং যে জীবন-দর্শন তাঁহার প্রতিভায় ধরা দিয়াছিল তাহাতে ভোগ ও মোক্ষ—এই দুইয়ের সম্বন্ধ তিনি যেরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, এবং মানুষের জীবনে এই দুইয়ের বিরোধকে তিনি তাঁহার উপন্যাসে যে অভিনব ট্র্যাজেডির মহিমা দান করিয়াছেন, তাহাতে এক-

দিকে ভারতীয় মোক্ষ-বাদ ও অপরদিকে য়ুরোপীয় ভোগ-বাদ যেন লুকাচুরি খেলিয়াছে। দুইয়ের প্রতিই এই যে সমান শ্রদ্ধা, অথবা একটাকে বড় করিতে গিয়াও অপরটার প্রতি যেন প্রাণের প্রচ্ছন্ন পক্ষপাত—ইহার মূলে যে বাঙালীর সেই রক্তগত সংস্কারের—সেই তান্ত্রিক মনোভাবের—অজ্ঞান প্ররোচনা ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; সেই শাক্ত প্রকৃতি-পূজার বহুতর লক্ষণ তাঁহার কাব্যকল্পনায় ও ভাব-চিন্তায় স্ফুটতর হইয়া আছে।

আমাদের নবযুগে নব জীবন-বাদ যে এত শীঘ্র প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহারও একটা কারণ এই। ওই দ্বন্দ্বই আমাদের পক্ষে খুব বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল—উহা হইতেই আমরা মনুষ্য-জীবনের বাস্তবতা যেমন নূতন অনুভব করিয়াছিলাম, তেমনই উহারই কারণে, অধ্যাত্ম-নীতির উপরে ঐ চরিত্র-নীতিকে স্থান দিবার এমন আগ্রহ জন্মিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মানবধর্ম্ম-চিন্তায় ইহারই প্রভাব কিছু অধিক-মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। এ-স্থলে ইহাও বলিয়া রাখি যে, নবযুগের নব মানব-ধর্ম্ম এইরূপ ভোগ-বাদ ও তদনুধর্ম্মী চরিত্র-নীতির গণ্ডিতেই আবদ্ধ থাকে নাই—ওই ভোগ-বাদের সঙ্গে মানুষের আধ্যাত্মিক ক্ষুধাও কিয়ৎ-পরিমাণে যুক্ত হইয়াছিল, নতুবা বঙ্কিমচন্দ্রের ভারতীয় মনোবৃত্তি তাহাতে আকৃষ্ট হইত না।

কিন্তু আমি যে তান্ত্রিক ভোগ-বাদের কথা বলিতেছিলাম—তাহাতে কেবল দেহের নয়—সমগ্র মানব-সত্তার শ্রেষ্ঠতম অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায় আছে; প্রকৃতি ও পুরুষের অভেদ-তত্ত্বের উপরেই তাহার প্রতিষ্ঠা। সে ভোগ প্রজ্ঞাবান আত্মপ্রতিষ্ঠ পুরুষের ভোগ—তাহা যোগযুক্ত ভোগ; তাহাতে দেহ ও আত্মার সামঞ্জস্য-সাধন হয়। তাই তাহা একাধারে ভুক্তি ও মুক্তি। এ তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

কেবল ইহাই আর একবার স্মরণ করাইব যে, উপনিষদের ব্রহ্মবাদে যাহার অঙ্কুর, শাক্তের এই শক্তি-তত্ত্বে তাহারই পূর্ণ বিকাশ; এবং ইহাও স্মরণ করিতে বলি যে, হিন্দু-সাধনার ইতিহাস উপনিষদের যুগেই শেষ হইয়া যায় নাই—সেই এক তত্ত্বের অনেক experiment—জীবনে তাহার উপলব্ধির নানা পন্থা—সেই ইতিহাসকে বৃহৎ, বিচিত্র ও গৌরবময় করিয়াছে। আরও স্মরণ করাইতে চাই যে, যে বাঙালী-জাতিই এই নবযুগের নব ভাব-গঙ্গাকে জহ্নুর মত পান করিয়া জানু-পথে বাহির করিয়া দিয়াছে—সেই জাতি ওই তত্ত্বকেই একদা তাহার সাধন-বস্তু করিয়াছিল, এবং এখনও তাহার দেহ-মনের তন্ত্রীরাজিতে সেই স্পন্দন অনুভূত হইতেছে।

এই যে তন্ত্র-তত্ত্ব ইহা আধুনিক 'ফিলজফি' নয়—চিরযুগের জীবন-সত্য; সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিবার বস্তু—মুখ্যত experimental। ইহার বিশিষ্ট সাধন-পদ্ধতি যেমনই হউক—ইহার ওই তত্ত্ব আজিকার মানব-ধর্ম্মবাদের মধ্যেও উঁকি দিতেছে, কেবল সাধনার পদ্ধতিটাই আধুনিক জীবনের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। জীবনের কিছুকেই বর্জ্জন নয়, গ্রহণ করিবার যে আকুতি,—এই

দেহটা যে কোন অর্থে অশুচি নয়, ভোগের অধিকার যে একটা বড় অধিকার—মানুষের প্রাণের সেই নূতন অনুভূতি, ইহাতে শুধু অনুমোদন নয়, একটা বড় তত্ত্বের আশ্রয় পাইতেছে।

অতঃপর আমি বঙ্কিমচন্দ্রের সাধন-মন্ত্রের সন্ধান করিব।

বাংলার নবযুগ-প্রসঙ্গে এখানে আমি এই যে আলোচনা করিতেছি, তাহাতে দুইটি বস্তুর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি—একটি ওই যুগের নব মানব-ধর্ম্মের প্রেরণা ; এবং দ্বিতীয়টি, দেশ ও জাতির তদানীন্তন অবস্থায়, তাহারই প্রভাব-বশে একটা গভীরতর ও জটিলতর সমস্যার উদ্ভব—দীর্ঘকালের জড়তা ও অবসাদের উপরে একটা প্রবল ধাক্কার ফলে, সেই নব-জাগরিত চেতনায় একটা সংশয়-সঙ্কটের দিশাহারা ভাব। ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই সঙ্কট এত দিকে এত আকারে, জাতির ভাব-চিন্তা ও আত্মিক অনুভূতির ক্ষেত্রে প্রসারিত হইতেছিল যে, অবশেষে তাহার একটা সমাধান না হইলে যেন জাতি-হিসাবে টিকিয়া থাকাও দুরূহ হইয়া উঠিবে। প্রায় দিশাহারার মতই নানা পথে ছুটাছুটির লক্ষণ দেখা দিয়াছিল—মূলরোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার পরিবর্ত্তে কতকগুলা উপসর্গ নিবারণের চেষ্টাই চলিতেছিল ; সমষ্টিগতভাবে উদ্ধারের উপায় চিন্তা না করিয়া, ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত ভাবে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক আদর্শের সাধনাই—সমাজের উচ্চস্তরে ক্রমশ বরণীয় হইয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু পশ্চিম হইতে যে ডাক আসিয়াছে তাহা ব্যর্থ হইতে পারে না,—এই পূর্ব্ব-ভূভাগের যে গভীরতর জলরাশি এতদিন অনুদ্বেল অবস্থায় যুগ-সঞ্চিত বালুকার বাঁধে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল—সেই ডাকের আঘাতে তাহাতেই সাড়া জাগিল—Deep called unto deep ;—তাহার মধ্যে যেটুকু সত্য ও চিরন্তন তাহারই কল্লোলধ্বনি—বাস্তব ও সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্বের সেই চেতন-বাণী এ-পারের দেহচৈতন্যহীন সুষুপ্ত আত্মাকে স্বপ্নাতুর করিয়া তুলিল।

৩. যুগ-সমস্যা ও বঙ্কিম-প্রতিভা

প্রতিভাকে দেশ, কাল ও জাতি-নিরপেক্ষ একটা পাত্রগত বা ব্যক্তিগত দৈবীশক্তির স্ফুরণ বলা হইয়া থাকে ; মতান্তরে, জাতির মগ্নচৈতন্যে যাহা ব্যাপ্ত বা বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, তাহাই কোন যুগ-সন্ধির মাহেন্দ্রক্ষণে, ব্যক্তিবিশেষে সংহত হইয়া—সেই জাতিরই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে, প্রতিভার দিব্য শক্তিরূপে প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। এই দুই মতই সত্য, এবং প্রতিভারও প্রকারভেদ আছে। দেশ, কাল ও জাতিকে অতিক্রম করার প্রবৃত্তিও এক শ্রেণীর প্রতিভার লক্ষণ বটে। এরূপ প্রতিভা জাতির শ্রেষ্ঠ সাধনাকে আশ্রয় করিয়াই তাহাকে অতিক্রম করে ; সে যেন সর্ব্বজাতিকে জাতিবিশেষের দান। তথাপি সেই দানে একটা বিশিষ্ট জাতির বিশেষ সংস্কৃতির জয় ঘটিয়া থাকে ; যাহা মূলে কোন এক অংশে সর্ব্ব-মানবীয়, তাহাই—একটা বিশেষ জাতির প্রতিভায় বিশেষরূপে ধরা দিয়া থাকে। কিন্তু আর এক শ্রেণীর প্রতিভাও আছে, তাহা সেই জাতিরই ইতিহাসে—

কালধর্ম্মে—তাহারই বিশেষ প্রয়োজনে আবির্ভূত হয়, জাতির সমষ্টিগত আত্মরক্ষার উদ্যম যেন সেই একের ভিতরে পূর্ণশক্তি ধারণ করে। বঙ্কিমচন্দ্র এই শেষোক্ত শ্রেণীর প্রতিভা। বঙ্কিমচন্দ্রের যত-কিছু চিন্তা—তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান ও কর্ম্ম—স্বজাতির কল্যাণচিন্তাতেই গণ্ডিবদ্ধ হইয়া আছে। তাঁহার সাহিত্য-তপস্যার কোথাও একটি পংক্তি নাই যাহাতে সেই অসাধারণ কবি ও মনীষীর আত্মভাব বা আত্মচিন্তার প্রচার-চেষ্টা আছে। স্বজাতি, স্বসমাজ ও স্বদেশ—এই তিনে-এক বা একে-তিন ছাড়া তাঁহার যেন স্বতন্ত্র অস্তিত্বই ছিল না; জাতির জীবনে এমন করিয়া আপনাকে মিলাইয়া বিলাইয়া দেওয়া—এই ধরণের প্রতিভায় কুত্রাপি ঘটিয়াছে কিনা জানি না, কচিৎ ঘটিয়া থাকে বলিয়া মনে করি; ব্যক্তির আত্ম-জিজ্ঞাসা বা মনুষ্যজীবনের অর্থসন্ধান—যাহাই তিনি করুন না কেন, সকল চিন্তাই স্বজাতির কল্যাণচিন্তায় শেষ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনচরিত এ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই; যথোপযুক্ত উপকরণ ছিল কিনা—এখনও আছে কিনা, জানি না; থাকিলেও সেই উপকরণ হইতে বঙ্কিমের ন্যায় পুরুষের পূর্ণায়তন মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিবার মত সৃষ্টিশক্তি একালে কাহারও আছে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে, বরং ভয় হয়, অযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা পাছে একটা অপকর্ম্ম ঘটে। কিন্তু তেমন জীবনবৃত্ত না থাকিলেও বঙ্কিমকে চিনিয়া লইবার পক্ষে তাঁহার রচনাবলী এক অর্থে যথেষ্ট; কারণ বাংলা সাহিত্যে Personality বা পুরুষ-বৈশিষ্ট্যের এমন প্রবল ও স্বচ্ছ প্রকাশ আর কোথাও নাই। সে পুরুষ সূক্ষ্ম-ভাব-চিন্তার একটা সাহিত্যিক শরীরধারী পুরুষই নয়; সেখানে রক্তমাংসের বাস্তব মূর্ত্তিকে আড়াল করিয়া তাহারই একটা ভাবময় প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বদা দণ্ডায়মান হইয়া নাই; সেই রচনাবলীর প্রতি পংক্তিতে সকল জ্ঞান বুদ্ধি কল্পনা ও বিচার-শক্তিকে প্রদীপ্ত করিয়া যেন একটা প্রাণের নিশ্বাস স্ফুরিত হইতেছে—তত্ত্বও একটা মানুষের মুখাবয়ব ধারণ করিয়া জীবন্তের ন্যায় দৃষ্টিপাত করিতেছে। এমনই সর্ব্বত্র, এ পুরুষকে কোথাও এড়াইয়া যাইবার জো নাই। সেই রচনাবলীর মধ্যে সেই পুরুষের রাগ ও বিরাগ, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, প্রেম ও বিদ্বেষ, আশা ও ভয় যেমন সুস্পষ্ট তেমনই অকপট; অথচ এ সকলের একটিও ব্যক্তিঘটিত নয়—তেমন অভিপ্রায়ের দূরতম আভাস কোনখানে নাই। দেশ, জাতি ও সমাজের হিতার্থে এই যে আত্মবিলোপ—ইহার পৃথক প্রমাণ চাহিলে বঙ্কিমচন্দ্রকে অপমান করাই হইবে—তাঁহার সমগ্র সাহিত্যকীর্তিই তাহার প্রমাণ; বরং একালে ইহাই তাঁহার অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বিশ্বমানবের প্রেমে যাঁহারা জাতি-ধর্ম্ম, আত্মীয়-বন্ধু, সমাজ ও দেশ ভুলিয়াছেন, তাঁহারা বঙ্কিমের এই মনোবৃত্তিকে তাঁহাদের নিজেদের উচ্চভাবের তুলনায় অতিশয় সংকীর্ণ বিবেচনা করিয়া অতি-আধুনিক 'কুলচুরী'-সমাজে তাঁহার নামোল্লেখ করিতেও লজ্জাবোধ করেন—ইহা অত্যুক্তি নয়।

বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর সেই গুরুতর সমস্যা-রূপিণী Sphinx-রাক্ষসীর সম্মুখে সমগ্র জাতির প্রতিনিধি, তথা ভারতীয় প্রতিভার প্রতিভূরূপে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রায়

একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন। সাক্ষাৎভাবে রাষ্ট্র, সমাজ বা ধর্ম্মের ক্ষেত্রে তিনি কোন নেতৃত্বের কাজ করেন নাই; কেবল ভাব ও চিন্তার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ, সেই সকল প্রয়াসে স্থায়ী সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে যে সত্যকে আশ্রয় করিতে হইবে—তৎসম্পর্কিত ভাব-চিন্তার ক্ষেত্রে, তিনি জাতির চিত্তকে কর্ষণ করিবার ভার লইয়াছিলেন; জাতীয় সংস্কৃতিকেই একটা নূতন পথে প্রবর্ত্তিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি কতখানি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ—শুধুই তাঁহার নিজের কালে নয়, পরবর্ত্তী কালেও একটু ভিতরে দৃষ্টি করিলেই পাওয়া যায়। এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, এখনও এ জাতির চিত্তে যে নূতন ভাবচিন্তা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রেরণা লক্ষিত হয়, তাহার মূল অনুসন্ধান করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনাতেই তাহা মিলিবে; অর্থাৎ সেইরূপ প্রবৃত্তির জাগরণ তাহা হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। আধুনিক কালের রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক সমস্যার চিন্তা তিনি করেন নাই—সেই কাজ তাঁহার ছিল না। তিনি আরও ভিতরে দৃষ্টি করিয়াছিলেন; যাহাকে আধুনিক যুগ বলে সেই যুগের যুগোচিত জীবন-দর্শন তাঁহারই প্রতিভায় সর্ব্বপ্রথম প্রতিভাত হইয়াছিল, তিনিই সর্ব্বপ্রথম পুরাতনের দৃষ্টি-কোণকে নূতনের দিকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন; ইহাই ছিল তাঁহার প্রতিভার মুখ্য কীর্ত্তি। শুধু বাঙলার নয়—সে যুগের সারা ভারতবর্ষের গুরুস্থানীয় ছিলেন তিনিই, তাই সেকালের এক মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রকে—"The greatest man of the Nineteenth Century" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সাধন-মন্ত্র এই অর্থে আধুনিক যে, তাহা মানুষের স্বভাব বা দেহধর্ম্মের অনুকূল; আবার আর এক অর্থে তাহা পুরাতনও বটে,—কারণ, তাহা জাতির মজ্জাগত সংস্কার ও ইতিহাস-গত সংস্কৃতির বিরোধী নয়। নবযুগের সেই নবভাবের প্রেরণা বঙ্কিমচন্দ্রকে অতি গভীরভাবে উৎকণ্ঠিত করিয়াছিল,—শুধুই সাহিত্যিক কলাবিলাস বা তত্ত্বানুশীলনের সুখকর উৎকণ্ঠা নয়, অথবা ব্যক্তি-জীবনের নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতির ভাবনাই নয়—নিজ জাতি ও সমাজের ভবিষ্যৎ-চিন্তা তাঁহার সাহিত্য-কর্ম্মকেও কঠিন তপশ্চর্য্যায় পরিণত করিয়াছিল। তিনি প্রথম হইতেই সমাজের মুক্তিকেই ব্যক্তির যথার্থ মুক্তি বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছিলেন। ইহার বীজ কবে কোথা হইতে তাঁহার চেতনায় উপ্ত ও অঙ্কুরিত হয়, অথবা ইহাও তাঁহার প্রতিভার মতই একটা প্রাক্তন সংস্কার—তাহা বলা কঠিন। 'দুর্গেশনন্দিনী'র রচয়িতারূপেই বাংলা সাহিত্যে তাঁহার প্রথম আবির্ভাব, তৎপূর্ব্বে তিনি কোন্ সাধনায় কোন্ পথে কতখানি অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের সেই অধ্যায় এখনও রহস্যাবৃত হইয়া আছে। সাহিত্য-স্রষ্টা কবিরূপে তাঁহার সেই প্রথম প্রয়াসের পূর্ণ সাফল্য বিস্ময়কর বলিয়াই মনে হয়; কারণ ঠিক তদুপযোগী সাহিত্যিক চর্চ্চার কোন নিদর্শন তাহার পূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই। বাংলা ভাষার সেই প্রথম পূর্ণাঙ্গ রোমান্সখানিতে কেবল ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তৎকালে বঙ্কিমচন্দ্র নামক একজন ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী যুবক বিলাতী সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রস ও রূপ একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। এই রসও সম্পূর্ণ আধুনিক; ইহাতে নর-নারীর হৃদয়বৃত্তিকে যে ধরণের কাব্যমহিমায় মণ্ডিত করা

হইয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে মনুষ্য-চরিত্রের প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি ; কল্পনার সেই ঐশ্বর্য্য বাস্তবেরই পূজা-সম্ভার ; তাহার দেশ, কাল ও পাত্র যতই ঊর্দ্ধগত হউক—মানুষের বাস্তব হৃদয়ের কাহিনী ও মনুষ্যজীবনের নিয়তি-নিয়মের লীলা তাহার পার্থিবতাকেও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের ইহাই প্রথম পরিচয় —সে পরিচয় একজন জীবন-রস-রসিক কবিপুরুষের পরিচয়। এই পরিচয় উত্ত-রোত্তর উজ্জলতর হইয়া উঠিল ; বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ কাব্য-সৃষ্টিতেই মাতিয়া উঠিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই এই কাব্যকল্পনা 'কপালকুণ্ডলা'য় পূর্ণ পরিণতি লাভ করিল —বঙ্কিমের প্রতিভা যে কত বড় কবি-প্রতিভা, এবং তাহার উন্মেষ যে কত দ্রুত, ওই কাব্যেই তাহার প্রমাণ। ইহারও অনতিকাল মধ্যে তাঁহার ঔপন্যাসিক রসকল্পনার আবেগ 'বিষবৃক্ষে' সৃষ্টি-শক্তি চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া যেন শান্তিলাভ করিল। এতদিন তিনি যেন কাব্য-কল্পনার সম্পূর্ণ বশীভূত ছিলেন, অতঃপর সেই কল্পনাকে তিনি নিজেরই বশীভূত করিয়া তুলিলেন। ইহার পূর্ব্বে, কেবল 'মৃণালিনী'তেই, নিছক রস-প্রেরণায় কিঞ্চিৎ ভাবান্তর দেখা দিয়াছিল ; কিন্তু পরে এই ভাবান্তর গূঢ়তর, এবং দৃষ্টি গভীরতর হইয়া, শেষ উপন্যাস 'সীতারাম' পর্য্যন্ত, কেবল প্রত্যক্ষ মানব-চরিত্র বা মানুষের নিয়তিই নয়,—সমগ্র মানব-জীবনের রহস্যসন্ধানে আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুই দিককেই, কাব্যকল্পনার অধিকারভুক্ত করিয়া লইল। নিছক কাব্য-কল্পনা আর একবার মাত্র, প্রায় সর্ব্বশেষে—'রাজসিংহে'র সেই জেবউন্নিসা-মোবারক-কাহিনীতে—শেষ ও চরম স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল ; তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বঙ্কিমের কবি-দৃষ্টি শেষ পর্য্যন্ত অটুট ছিল—তিনি জীবনকে যখন যে-দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকুন, কোথাও সেই কবিদৃষ্টি ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের সেই জীবন-দর্শন বা পূর্ণ-মনুষ্যত্বের সন্ধান তাঁহার সাহিত্যিক সাধনায় দুইটি পৃথক ধারায় প্রকটিত হইয়াছে। দুই ধারার লক্ষ্য একই ; এক ধারা—রসের বা আর্টের ধারা, আর এক ধারা—তত্ত্বচিন্তার বা বুদ্ধিবিচারের ধারা। এই দুই বিভাগের একটির নাম উপন্যাস ; তাহাতে মনুষ্যজীবনের নিয়তিকে কতকগুলি বিশিষ্ট পাত্র-পাত্রীর চরিত্রে, এবং স্থান-কালের নাটকীয় সংস্থানে—ঘটনাচক্রের গতিমুখে ফেলিয়া, একটা অনিবার্য্য পরিণামরূপে—প্রত্যক্ষ-গোচর করা হইয়াছে। সেখানেও প্রশ্ন আছে—কিন্তু সে প্রশ্নের সমাধানে কোন সরাসরি সিদ্ধান্ত নাই—সাক্ষাৎ অনুভূতি-রসে প্রশ্ন ও উত্তর এক হইয়া যায়, একটি মুহূর্ত্তব্যাপী রস-সংবেদনায় মনুষ্যত্বের আদি ও অন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সেখানে তত্ত্বই যেন বস্তুরূপে—সৃষ্টির নিয়তিলীলার প্রত্যক্ষ দৃশ্যরূপে, মানুষের রক্তমাংস-গঠিত দেহের স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়াবলীর পরিণামরূপে—জীবন-সত্য হইয়া উঠে। ইহার কারণ, ওই তত্ত্ব কোন অংশে বস্তুনিরপেক্ষ নয়—উহা আদৌ চিন্তা-প্রসূত নয়, কবির অপরোক্ষ-দৃষ্টির ফল। ভাব ও বস্তুর এই অভেদ-দৃষ্টিকেই আমি সৃষ্টি-শক্তির কারণ বলিয়াছি ; এবং সকল সৃষ্টি যে এই অর্থেই সমন্বয়মূলক, তাহাও বলিয়াছি ; প্রত্যেক উৎকৃষ্ট সৃষ্টিতে ওই দুইয়ের 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-রহস্য ফুটিয়া উঠে। ভাগবতী সৃষ্টিতেও তাহাই হইয়া থাকে, কিন্তু সে দৃষ্টি সকলের নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের যে এই দৃষ্টিলাভ ঘটিয়াছিল,

তাহার প্রমাণ ওই কাব্যগুলি ; কিন্তু সেই দৃষ্টিতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই—দেশ ও কালের এমন একটা তাগিদ তাঁহাকে সর্ব্বদা বস্তুর সম্বন্ধেই অধিকতর সচেতন করিয়াছিল যে, এইরূপ রসদৃষ্টি সত্ত্বেও সজ্ঞান সমস্যা-চিন্তা এড়াইবার উপায় ছিল না। যাহাকে দেখিয়াছি তাহাকে শুধুই দেখানো নয়,—সেই দেখাকেও বৈজ্ঞানিক যুক্তি-বিচারের দ্বারা বুদ্ধিগোচর করা চাই ; ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনের সাক্ষ্য চাই ; নিজের সেই আত্মগত প্রত্যয়কে জ্ঞান-বুদ্ধির আদালতে দাঁড় করাইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করা চাই। কবির পক্ষে—সিদ্ধ সাধকের পক্ষে—ইহার কি প্রয়োজন ছিল ? ইহার উত্তরেও সেই এক কথা, বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনা ব্যক্তির নয়—সমাজের ; যুগ ও জাতির প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহার সেই প্রতিভাকে—জগন্নাথের রথরজ্জু হইয়া—সেই রথকে সচল করিতে হইবে, ইহাই ছিল বিধাতার নির্দ্দেশ। তাই বঙ্কিম লোকহিতার্থে তাঁহার সেই বোধি-দৃষ্টিকে কিঞ্চিৎ সংযত করিয়া, স্বেচ্ছায় তাহাকে নিম্নাধিকারে নিয়োজিত করিয়াছিলেন ; যাহাকে নিজের অন্তরে দেখিয়াছি ও পাইয়াছি, তাহাকে নিরপেক্ষভাবে প্রচার করিতে বাধিয়াছিল—কবিকেও রীতিমত শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

এই শিক্ষকের ভূমিকায় তিনি তাঁহার অপরবিধ সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন—সেখানে বঙ্কিমের সাধক-মূর্ত্তি অন্তরূপ। কাব্যকার ঔপন্যাসিক বঙ্কিম, ও তত্ত্ব-প্রচারক বঙ্কিম, এই দুইয়ের মধ্যে স্পষ্ট যোগসূত্র আবিষ্কার করিতে পারিলেও, তাহারা সহসা যেন পৃথক মূর্ত্তি বলিয়াই মনে হয়। যে জাগ্রত ও সংযত বিচার-বুদ্ধি, অতিশয় স্বচ্ছ ও অভ্রান্ত তত্ত্ব-দৃষ্টি, এবং বিষয়বস্তুর বাহুল্যবর্জ্জন বা যুক্তিধারার একমুখিতা খাঁটি গদ্য-সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ, বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য-রচনায় সেই সকল লক্ষণের যেরূপ সদ্ভাব দেখা যায়—তাহাতে সে-যুগের গদ্য-লেখক হিসাবেও তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং মনে হয়, পরবর্ত্তী যুগেও তাঁহার সেই স্থান অক্ষুণ্ন আছে। আমি অতঃপর তাঁহার রচিত অপর সাহিত্য (উপন্যাস প্রভৃতি) ত্যাগ করিয়া এই খাঁটি গদ্য-সাহিত্য হইতেই নব মানবধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার ধ্যান ও জ্ঞানের পরিচয় দিব ; সে পরিচয় যথাসম্ভব তাঁহার নিজের জবানিতেই দিব, তাহার অধিক আবশ্যক হইবে না।

৪. বঙ্কিমচন্দ্রের কর্ম্মমন্ত্র

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাথমিক অভিপ্রায় ছিল—বাঙালীকে মাতৃভাষার মধ্য দিয়া আধুনিক বিদ্যাচর্চ্চায় প্রবৃত্ত করা। কিন্তু ইহা অপেক্ষা গুরুতর চিন্তা ও পরিশ্রমের কর্ম্ম ছিল—নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাবনা-কামনাকে দিক্‌ভ্রান্ত বা পথভ্রষ্ট হইতে না দেওয়া ; সেই শিক্ষার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, জাতির স্বধর্ম্মকে মানবধর্ম্মের আকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে-ধরণের শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার প্রভাবে এদেশে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে ; য়ুরোপের পক্ষে যে-শিক্ষা সে-সমাজের উপযোগী, এবং—শেষ পর্য্যন্ত যেমনই হউক—উপস্থিত তেমন ভয়াবহ নয়, আমাদের পক্ষে তাহাই আশু ধ্বংসকারী

হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র এই শিক্ষার মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকারেও যেমন অকুণ্ঠিত, তেমনই স্বজাতির স্বভাবে তাহার বিষক্রিয়াসম্বন্ধে তেমনই নিঃসংশয় ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই নব্য-শিক্ষিতের দলই অতঃপর এ-সমাজের নেতৃত্ব করিবে—রঘুনন্দনের স্মৃতির শাসন ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িবে ; অতএব জাতিকে বাঁচাইতে হইলে নূতন সংহিতার প্রয়োজন। এই অভিপ্রায়ে তিনি একেবারে গোড়ায় দৃষ্টি করিলেন, এবং মনুষ্যত্বকেই মানুষের ধর্ম্ম বলিয়া সেই ধর্ম্মের একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন আদর্শ তাঁহার 'ধর্ম্মতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে অতি বিশদভাবে ব্যাখ্যাও প্রতিপন্ন করিলেন। এই গ্রন্থই এক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনব্যাপী ধ্যান ও চিন্তার পরিণত ফল—তাঁহার অন্তর্জ্জীবনের ইতিহাস বা আত্মপরিচয়ও ইহাতে মিলিবে। আমি এই গ্রন্থ হইতেই তাঁহার সেই আদর্শ ও সাধন-মন্ত্রের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। প্রথমে তাঁহারই কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য সপ্রমাণ করিব।—

১. "অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, "এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়?" সমস্ত জীবন ইহার উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি ; তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক শিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি, এবং কার্য্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা-সম্পাদন জন্য প্রা: পাত পরিশ্রম করিয়াছি।"

২. "আমি মানুষ্যজীবনের সমালোচনা করিয়া ধর্ম্মের যে স্থূলমর্ম্ম বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাকে বুঝাইতেছি।"

৩. "এখন বিজ্ঞানময়ী উনবিংশ শতাব্দী। তাহার (সেই বিজ্ঞানবিদ্যার) কুহকে পড়িয়া তোমার মত সহস্র সহস্র শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙালী পরকাল আর মানে না। তাই আমি এই ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায়, যত পারি, পরকালকে বাদ দিতেছি।...আর আমার বিবেচনায় পরকাল বাদ দিলেই ধর্ম্ম ভিত্তিশূন্য হইল না। ...এখন ইহকালের দুঃখকে সকলেই ভয় করে ; ইহকালের সুখ সকলেই কামনা করে। এজন্য ইহকালের সুখ-দুঃখের উপরেও ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইতে পারে।"

৪. "তোমরা উনবিংশ শতাব্দীর লোক—উনবিংশ শতাব্দীর ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয়। ভাষার প্রভেদ হইতেছে বটে, কিন্তু সত্য নিত্য।"

উপরের কথাগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্তে যুগ-প্রভাব ও যুগ-সমস্যার উৎকণ্ঠা—দুইয়েরই সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

অতঃপর আমি বঙ্কিমচন্দ্র-ধৃত মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা ও মনুষ্যধর্ম্মের পরিচয়, তাঁহার কথাতেই সংক্ষেপে দিবার চেষ্টা করিব।—বন্ধনীর মন্তব্যগুলি আমার।

১. মনুষ্যের ধর্ম্ম কি তাহা সন্ধান করিলেই পাওয়া যায় (অর্থাৎ, কোন যোগমার্গ বা Revealed Scripture-এর শরণাপন্ন হইতে হয় না)।...যাহা

থাকিলে মানুষ মানুষ, না থাকিলে মানুষ মানুষ নয়, তাহাই মানুষের ধর্ম্ম,... তাহার নাম মনুষ্যত্ব (ইহাই খাঁটি Humanism)।

২. যে অবস্থায় মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি সম্পূর্ণ হয়, সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব বলিতেছি।

৩. আমি বলিয়াছি যে, সুখের উপায় ধর্ম্ম, আর মনুষ্যত্বই সুখ। অতএব সুখই সেই কষ্টিপাথর। অনুশীলনের উদ্দেশ্য সুখ; যেরূপ অনুশীলনে সুখ জন্মে, দুঃখ নাই, তাহাই বিহিত। অতএব সুখই সেই কষ্টিপাথর।

এইবার অতিশয় সংক্ষেপে বঙ্কিমচন্দ্রের এই 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র সার-সংগ্রহ করিব।

মানুষের ধর্ম্ম কি? মনুষ্যত্ব কি? এই জীবন লইয়া কি করিব? এই প্রশ্নের উত্তর হইল—মানুষের ধর্ম্ম মানুষের স্বভাবেই নিহিত আছে, এবং মানুষের সেই প্রকৃতিকে উত্তমরূপে বুঝিয়া লইলে মনুষ্যত্বের ধারণা করা যাইবে। মানুষের সেই স্বভাবের পূর্ণ পরিণতির যে অবস্থা তাহার আদর্শকেই ঈশ্বর নাম দিতে হইবে। মুক্তিও এই অবস্থা—আর কোন অর্থে মুক্তি বলিয়া কিছু নাই। সেই মুক্তি লাভ করিতে হইলে কর্ম্মই একমাত্র সাধন; এবং জীবনও স্বভাবত কর্ম্মময়, প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষকে সর্ব্বদা কর্ম্মচঞ্চল থাকিতে হয়, যথা গীতার উক্তি (বঙ্কিম কর্ত্তৃক উদ্ধৃত)—

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

এই কর্ম্মকে সুসম্পন্ন করিতে হইলে, অর্থাৎ তাহাতে পূর্ণ 'দক্ষতা' লাভ করিতে হইলে, প্রকৃতিদত্ত সর্ব্ববৃত্তির সমান ও সুসঙ্গতিযুক্ত অনুশীলন প্রয়োজন; তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে চিত্তশুদ্ধির আবশ্যক। চিত্তশুদ্ধির প্রাথমিক লক্ষণ—মনে শান্তি, ও হৃদয়ে প্রীতি। প্রীতি অর্থে—মানবপ্রীতি, সর্ব্বজীবের হিতসাধনে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও আনন্দময় উৎসাহের ভাব। এই প্রীতিও সম্যক স্ফূর্ত্তিলাভ করে না—ঈশ্বরে ভক্তির অভাবে; কারণ সেইরূপ ভক্তিযুক্ত না হইলে মানুষের প্রতি প্রীতির কোন অর্থই হয় না—তাহা একটা অন্ধ হৃদয়াবেগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেরূপ প্রীতির দ্বারা মানুষের সত্যকার কল্যাণ হইতে পারে না—হিতসাধন সম্পূর্ণ হয় না; কেবল একটা আত্মতৃপ্তিই ঘটে, এজন্য তাহার গূঢ় লক্ষ্য—পরার্থ নয়, স্বার্থ। অতএব নিষ্কাম প্রীতি ব্যতিরেকে সত্যকার পরহিতসাধন অসম্ভব। এই নিষ্কাম প্রীতির জন্যই ঈশ্বরে ভক্তি একান্ত আবশ্যক। এই ভক্তিও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানেরই নামান্তর; কারণ তাহা ঈশ্বরজ্ঞানেরই ফল—সে জ্ঞানও মনুষ্যত্বের পূর্ণ পরিণতি-অবস্থার উপলব্ধি; ঈশ্বর তাহাই। অতএব ঘুরিয়া আবার সেই একই তত্ত্বে ফিরিয়া আসিতে হয়—এক নূতন অর্থে, জীব ও ব্রহ্ম এক; Humanity-ই ব্রহ্ম। যে জ্ঞানে সেই একত্বের উপলব্ধি হয়, তাহা লাভ করিবার একমাত্র উপায়—ওই প্রীতিমূলক মানবসেবা-কর্ম্ম; এই মানবপ্রীতিই উৎকৃষ্ট কর্ম্মসকলের প্রেরণাও বটে। এরূপ কর্ম্মই জীবনের সার; ইহার যে সুখ, তাহাই মনুষ্যজীবনের নিঃশ্রেয়স। অতএব এই কর্ম্মযোগই যেমন উৎকৃষ্ট জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—তেমনই ইহাই শ্রেষ্ঠ জীবন-যোগ।

মুক্তির জন্য সন্ন্যাসের প্রয়োজন যেমন নাই—তেমনই, মুক্তি-সাধনা অর্থে কোনরূপ স্বার্থপর আত্মসাধনা নয় ; মানুষ হইয়া, মানুষের সমাজে থাকিয়া, নিজ মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ-সাধনের দ্বারাই সত্যকার মুক্তিলাভ হয়।

এই ধর্ম্মের যথার্থ নাম— Religion of Humanity ; এবং এই জন্যই বৃত্তি-সকলের অনুশীলনই এ ধর্ম্মের সার। "The substance of Religion is culture"—পাশ্চাত্য মনীষীর এই উক্তি বঙ্কিমচন্দ্রও শিরোধার্য্য করিয়াছেন।

তথাপি এই 'ধর্ম্মতত্ত্ব' বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিকতা ও সৃষ্টিশক্তির একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই 'ধর্ম্মে'র প্রণয়নকার্য্যে তিনি তাঁহার নিজের আবশ্যকমত বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক চিন্তাকে কাজে লাগাইয়াছেন—কোনখানে বিজ্ঞান বা দর্শনের সূক্ষ্মতত্ত্বকে আমল দেন নাই। এজন্য তাঁহার এই 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র সমালোচনায় দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক পাণ্ডিত্য নিতান্তই অবান্তর। ইহাতে তত্ত্ব-হিসাবেই কোন তত্ত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই—ইহা জীবনেরই অনুরূপ একটা জীবন-বাদ, ইহাও একটা সৃষ্টি। মানুষের জীবনকে দেখিবার একটা বাস্তব-রূপ-সন্ধানী দৃষ্টি ইহাতে আছে ; সে দৃষ্টিতে ভাব আছে, চিন্তা আছে ; কল্পনাও আছে ; কবি বা ভাব-সাধকের অন্তর্দৃষ্টিও আছে—একটা Harmony বা সঙ্গতি-আবিষ্কারের পিপাসা আছে। সেই দৃষ্টি-জাত যে দর্শন, তাহাকেই বঙ্কিমচন্দ্র একরূপ যুক্তিগ্রাহ্য বা বুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়া তুলিয়াছেন। খাঁটি জীবন-জিজ্ঞাসার সঙ্গে যতটুকু বিজ্ঞান ও দর্শন মিলিতে পারে—কেবল ততটুকুই ইহাতে মিলিয়াছে ; তাহার ফলে এই ধর্ম্মতত্ত্ব একটা নূতন দার্শনিক তত্ত্ব হইয়া উঠে নাই—জীবনেরই এক নূতনতর ব্যাখ্যা হইয়া উঠিয়াছে। এখানেও বঙ্কিমচন্দ্র দার্শনিক নহেন—স্রষ্টা ও কবি।

সেই কবি-প্রতিভার সমন্বয়-শক্তিও ইহাতে অল্প প্রকাশ পায় নাই। প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিকের মধ্যে এই যোগ-সাধন, ইহাই তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি ; ইহাই নবযুগের গূঢ়তম প্রবৃত্তি—এই সমন্বয়-প্রতিভাই সে যুগের যুগ-প্রতিভা।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই নবধর্ম্মের প্রেরণামূলে তাঁহার জাতিগত বাঙালী-সংস্কার কতটুকু রহিয়াছে তাহা লক্ষ্য করা কঠিন হইবে না। আমি পূর্ব্বে এই প্রসঙ্গে বাংলার বৈষ্ণব ও তন্ত্রধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার এই অনুশীলন-ধর্ম্মের মূলে তন্ত্রধর্ম্মের প্রেরণা আছে বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতিবাদ মাত্রেই তন্ত্রতত্ত্বের অধীন—সেই তান্ত্রিক সংস্কার যে-জাতির মজ্জাগত, তাহার পক্ষে জীবন ও জগৎকে—প্রত্যক্ষকে—ধর্ম্ম-সাধনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা সহজ ও স্বাভাবিক, এইজন্যই য়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও ভারতীয় অধ্যাত্ম-পিপাসার এই যে সংযোগ, ইহা বাঙালীর প্রতিভাতেই সর্ব্বপ্রথম পরিস্ফুট হইয়াছিল। তন্ত্রের সেই মায়ারূপিনী মহামায়া—এখানে অপরিণত মনুষ্যত্বের স্বার্থকলুষিত জগৎ-চেতনা ; এবং সর্ব্বমানবময়ী মহাদেবীই (Humanity) সেই ব্রহ্মময়ী সত্যস্বরূপিণী মহামায়া। এখানেও 'অনুশীলন'— শক্তিরই অনুশীলন, শক্তির পূর্ণবিকাশই ইহার লক্ষ্য ; কেবল, সেই শক্তি মানুষেরই হৃদয়-মনের শক্তি, এবং ভক্তিও কোন আধ্যাত্মিক ইষ্টদেবতার প্রতি ভক্তি নয়, মানবীয় আদর্শের যে

ঈশ্বর—ভক্তিও তাঁহার প্রতি। এখানেও ভক্তি এবং মুক্তি দুইয়েরই অবকাশ আছে; মুক্তি—প্রকৃতির সর্ব্ববিধ বন্ধন স্বীকার করিয়া এবং তাহারই সাহায্যে; ভুক্তি—"ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কাম"—স্নেহ-প্রেম, প্রীতি ও দয়া—সর্ব্ববিধ হৃদয়বৃত্তির চরিতার্থতা দ্বারা। এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাস-ধর্ম্মের ঘোরতর বিরোধী। এই যে ভোগবাদ—হৃদয়বৃত্তিকে উচ্ছেদ করার এই ঐকান্তিক অপ্রবৃত্তি, ইহাই বাঙালীর মজ্জাগত সংস্কার, ইহাই বাঙালীর তান্ত্রিকতা। এই তান্ত্রিকতাই নবযুগের নূতন প্রবৃত্তিতে একটা নূতনতর সাধন-পদ্ধতির সন্ধান করিয়াছে।

শুধুই ধর্ম্মতত্ত্বে নয়, তাঁহার সর্ব্ববিধ সাহিত্য-কর্ম্মে, এই তান্ত্রিক মনোধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা—তাঁহার অত্যুচ্চ কবিভাবও—ভাবের সহিত বস্তুর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে কোথাও অস্বীকার করিতে পারে নাই—পুরুষকে প্রকৃতি-নিরপেক্ষ স্বাধীন সত্তারূপে ধারণা করিতে পারে নাই; তাঁহার উপন্যাসগুলিও ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। সেখানেও বাহিরের বাস্তব তথ্য বা ঘটনাকে স্বীকার করিয়া, তাহাদের দুর্দ্ধর্ষ গতিবেগের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া—কুলালচক্রে মৃৎপিণ্ডের মত—পুরুষ-চরিত্রের যে গঠন-পরিণাম, তাহাই সত্য। তাঁহার জীবন-দর্শনের মূলে সর্ব্বত্র শক্তির এই স্ফুরণলীলা—অপরিণত হইতে পরিণতির এই গতিতত্ত্ব অনুস্যূত হইয়া আছে। অর্থাৎ নিছক ধ্যান-যোগী বা ভাবপন্থীর মত তিনি একেবারেই একটা শান্ত, নির্দ্বন্দ্ব ভাব-তত্ত্বে আরূঢ় হইয়া থাকার অবস্থাকে সম্ভব বা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই; জীবনকে একটা আদর্শের অভিমুখে গতিশীল দেখিয়াছেন, একেবারেই আদর্শে উপনীত—অতএব স্থিররূপে দেখেন নাই। সেরূপ সাধনা শক্তি-সাধনার বিপরীত; সে যেন জীবনকে প্রথম হইতেই অস্বীকার করা। তাঁহার উপন্যাসগুলিতে যে নরনারী-চরিত্র—বিশেষত নায়ক-চরিত্র প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতেও এই দ্বন্দ্ব, প্রয়াস ও সংগ্রামই জীবনের মূলতত্ত্বরূপে দেখা দিয়াছে; তাই তাহাদের পরিকল্পনাও নাটকীয়। কাব্যে জীবনকে এইরূপে দেখিবার ভঙ্গী আমাদের সাহিত্যে নূতন বটে, এবং তাহা যে য়ুরোপীয় সাহিত্য হইতেই সংক্রামিত হইয়াছে, তাহাও সত্য; কিন্তু এইরূপ সংক্রমণ কেবল অনুকরণের ফলেই ঘটে নাই; যাহাকে নাড়ার যোগ বলে সেই যোগ না থাকিলে এইরূপ কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হইত না। অনুকরণে কিরূপ সাহিত্যসৃষ্টি হয়, আজিকার দিনের বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের দুর্গতিই তাহার প্রমাণ। জীবনকে—সৃষ্টির সত্যকে—স্বীকার করা, এবং মুক্তিকেও ভুক্তির পথেই লাভ করিতে হইবে—এই বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল; সেই বিশ্বাস বাঙালীর জাতীয় সংস্কারে সহজ বলিয়াই এত শীঘ্র নবযুগকে বরণ করিবার সামর্থ্য বাঙালীরই হইয়াছিল—আর কোন ভারতীয় জাতির হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে এখানে বেশী কিছু বলিব না—যথাস্থানে ও যথাপ্রসঙ্গে সবিস্তারে সে আলচনা করিব—বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সেরূপ কাব্য-সমালোচনা অপ্রাসঙ্গিক। তথাপি বর্ত্তমান আলোচনার এই বিশেষ প্রসঙ্গে দুই-একটি আরও প্রমাণ তাহা হইতেই দিব। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রধান ভাবগ্রন্থি—স্ত্রী-পুরুষের যৌন-সম্বন্ধ

বা দাম্পত্য-প্রেম। একমাত্র ইহারই প্রবল আকর্ষণে পুরুষের ভাগ্যসূত্র ছিন্ন-বিছিন্ন হইয়া যায়; নারীই তাহার অদৃষ্টচক্রের প্রধান কীলক, তাহাতেই ঘূর্ণ্যমান হইয়া তাহার দশান্তরের অবধি নাই। কাব্যের বহিরঙ্গে নাটকীয় স্থান-কাল-পাত্র ও ঘটনার বৈচিত্র্য যেমনই হউক—সেই সকলের তলদেশে তান্ত্রিক শিব-শক্তিবাদের একটা অতি গূঢ় প্ররোচনা রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়; প্রকৃতি-রূপিণী নারীকেই পুরুষের জীবনে সিদ্ধি ও অসিদ্ধির হেতুরূপে—দক্ষিণা বা বামা মূর্ত্তিতে—এই যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়, ইহাও কম লক্ষণীয় নয়। সর্ব্বত্র ওই এক কঠিন শিলাতটে পুরুষের পৌরুষ যেন আছাড়িয়া পড়িয়া তাহার শক্তির চরম পরীক্ষা দিতেছে; সেই পরীক্ষাই যেন জীবনের আদি ও শেষ পরীক্ষা, সকল শ্রেষ্ঠ সাধনার সিদ্ধিলাভ যেন ওইখানেই বাঁধা রহিয়াছে। প্রকৃতির ঐ বন্ধনই যেমন সত্য, পুরুষের পক্ষে উহার অধীন হওয়াও তেমন পুরুষোচিত বটে; কারণ,—"রমণী ঈশ্বরের কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া; পুরুষ দেবতার সৃষ্টিমাত্র। স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়া।" যতক্ষণ সে দুর্ব্বল ততক্ষণ সে জীব, বা ক্ষুদ্র মানবক—ততক্ষণ ঐ নারীও মায়াময়ী 'মায়া'; সেই মায়ার মহামায়া-রূপ দেখিতে পারিলেই ঐ দ্বন্দ্ব হইতে সে মুক্তিলাভ করে, এবং তখন সেই মহামায়ার অঙ্কশায়ী হইয়া 'শান্তং শিবং'-অবস্থার পরমানন্দ-ভোগে অধিকারী হয়। 'কপালকুণ্ডলা'য় সর্ব্বপ্রথম এই তত্ত্ব উঁকি দিয়াছে; সেখানে নায়িকার প্রকৃতি-মূর্ত্তি অতিশয় সরল—স্বভাব-উদাসীন; তাহার নারী-রূপও অসম্পূর্ণ, তাই নায়ক কোন সাধনারই সুযোগ পাইল না। এই মূর্ত্তিরই আরও দুইটি জটিলতর রূপ —শ্রী ও মনোরমা; দুই-ই শক্তির নারীমূর্ত্তি বটে, কিন্তু সে যেন 'মায়া' নয়—দুর্ব্বল আত্মভ্রষ্ট পুরুষের নিদারুণ শাস্তিরূপিণী 'মহামায়া'। নগেন্দ্রনাথের শক্তি অনুকূলা হইলেও দুর্ব্বলা—তাই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সে কোনরূপে রক্ষা পাইল, প্রকৃতির দয়ায় প্রাণ পাইল মাত্র, কিন্তু পৌরুষ রহিল না। গোবিন্দলালের শক্তি প্রতিকূলা, কিন্তু সে বীরাচারী সাধক বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইয়াছে। ব্রজেশ্বর বড় ভাগ্যবান— প্রাক্তন পুণ্যফলে তাহার শক্তি যেমন সবলা তেমনই স্নেহময়ী—সে নিজেই তাহার জন্য সব সহিয়াছে। প্রতাপ জীবন্মুক্ত সিদ্ধপুরুষ—স্বভাব-ত্যাগী, তাই মায়া তাহার পথরোধ করিতে পারে নাই। অমরনাথ তাহার শক্তির মূর্ত্তিকে ঠিকই চিনিয়াছিল; কিন্তু সাধনার প্রথম প্রহরেই মন্ত্র ভুল করিল—ইহজন্মে আর সিদ্ধিলাভ হইল না; তখন একমাত্র আশ্বাস—'যদি পরজন্ম থাকে!' কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির একটা 'যোগবাশিষ্ঠ' রচনা করিতেছি,—আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতেছি; বরং ঠিক তাহার উল্টা—যাহা আধ্যাত্মিক তাহাকেই জীবনলীলায় রক্তমাংসের মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ করিতেছি—তাহাতে অধ্যাত্ম-রস নয়, কাব্যরসই উছলিয়া উঠিবে; সেই রোমান্টিক ট্রাজেডিই আরও বিরাট, রহস্যগভীর হইয়া উঠিবে। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মূলে যে কবি-কল্পনা আছে, তাহা খাঁটি য়ুরোপীয় ট্রাজেডি-কল্পনা নয়,—কারণ, তাঁহার প্রকৃতিবাদও খাঁটি য়ুরোপীয় প্রকৃতিবাদ নয়। এখানে প্রকৃতিও অন্ধ-প্রকৃতি নয়—তাহাই 'সর্ব্বার্থসাধিকা'; তাই পুরুষও কেবল প্রবৃত্তির বেগে বহি-

বিবিক্ষু পতঙ্গের মত একেবারে ভস্মসাৎ হয় না; সেই বেগের মধ্যেও একটা বিপরীতমুখী আকর্ষণ আছে—সেই ধ্বংসের মধ্যেও একটা আশ্রয়লাভের আশা ও আশ্বাস থাকে। ইহাই ভারতীয় সংস্কার। য়ুরোপ হইতে যাহা লইবার তাহা লইয়াও এই সংস্কার ত্যাগ করা যাইবে না—করিলে, তাহা সত্যকার সৃষ্টি হইবে না; কারণ পদ্মের ডাঁটায় গোলাপ ফুটিতে পারে না। তাই এ কাব্যের রস-বিচার য়ুরোপীয় আদর্শে করা যাইবে না; এ কাব্য কাব্যহিসাবেও স্বতন্ত্র—ইহা য়ুরোপীয় ও ভারতীয় দুই দৃষ্টির সমন্বয়ে এক নূতন সৃষ্টি। কিন্তু এখানে এ সকল কথা অবান্তর।

৫. যুগনায়ক বঙ্কিম

বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রধানত গুরুর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন—স্বজাতির কল্যাণ-কামনায় তাঁহার সাহিত্য-ব্রতের অনেকখানিই যে শিক্ষকতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্যই তিনি তাঁহার কবি-স্বভাবের রস-পিপাসাকেও সংযত করিয়া প্রাণের বন্ধন-মুক্তি অপেক্ষা চরিত্র-বলকেই বড় করিয়াছিলেন—ভাবের স্বাধীনতা অপেক্ষা বাস্তবের সহিত যুদ্ধে জয়লাভকে অধিকতর স্বাস্থ্যকর—অতএব হিতকর মনে করিয়াছিলেন; এবং এইজন্যই বিলাতী morality-কেও ক্ষেত্র-বিশেষে অত্যাবশ্যক মনে করিতেন। তথাপি এই morality-কে তিনি সেকালের শুচিবায়ুগ্রস্ত সংস্কারপন্থীদের মত সর্ব্বস্ব করিয়া তোলেন নাই, তাহার প্রমাণ, তাঁহার ঐ কাব্যগুলি। সেখানে এক দিকে যেমন চরিত্রবলের অত্যুচ্চ আদর্শ-ঘোষণা, তেমনই অপরদিকে যাহাদের অধঃপতন হইতেছে তাঁহারাও প্রায় আদর্শ-পুরুষ; —ভবানন্দের মত ত্যাগী বীর-সন্ন্যাসীরও পদস্খলন হয়, গোবিন্দলাল নগেন্দ্র নাথের ত কথাই নাই। তিনি দেহদশাধীন পুরুষের সেই নির্ম্মম নিয়তিকে কোথাও অবজ্ঞা বা অস্বীকার করেন নাই; বরং তাহার সেই রক্তরশ্মির জলন্ত প্রভায় পুরুষ-চরিত্রগুলি আদ্যন্ত উদ্ভাসিত হইয়াছে। শৈবলিনীর নাম দিয়াছেন 'পাপীয়সী'; তথাপি তাহার পাপের সেই নিদারুণ ব্যথাই সমগ্র কাহিনীকে কাব্যরসোচ্ছল করিয়াছে; সেই পাপই হীরার মত সামান্যা নারীকেও অসামান্যা করিয়া তুলিয়াছে। এই পাপকেই তিনি তাঁহার কবিহৃদয়ের রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়াছেন; তাহার কারণ, তাহাই যে মানুষের মনুষ্যত্বের অবিচ্ছেদ্য মূল! দেহের যৌবন-বনে প্রকৃতির সেই অশোক-কিংশুক যে ফুটিবেই!—বসন্তের সে চক্রান্ত ভাঙিয়া দিবে কাহার সাধ্য? তাই সেই পাপকে তিনি ভয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু চক্ষু ফিরাইতে পারেন নাই; প্রকৃত তান্ত্রিকের মত তাহাকে সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া, তাহার হস্ত হইতেই মুক্তির বরাভয় প্রার্থনা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এখানেও প্রকৃতিবাদী—শক্তিসাধক, শুচিবায়ুগ্রস্ত moralist নহেন। কিন্তু গুরু ও শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র নিম্নাধিকারীর পক্ষে এ বিষয়ে কিছু কঠোর; তাঁহার দৃষ্টি ছিল মনুষ্যসাধারণের দিকে; এই জন্যই তাঁহার নব ধর্ম্মসংহিতায় তিনি যেমন কোথাও সন্ন্যাস বা Puritanism-কে প্রশ্রয় দেন নাই; তেমনই সাধনপথে দেহের বা প্রবৃত্তির

শুচিতাকে সযত্নে রক্ষা করার পক্ষপাতী। 'Flesh is weak', অথচ "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—একথা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন, এজন্য প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মধ্যে সাম্যরক্ষাই ছিল তাঁহার মতে উৎকৃষ্ট মানবধর্ম্ম। মনে রাখিতে হইবে, একথা যতই পুরাতন হউক—সেকালে ইহাও ছিল নূতন।

তথাপি কেবলমাত্র নৈতিক শুচিতাকেই তিনি সর্ব্বাধিক মনে করিতে পারেন নাই; বরং হৃদয়ের প্রসারকেই সকলের উপরে স্থান দিয়াছিলেন। অতিরিক্ত নৈতিক শুচিতাও যে একরূপ স্বার্থপরতা, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন; যাহারা মহৎ বা মহাপ্রাণ তাহাদেরও চরিত্রস্খলন যেমন সম্ভব, তেমনই, যাহারা অতিশয় হীনচেতা তাহারাও ঐরূপ স্খলন হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই 'কাম-কাঞ্চন-ত্যাগের উপদেশ মনে পড়ে, এবং সেই সম্পর্কে আর একটি যে কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় তাহা এই যে; আধ্যাত্মিক শ্রেয়োলাভের জন্য যদি ওই দুই-ই বর্জ্জনীয় হয়, তথাপি বরং প্রথমটাও ভাল, তাহাতে মনুষ্যত্বের ঐকান্তিক বিলোপ না হইতেও পারে (হয় নাই, 'এমন দৃষ্টান্ত আছে)। কিন্তু দ্বিতীয়টির লালসায় মানুষের মনুষ্যত্ব অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। অর্থ-গৃধ্নু মানুষের মত অমানুষ—পিশাচ আর নাই, এমন চরম অধোগতি আর কিছুতেই হয় না। এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র এই নৈতিক শুচিতা বা morality-র পরিবর্ত্তে 'চিত্তশুদ্ধি'-কেই প্রাথমিক প্রয়োজন বলিয়া মনে করিয়াছেন; যথা—

"ইন্দ্রিয়সংযম অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ কথা; চিত্তশুদ্ধির তাহা অপেক্ষা গুরুতর লক্ষণ আছে।...ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিব না; কিন্তু আমি ভাল থাকিব, আমার-গুলি ভাল থাকিবে, এই বাসনা তাহাদের মনে বড় প্রবল।...আমার ধন হউক, আমার মান হউক, আমার সম্পদ হউক, আমার সৌভাগ্য হউক—আমি বড় হই, আমার সবাই আমার অপেক্ষা ছোট হউক, তাঁহারা এইরূপ কামনা করেন।...সেজন্য না করেন এমন কাজ নাই। যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত তাহাদের অপেক্ষাও ইঁহারা নিকৃষ্ট। ইন্দ্রিয়াসক্তির অপেক্ষা এই আত্মাদর, এই স্বার্থপরতা চিত্তশুদ্ধির গুরুতর বিঘ্ন।"

কিন্তু সে-যুগের প্রধান সমস্যা ছিল—মানুষের মানুষ্যত্ব-গৌরবের দাবি ও তাহার পূরণ; ইহাই সকল সমস্যার মূল। মনুষ্যমাত্রেরই জীবনের মূল্য ও মনুষ্যত্বের অধিকার স্বীকার করিতে হইবে; তজ্জন্য ধর্ম্মে, সমাজে ও রাষ্ট্রে তাহার কল্যাণসাধনের উপযুক্ত ব্যবস্থা বিহিত হওয়া চাই। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা ভাবিয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী যে-ব্যবস্থার একটা খসড়া তৈয়ারী করিয়াছিলেন, তাহা অন্যত্র সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। তথাপি সে-সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি মূল চিন্তার একটু ব্যাখ্যা ও বিচার আবশ্যক। প্রথমেই দেখা যায়, তিনি একটা আদর্শ-সমাজ কল্পনা করিয়াছেন; সেখানে ব্যক্তি ও সমাজ এই দুইয়ের কল্যাণ যেমন একই, তেমনই ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র স্বার্থ বা অধিকার নাই, অতএব অধিকার-সাম্যের প্রশ্নও নাই। পরস্পরের সমান অধিকার নাই বটে, কিন্তু প্রত্যেকের ন্যায্য অধিকার আছে—সে অধিকার মানুষ হওয়ার অধিকার। ইহার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যে একমাত্র উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন—তাহা শিক্ষা, এবং তাহাতে মানুষমাত্রেরই অধিকার থাকিবে।

শিক্ষার মূলে একটা আদর্শ থাকিবেই ;—সমাজই মনুষ্যত্বের ভিত্তি বটে, তাহারও একটা আরোহণীয় চূড়া আছে ; *মানুষ সকলেই সমান এই অর্থে যে, সেই আরোহণ-সামর্থ্য সকলেরই আছে।* এই হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শবাদী, নতুবা তাঁহার মত বাস্তববাদী সে-যুগে আর কেহ ছিল না।

কিন্তু আসল কথা ওই সমাজ। সমাজ বলিতে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অনুধাবনযোগ্য ; কারণ, তাঁহার সমগ্র জীবনদর্শন ও ধর্ম্ম-তত্ত্বকে ধারণ করিয়া আছে এই সমাজ। তাঁহার মতে সমাজ অর্থে প্রথমত—একটা বিশেষ স্থান ও কালগত সংস্কৃতি বা জাতিসংস্কারসম্পন্ন জনসংহতি ; পরে, সেই জনগণের আত্মবিকাশের জন্য ব্যষ্টি ও সমষ্টির পরস্পরসম্বন্ধযুক্ত যে একত্র-জীবন—তাহারই আধার এই সমাজ। অতএব সমাজ বলিতে একটা জাতি ও দেশের সীমাযুক্ত জনমণ্ডলীই বুঝায়—স্বজাতি ও স্বদেশ বুঝায়। এইরূপ প্রত্যেক সমাজের স্বতন্ত্রভাবে আত্মবিকাশের অধিকার স্বীকার করিলে, স্বকীয় ও পরকীয় অধিকার সমভাবে মানিয়া চলিলেই—মানুষের এইরূপ সমাজবদ্ধ জীবনে মনুষ্যজাতির বৃহত্তর কল্যাণ আপনা-আপনি সাধিত হইবে,—অনুশীলন-ধর্ম্মের অন্তর্গত জগৎ-প্রীতির সহিত স্বজাতি-প্রীতির সংঘর্ষ ঘটিবে না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'ধর্ম্মতত্ত্বে' ইহার সত্য ও সম্ভাব্যতা বিশেষ যুক্তি সহকারে প্রমাণ করিয়াছেন। একেবারেই অতি উচ্চ আদর্শ খাড়া করিয়া ভাবের স্বপ্ন-স্বর্গ রচনা করিতে তিনি এখানেও বিশেষ সাবধান হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, তিনি আধুনিক রাজনৈতিক বা অর্থ-নৈতিক শ্রেয়োলাভকেই মানুষের পরম পুরুষার্থ মনে করেন নাই—মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। সকলেই একই সঙ্গে, একই কালে সেই এক গন্তব্যে না পৌঁছিলে সাম্যতত্ত্বের হানি, অথবা অবাস্তবতা-দোষ ঘটে বলিয়া তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। জীবনকে যে দিক দিয়া দেখার ফলে আধুনিক সাম্যবাদ একটা বড় তত্ত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং মানুষের সুখ-স্বাধীনতাকে যে মাপকাঠিতে মাপিয়া লওয়ার ফলে এই নূতন সমাজ-ব্যবস্থা ও সমাজ-নীতি উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের জীবন ও মানুষের সুখ এই দুইকে সে দিক দিয়া দেখিতে পারেন নাই—চাহেন নাই বলিয়া নয়, তাহা মনুষ্যপ্রকৃতির অনুকূল নয় বলিয়া। প্রাকৃতিক নিয়মেই পুরুষের যে-উন্নতি সম্ভব তাহাকেই—তাহার স্বভাবের মধ্যেই যে মহত্ত্বের বীজ আছে তাহার পূর্ণবিকাশ-সাধনকেই, তিনি বাস্তব ও আদর্শের সামঞ্জস্য-মূলক—অতএব অতিশয় সত্য—বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। কেবল প্রাণীহিসাবে সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিলেই মানুষের মনুষ্যত্ব চরিতার্থ হইতে পারে না ; মনুষ্যজাতির ইতিহাস, বাহিরের দিক দিয়া যেমনই হউক—ভিতরের দিক দিয়া তাহারই সাক্ষ্য দিবে। উপসর্গটা যত বড় হউক, তাহার চিকিৎসাই আসল চিকিৎসা নয়। সব পাইয়াও মানুষের দুঃখ দূর হয় না, আবার সব হারাইয়াও মানুষ পরম সুখ লাভ করে ;—ইহা ভুল শিক্ষা, কুসংস্কার, আত্ম-প্রবঞ্চনা, অথবা এক শ্রেণীর দ্বারা অপর এক শ্রেণীর উপরে উৎপীড়নের ফলে একরূপ চিত্তবিকার নয়। ইহা যদি

ব্যাধিও হয়, তবে তাহা মানুষের জন্মগত ব্যাধি। সৃষ্টিবিধানের একটা রহস্যময় নিয়মই এই যে—যাহাতে বন্ধন তাহাতেই মুক্তি, যাহাতে মৃত্যু তাহাতেই জীবন, যাহা ব্যাধি তাহাই আরোগ্যের নিদান। মানুষ যেমন বাহিরকে জানিয়াছে এবং চিরদিন তাহার সহিত সংগ্রাম করিয়াছে ও করিতেছে—তেমনই তাহার অন্তরের মধ্যেও সে আপনাকে নিত্য নিরীক্ষণ করিতেছে; একটার দিকে অন্ধ হইয়া অপরটাই দেখিতে চাহিলে, তাহা আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র—পরিত্রাণও সুদূরপরাহত হইয়া থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র সমাজ বলিতে কি বুঝিয়াছিলেন, এবং কেনই বা সেই সমাজকেই মানুষের কল্যাণসাধনের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস করিয়াছিলেন, আমি যথাসাধ্য তাহার একটা বিবৃতি ও ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র-পরিকল্পিত এই সমাজ একটা ভাবস্বর্গ বা অবাস্তব Utopia নয়; তাহা যে মনুষ্য-প্রকৃতির পক্ষেই সম্ভব, তাহা যে বুদ্ধি ও যুক্তি-সম্মত, এ কথা সকল সুস্থ মানুষ স্বীকার করিবে। ওই আদর্শকে ব্যবহারিক রূপ দিতে হইলে, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি ও ধর্ম্মনীতির যে পরিবর্ত্তন ও তদনুযায়ী বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহাও খুব বড় মিস্ত্রির কাজ; তেমন প্রতিভাও দুর্ল্লভ হইবে না—যদি 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' বলিয়া মানুষের প্রাণে ওই মনুষ্যত্বপিপাসা জাগে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই কালেই যে সমস্যাকে মূল সমস্যা বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, আজিকার দিনে তাহাই গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে; তাহার যে উপায় চিন্তা করিয়াছিলেন তাহাও একেবারে নিরর্থক হইয়া পড়ে নাই। একটা বিশিষ্ট যুগ ও জাতির সম্পর্কে তাঁহার সেই চিন্তাই আজ সর্ব্বজাতির চিন্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাহার কারণ, তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ-সন্ধানে মানুষেরই কল্যাণ-চিন্তা করিয়াছিলেন।

এই স্বদেশ ও সমাজ একই বস্তু। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আধুনিক কালে বিশ্বমানব নামে যে একটা ধারণার উদ্ভব হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাতে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি এই সমাজ অর্থে-ই 'নেশন' বুঝিতে রাজি আছেন, এবং Nationalism-এর উপরেই Internationalism স্থাপনা করিতে চান। এদিক দিয়া তিনি খাঁটি Realist, কারণ তিনি প্রকৃতিবাদী,—তত্ত্ববাদী বা ভাববাদী নহেন; অর্থাৎ, তিনি সৃষ্টির, তথা মানবপ্রকৃতির মহানিয়মকে মানেন; মানবের মানবত্ব কোন অর্থে যতই সার্ব্বভৌমিক হউক—ভৌগোলিক প্রকৃতি, ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন এবং রক্তের পার্থক্য, এই তিনের সমবায়ে সমাজে সমাজে পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী; নির্ব্বিশেষ নয়—বিশেষের অভিমুখেই সৃষ্টির গতি। এই বৈশিষ্ট্য মনুষ্যজাতির মঙ্গলের অন্তরায় নয়, বরং ক্রমোন্নতির সহায় বা সোপানরূপে অতিশয় প্রয়োজনীয়।

এইজন্যই সমাজ অর্থে তিনি জাতি ও দেশের গণ্ডি বিশেষভাবে স্বীকার করিতেন, মহামানব-সমাজ নামে কোন অত্যুচ্চ অপ্রাকৃত আদর্শে বিশ্বাস করিতেন না। তাই—

"আত্মরক্ষার ন্যায় ও স্বজনরক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষাও ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম, কেন না, ইহা সমস্ত জগতের হিতের উপায়। পরস্পরের আক্রমণে সমস্ত বিনষ্ট ও অধঃপতিত হইয়া কোন পরস্বলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির অধিকারভুক্ত হইলে পৃথিবী হইতে ধর্ম্ম ও উন্নতি বিলুপ্ত হইবে। এইজন্য সর্ব্বভূতের হিতের জন্য সকলের স্বদেশরক্ষণ কর্ত্তব্য।"

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলিবার আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এক স্থানে বলিয়াছেন—"স্বাধীনতা দেশী কথা নহে, বিলাতী আমদানি, 'লিবার্টি' শব্দের অনুবাদ, ……ইহার এমন তাৎপর্য্য নয় যে, রাজা স্বদেশীয় হইতে হইবে।" রাজা বা শাসক-সম্প্রদায়কে তিনি একটা পুলিশ-পাহারার মতই আবশ্যক মনে করিয়াছেন—সেটা যেন সমাজের কতকটা বাহিরের ব্যবস্থা, ভিতরে সমাজ-পরিচালনের আসল ভার অন্যত্র ন্যস্ত থাকিবে। অর্থাৎ আসল শাসনটা সামাজিক—রাষ্ট্রিক নয়; এবং সেই শাসনও সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ববিকাশের প্রয়োজনমূলক; সেখানে স্বাধীনতা অর্থে পলিটিক্যাল আত্মপ্রসাদ বা ইকনমিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নয়। ইহাও ঠিক নয় যে, রাষ্ট্র-নীতি ও অর্থনীতির দিকটা ঠিক থাকিলেই অন্যগুলি আপনিই উৎকর্ষ লাভ করিবে; আমরা এখন তাহাই বুঝি—সেই যুক্তিকেই অকাট্য মনে করি। কিন্তু এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় ভুল করেন নাই—যদি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার ওই মনুষ্যত্বের আদর্শই ভুল।

বঙ্কিমের দেশপ্রীতি মনুষ্যত্ব-সাধনারই একটা অঙ্গ—সেই বৃহত্তর ধর্ম্মেরই একটা বড় সাধন। ইহার মূল প্রয়োজন রাষ্ট্রিক নয়—সামাজিক; সুলভ পরজাতি-বিদ্বেষ নয়—স্বজাতিপ্রীতিই ইহার একমাত্র প্রেরণা; এমন কি, জগৎপ্রীতি ও ভগবৎ প্রীতিতেই তাহার শেষ পরিণতি। এই স্বদেশ-প্রীতিকেই বঙ্কিমচন্দ্র মনুষ্যত্ব-লাভের অতিশয় সহজ ও নিশ্চিত উপায় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালের মত, গোড়া হইতেই ভগবানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জগৎ-সংসারের প্রতি উদাসীন থাকিলে এ কালে আর চলিবে না; ভগবানের জন্য সংসার-ত্যাগ নয়—মানুষের জন্যই আত্মত্যাগ করিতে না পারিলে চিত্তশুদ্ধি হইবে না, ভগবান-লাভ তো পরের কথা, আপনাকেও হারাইতে হইবে,—এই সত্য বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন; এবং য়ুরোপীয় জাতিসকলের স্বাজাত্যনিষ্ঠা হইতে ইঙ্গিত পাইয়া, তিনি সেই patriotism-কে শোধন করিয়া—তাহাকেই মানুষের একটি মহৎ ধর্ম্মরূপে গড়িয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার সেই অনুশীলনধর্ম্মের সকল অঙ্গ সংযোজন ও সুসম্পূর্ণ করিয়া লওয়ার পরে, তিনি যেন শেষে এই মন্ত্রটিকে বিদ্যুৎ-বিকাশের মত আপন অন্তরে দর্শন করিলেন এবং ঋষির মতই উচ্চারণ করিলেন—"ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন দেশপ্রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম।"

দেশপ্রীতি ও সার্ব্বলৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই। তাহা ঘটিলে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবে।

এই কথাই, বোধ হয়, ধর্ম্মসম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা খুব বড় কথা। জাগতিক প্রীতিই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বের মূলতত্ত্ব ইহাই বটে; কিন্তু তত্ত্বকে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে হইলে—মানুষকে নিঃস্বার্থ করিবার সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায়—এ যুগে এমন আর কিছুই নাই। মনুষ্য-ধর্ম্মের সকল দিক চিন্তা করার পর, সর্ব্বশেষে এই যে তত্ত্ব তাঁহার চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার দৃষ্টির গভীরতাও যেমন—তেমনই তাঁহার বাস্তব-নিষ্ঠাও প্রকাশ পাইয়াছে। মনে হয়, ভারতের সেই প্রাচীন ধর্ম্মতত্ত্বকেই ভিত্তি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে নবধর্ম্ম প্রণয়ন করিয়াছিলেন—তাহার দৃঢ়তম খিলান হইল এই দেশপ্রীতি। আশ্চর্য্য বটে! কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা ও চিন্তাপ্রণালী যিনি আমূল পর্য্যালোচনা করিবেন, তিনি ইহাতে বিস্মিত হইবেন না; বরং জাতির চিন্তার ইতিহাসে তাঁহার এই দান যেমন অমূল্য, তেমনই যুগান্তকারী বলিয়া স্বীকার করিবেন। ভারতীয় ধর্ম্মের অঙ্গীকৃত করিয়া এই স্বদেশপ্রীতিকে এত বড় স্থান দিবার কল্পনাও পূর্ব্বে কেহ করে নাই।

আমরা দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র যে আদর্শে তাঁহার ওই সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চান, তাহা মূলে সেই প্রাচীন আদর্শ; রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতির পরিবর্ত্তে তিনি মনুষ্য-ধর্ম্মনীতিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। তথাপি সেই সমাজকে তিনি এই যে একটি মন্ত্রের গ্রন্থিতে বাঁধিয়া দিয়াছেন, ইহাতেই সেই প্রাচীনকে সম্পূর্ণ আধুনিক পন্থায় স্থাপন করা হইয়াছে—সেই আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য করিয়াই এ যুগের প্রয়োজনকে পূর্ণভাবে বরণ করা হইয়াছে। ওই আদর্শ এবং যুগের এই প্রয়োজন এই উভয়ের সামঞ্জস্য করিয়া, যদি একটা সমাজব্যবস্থা সম্ভব হয়, এবং রাষ্ট্র-নীতির সহিত সে ব্যবস্থার বিরোধ না ঘটে—এ দেশে এমন কোন লোক-গুরুর আবির্ভাব হয় যাঁহার প্রতিভায় জাতির জীবনে ঐ মন্ত্র কার্য্যকরী হইয়া উঠে, তবেই এই মহামন্বন্তরে আমরা বাঁচিয়া থাকিব, নতুবা নহে—বঙ্কিমচন্দ্র ইহাই আশা ও বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

নবযুগের সমস্যা ও তাহার সমাধানে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনা-চিন্তার যে পরিচয় আধুনিক বাঙালী পাঠকসমাজে দিলাম, তাহাতে, আশা করি—আর কিছু না হউক, বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার যুগ এই বিস্মৃতিপরায়ণ জাতির স্মৃতিপটে ক্ষণিকের জন্যও প্রতিফলিত হইবে।

সে যুগের যুগনায়করূপে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই সাধনা—সে যুগের সকল উৎকণ্ঠাকে, জাতির হইয়াই একটি চিন্তায় কেন্দ্রীভূত করা, এবং মুক্তির একটা প্রশস্ত পন্থা নির্দ্ধারণ—তিনি যেমন করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ তেমন করেন নাই। তাঁহার সেই চিন্তার কতখানি এখনও এই বহু-মতের তুমুল সংঘর্ষে টিকিয়া থাকিবার যোগ্য, এবং ভবিষ্যতেও তাহার কতটুকু সাধনযোগ্য বলিয়া গ্রাহ্য হইবে, সে বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্রের মত মনীষী বাংলাদেশে অল্পই জন্মিয়াছেন। সে যুগের সমস্যা তাঁহাকে যে দিক দিয়া যে ভাবে বিচলিত

করিয়াছিল—তাহা ক্রমেই গভীরতর হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন ও আধুনিকের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তিনি উভয়ের যে সামঞ্জস্য সন্ধান করিয়াছিলেন, আজিও সেই সামঞ্জস্যের প্রয়োজন আছে ; শুধুই যুগ বা জাতি নয়, সারা পৃথিবীর ইতিহাস গতি ও স্থিতির একটা সংশয়-সঙ্কটে আসিয়া অনিশ্চিতভাবে দোল খাইতেছে —মানুষের মনুষ্যত্বের এক মহা-পরীক্ষা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য Humanism-এর যে প্রেরণা আমাদের চিত্তে জন্মিয়াছিল —রামমোহন হইতে বঙ্কিম পর্য্যন্ত তাহা প্রায় একমুখে বৃদ্ধি পাইয়া শেষে একটা বাস্তব কিছুকে আশ্রয় করিয়া স্থির হইতে চাহিয়াছিল ; চিত্তের সেই অস্থিরতার মধ্যে স্থিরত্ব-লাভের প্রয়াস বঙ্কিমের চিন্তাতেই প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়—সমগ্র-দৃষ্টি ও স্থির-দৃষ্টির লক্ষণ তাহাতেই আছে। দৃষ্টির ওই ভঙ্গীটাই বড়, তাহাই অধিকতর মূল্যবান।

আমি যুগনায়করূপেই বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিবার ও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি—তিনি যুগকেও কোথায় কতটুকু অতিক্রম করিয়াছেন, প্রসঙ্গত তাহার কিঞ্চিৎ নির্দ্দেশ করিলেও, আমি মুখ্যত সেই যুগের কথাই বলিয়াছি ; এবং তাঁহার নিজস্ব ভাবচিন্তা যেমনই হউক, তিনি যে তাঁহার কাল ও তাঁহার সমাজকে সর্ব্বদা চোখের সম্মুখে রাখিয়াছিলেন তাহাও বার বার স্মরণ করাইয়াছি। তৎসত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের লোকোত্তর প্রতিভার পরিচয়স্বরূপ একটা কথা আজিও নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, তাহা এই যে—বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি সেই যুগ-প্রয়োজনের যতই বশীভূত হউক, তথাপি তাহা আরও গভীর অর্থে আধুনিক। যাহা তখনও কেহ বুঝিতে পারে নাই, এবং যত দিন যাইতেছে ততই যাহা মানুষের ভাবে-চিন্তায় স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে—নূতন জীবন-দর্শনের সেই সমন্বয়-তত্ত্ব তাঁহার প্রতিভাতেই প্রথম—শুধু চিন্তায় নয়—সৃষ্টিকর্ম্মেও ধরা দিয়াছিল। এইজন্যই আমি এই সমন্বয়-শক্তিকে তাঁহার প্রতিভার প্রধান গৌরব বলিয়া বার বার উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার সর্ব্ববিধ চিন্তায়, এমন কি ভাবকল্পনায় ও কাব্য-সৃষ্টিতেও, ইহাই যেন একমাত্র প্রেরণা হইয়াছে। বাংলা-সাহিত্যের ভাষা-নির্ম্মাণে তিনি যেমন সাধু ও চলতি ভাষাকে একই ছাঁচে ঢালিয়া অসাধ্যসাধন করিয়াছিলেন, তেমনই তাঁহার উপন্যাসগুলিতেও—কাব্য, নাটক ও আখ্যান—এই তিনের এক অপূর্ব্ব মিশ্র-রসরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন ; সেই রূপও বাস্তব এবং আদর্শের মিলিত রস-রূপ। এখানেও ভোগ ও ত্যাগ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, সংসার ও সন্ন্যাস, প্রেম ও morality—এক রসকল্পনায় নির্দ্বন্দ্ব হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যেমন পাশ্চাত্য ও ভারতীয় উভয় সাধনার মিলন চাহিয়াছিলেন, তেমনই মানুষের ধর্ম্মসাধনাতেও, ব্যক্তি ও সমাজ, জ্ঞান ও ভক্তি, মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বরত্ব—এ সকলকে এক সত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। এই দৃষ্টিই ভারতীয় দৃষ্টি ; নূতন যুগের নূতনতর সমস্যায় সেই সনাতনই আবার সাড়া দিয়াছিল ; সর্ব্ববৈষম্য ও বৈচিত্র্যের সমতা-সাধনেই যে সকল সমস্যার মূলোচ্ছেদ হয়—বর্জ্জন নয়, গ্রহণেই পূর্ণ সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাই

ভারতীয় মনীষার শ্রেষ্ঠ গৌরব। বঙ্কিমচন্দ্র সেই তত্ত্বকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন; কেবল, সে বিষয়ে তাঁহার নূতনত্ব এই যে, তিনি যুগসমস্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া জীবনের বাস্তবকে—মানুষের জন্মগত ও প্রকৃতিগত সংস্কারকে—আদৌ স্বীকার করিয়া, সেই সমন্বয়ের একটা পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; তাঁহার তত্ত্ব যত বড় বা আদৌ যত উচ্চ হউক, তিনি সেই বাস্তবকে কিছুতেই হিসাবের বাহিরে রাখিতে পারেন নাই।

বঙ্কিম-সাহিত্যের ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টা—তাঁহার পূর্ব্বে আধুনিক বাংলা গদ্যের জন্ম হইয়াছিল, সাহিত্যের জন্ম হয় নাই। যে ভাব ও স্বপ্ন, যে দৃষ্টি ও মনন-শক্তির বলে, একটা জাতি তাহার অন্তরের অন্তরে চৈতন্য লাভ করে—সংশয় ও বিমূঢ়তার পরিবর্ত্তে আত্মপ্রত্যয়, এবং অনুকরণের পরিবর্ত্তে আপনাকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতা অনুভব করে, তাহার উদ্বোধন করিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র; তাহাতেই বাংলাভাষায় নবযুগের নূতনতর সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম এ জাতির প্রাণ-মনের উৎকণ্ঠাকে বাণী-রূপ দিয়া যে সাহিত্যসৃষ্টি করিলেন, তাহাতে সে দর্পণে নিজ মুখ-প্রতিবিম্ব দেখার মত আপনাকে দেখিল, বুঝিল, ও আশ্বস্ত হইল। তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ তাহা পারে নাই। জাতির জীবনের গূঢ়তম আকুতি, তাহার অতীত ও ভবিষ্যৎ, তাহার ইহ ও পরত্রের যাবতীয় ভাবনা—তাহার বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, ভয়-সংশয়ের সমাধান—এ সকলই সে সাহিত্যে নানা আকারে ও নানা ছন্দে প্রতিফলিত হইয়াছিল। এক একাগ্র-গভীর তন্ময় দৃষ্টির বলে তিনি সকল সমস্যার মূলে পৌঁছিয়াছিলেন—তাঁহার সমগ্র সাহিত্যকীর্ত্তির মূলে আছে সেই এক দৃষ্টি। প্রাণ ও মন, ধ্যান ও জ্ঞান, রূপ ও রস, বাস্তব ও কল্পনা, দর্শন ও বিজ্ঞান, পুরাণ ও ইতিহাস, শাস্ত্র ও যুক্তিমার্গ, অর্থ ও পরমার্থ—সকল দ্বন্দ্বকে তিনি একটি অসাধারণ প্রজ্ঞার বলে বোধি ও বোধশক্তির এক আশ্চর্য্য সমন্বয়ের ফলে, মিলাইয়া লইতে পারিয়াছিলেন। এই যে দৃষ্টি, ইহারই বলে বাংলাভাষায় যে সরস্বতীর অধিষ্ঠান হইল, তাহাই বাঙালীকে প্রবুদ্ধ ও প্রকৃতিস্থ করিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি—নব্য বাংলা-সাহিত্যের রবীন্দ্রযুগ পর্য্যন্ত তাহার সেই রূপবিকাশ, যাহা বিশ্বের দরবারে একটু স্থান লাভ করিয়াছে—তাহার ভিত্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, সকল সত্য-সন্ধ ও বিচারশীল ঐতিহাসিক ইহা স্বীকার করিবেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই প্রেম ও পৌরুষযুক্ত প্রতিভার উদয় যথাকালে না হইলে আমরা রবীন্দ্রনাথকেও পাইতাম না; তিনিই বাংলা ভাষা ও বাঙালীর চিত্তভূমি এমন করিয়া খনন বা কর্ষণ না করিলে, এ সাহিত্যের উৎস এমন বেগবান ও সাগরাভিমুখী হইত না, আজ সেই স্রোতে এমন হাওয়া বহিত না। আজিও ভাষার যে নানা ভঙ্গিতে আমরা সর্ব্ববিধ ভাব প্রকাশ করিয়া থাকি, তাহা বঙ্কিম-রোপিত সেই ভাষা-বৃক্ষের নিত্য নবোদ্গত শাখা ও প্রশাখামাত্র। অতএব বঙ্কিম-সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের একটা অংশ বা অঙ্গমাত্র নয়, সে সাহিত্য আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের মূল ও স্কন্ধরূপে এখনও দণ্ডায়মান আছে।

সাহিত্যের এই নবজন্ম সম্ভব হইয়াছিল কেমন করিয়া? জাতির জীবনে এক একটা যুগসন্ধিক্ষণ আসে, তখন তাহার প্রাণ-ধারা রুদ্ধ হইয়া ক্রমে শুকাইয়া যায়,

অথবা, নূতন খাতে নূতন স্রোতে প্রবাহিত হইয়া থাকে। সেইরূপ একটি সন্ধিক্ষণ আমাদের জীবনেও আসিয়াছিল—আমাদের প্রাণধারা নানা কারণে শুকাইয়া আসিতেছিল; এবং শেষে য়ুরোপীয় ভাবধারার প্রবল আক্রমণে, তাহা নিজের খাতেই নিজে নিশ্চিহ্ন হইতে বসিয়াছিল। বঙ্কিমের পূর্ব্বে এই সঙ্কটকে এমন করিয়া কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই। যাঁহারা ইংরাজী বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন; তাঁহারা সেই বিদ্যার মোহে ক্রমেই অভিভূত হইয়া পড়িতেছিলেন—কোন দৃষ্টিই তাঁহাদের ছিল না। যাঁহারা দেশীয় বিদ্যার অনুশীলন করিতেন, তাঁহারা নূতনের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, অতএব সে বিষয়ে কোন চিন্তাই করিতেন না। যাঁহারা প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে সন্ধি-স্থাপন করিয়া ইংরাজী বিদ্যাকে বাংলায় অনুবাদ করিতেছিলেন, তাঁহারাও কেবল ভাষা ভাব ও চিন্তার কিঞ্চিৎ সংস্কারসাধনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন; কেহই কোন সমস্যা বা সঙ্কটচিন্তায় উদ্বিগ্ন হন নাই। সে যুগের সেই গুরুতর ও আসন্ন সঙ্কটকে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম পূর্ণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এ প্রসঙ্গে একটি কথার উল্লেখ না করিয়া উপায় নাই। অনেকে রামমোহনকেই এ যুগের প্রথম সত্যদ্রষ্টা মনীষী বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু রামমোহনই সর্ব্বপ্রথম যুগপ্রবৃত্তিসম্বন্ধে সচেতন হইলেও তাঁহার সে দৃষ্টি পূর্ণদৃষ্টি ছিল না; তর্ক ও যুক্তির সত্যকে তিনি এত বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তাহাতেই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন—জীবনের সত্যকে, জাতির বিশিষ্ট প্রকৃতি ও তাহার ঐতিহ্যগত নিয়তিকে, সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি কেবল তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইয়াছিলেন, এবং তাহার বলে সমাজে ও জীবনে নানা সংস্কার সাধন করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। কোন তত্ত্বই যাহাকে রোধ করিতে পারে না, সেই সঙ্কটের ভাবনা তাঁহার ছিল না। আসল সমস্যা যে কেবল সত্য-দৃষ্টির অভাব নয়, কেবল বুদ্ধি ও যুক্তিধর্ম্মের অভাবই যে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে না—প্রত্যয়-বিশ্বাস ও প্রাণশক্তির অভাবই যে সকল অশক্তি ও দুর্গতির নিদান, বুদ্ধিবাদী রামমোহন তাহা বুঝিতে চাহেন নাই; বুদ্ধিবাদীরা কোনকালেই তাহা বুঝে না। জাতির দিক হইতে, তাহারই প্রাণ-মনের গভীর প্রবৃত্তি ও সংস্কারের অনুকূলে তাহাকে চালনা করিবার মত প্রেম বা প্রজ্ঞা তাঁহার ছিল না; যে পথে প্রবর্তিত করিলে, যে মন্ত্রে আবাহন করিলে সেই মূঢ় মূক হতজ্ঞান সমাজের সংবিৎ ফিরিয়া আসিবে, সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণাই ছিল না—তিনি নিঃসম্পর্কীয় চিকিৎসকের মত কেবল একটা ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া এবং কোথাও বা আইনরূপ অস্ত্রোপচারের চেষ্টা করিয়াই প্রভূত আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। রামমোহনের বিচারশক্তি ছিল, কল্পনাশক্তি ছিল না; তীক্ষ্ণ মেধা ছিল, দিব্য-প্রতিভা ছিল না। এজন্য রামমোহন এ জাতির মস্তিষ্কে যেটুকু ধাক্কা দিয়াছিলেন, তাহার ফলে যে একটি আন্দোলন জাগিয়াছিল, তাহা জাতির জীবনক্ষেত্র হইতে দূরে একটি বিচ্ছিন্ন খাল বা পল্বলের সৃষ্টি করিয়াছিল—মূল নদীস্রোত যে বালুচরে রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, তাহার কোন প্রতিকার হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে, অর্থাৎ রামমোহনের প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে জাতির ভবিষ্যৎ আরও

সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল; যাহারা ইতিমধ্যে নবযুগের নবশিক্ষায় আরও অগ্রসর হইয়াছে, এবং সেই শিক্ষার গুণেই যাহারা প্রাচীন সমাজপতিগণ অপেক্ষা অধিকতর মান্য হইয়াছে, তাহারা—বাহ্যিক সমাজ-ব্যবহারে যেমনই হউক—জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি ভিতরে ভিতরে অতিশয় শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িতেছিল, সমাজের ভালমন্দ-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হইয়া নিজ নিজ পদ ও প্রতিপত্তি লইয়াই তাহারা সন্তুষ্ট ছিল। এক দিকে ইংরেজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমাজের এই সম্বন্ধ, অপরদিকে সর্ব্বশিক্ষাবঞ্চিত নেতৃত্বভ্রষ্ট সমাজের সেই যুগধর্ম্মপ্লাবনে তটস্খলিত মৃত্তিকাস্তূপের মত ভাসিয়া যাইবার উপক্রম—সেই বর্ত্তমান ও সেই ভবিষ্যৎকে বঙ্কিমচন্দ্র অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। এ সমাজকে বাঁচাইবার উপায় কি? কোন্ ধর্ম্ম ইহাকে ধরিয়া রাখিবে? কোন্ ভাববিগ্রহ ইহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিলে ইহার প্রাণমন সাড়া দিবে? এই সমস্যার সন্মুখীন হইয়াই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির কাজে নিজের প্রাণমন ও প্রতিভাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এ সাহিত্য বুঝিতে হইলে ও তাহার যথার্থ মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে সেই সমস্যার গুরুত্ব ও তাহার বশে কি ভাবে, কোন্ সাধনার অভিমুখে সেই প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছিল, তাহাই ভাল করিয়া জানিতে হইবে।

২

বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে ইহাই স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন যে, আমাদের সমাজ ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজ; এ সমাজে রাজা বা ধনী সম্প্রদায়ের প্রাধান্য যেমনই হউক—বৈষয়িক জীবনে হিন্দু যে নীতির উপাসনা করুক, তাহার মজ্জাগত সংস্কারে জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, ও ভাব-সত্যের শাসনই প্রবল। বিদেশী বা বিধর্ম্মী রাজার অধীনতা তাহার বহুদিন সহিয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহার সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যের হানি হয় নাই। যাহারা জ্ঞানে, চিন্তায়, ভাবের উচ্চতর আদর্শে তাহার সমাজে শ্রেষ্ঠ, তাহারাই চিরদিন তাহার অন্তর্জ্জীবনের ধারাকে রক্ষা ও শাসন করিয়াছে। কিন্তু এতদিন পরে যে জাতি রাজা হইয়াছে, সে কেবল—তাহার বৈষয়িক জীবনেই প্রভুত্ব নয়—তাহার প্রাণ-মনের উপরেও শাসন-বিস্তার করিতেছে; সে শাসন তাহার সমাজের সেই শীর্ষস্থানীয়গণ মানিয়া লইতেছে। ক্রমে ব্রাহ্মণের সমাজপতিত্ব আর টিকিবে না; তাহাদের স্থান এমন এক নূতন জ্ঞানী ও ভাবুক-সম্প্রদায় অচিরকাল মধ্যে দখল করিয়া লইবে, যাহাদের আদর্শ আর সেই-জাতীয় আদর্শ নয়; সে আদর্শের বিরুদ্ধে জ্ঞানহীন, বীর্য্যহীন প্রাণ-হীন সেই প্রাচীন গুরুবংশ নিজেদের আদর্শ খাড়া রাখিতে পারিবে না। এমন করিয়াই এক জাতি যে অপর জাতীর দ্বারা কবলিত হয়—স্বধর্ম্মের উপর এই পরধর্ম্মের জয়লাভ, এই cultural conquest—ইহাই যে জাতির প্রকৃত মৃত্যু এ সত্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সেই নূতন শিক্ষার নূতন দৃষ্টির দ্বারাই লাভ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে হিন্দুসংস্কৃতি ও সভ্যতার এই সঙ্কট এমন করিয়া তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ চাক্ষুষ করেন নাই। তাঁহার পূর্ব্বগামী

মনীষীরা, প্রায় সকলেই নূতন জ্ঞান ও নূতন বিদ্যা লাভের দিকটাই দেখিয়াছিলেন ; কেহই ক্ষতির অঙ্কটাও হিসাব করিয়া দেখেন নাই। ইহার কারণ বঙ্কিমের পূর্ব্বে এ জাতির যেটুকু জাগরণ ঘটিয়াছিল, তাহা মুখ্যত মনের—প্রাণের নয় ; জাতির সমগ্র-সত্তার যে সাড়া, তাহাই বঙ্কিম-প্রতিভার প্রতীক্ষা করিতেছিল। বঙ্কিমের মধ্যে যেন একটা সমগ্র জাতির জাতিস্মরতা—অতীত জীবনের চেতনা জাগিয়া উঠিয়াছিল ; যে প্রেম পাপশঙ্কী, সেই প্রেম এই পুরুষের মধ্যে দিব্য প্রতিভায় দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং এই প্রেমের প্রভাবেই সে প্রতিভায় উৎকৃষ্ট মনীষার সহিত কবিদৃষ্টির মিলন হইয়াছিল। এই প্রেম আমাদের দেশে তখনও পর্য্যন্ত নূতন ; বঙ্কিমচন্দ্রই এ দেশে এই প্রেমধর্ম্মের আদি ঋষি ও প্রবর্ত্তক।

যে য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রবল প্রভাব, ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজ-শাসনের ভিতর দিয়া, ভারতে তখন একটা নবযুগের সূচনা করিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার শক্তি ও অমোঘতার দিকটি সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াছিলেন। য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেটুকু চর্চ্চা তিনি নিজে করিয়াছিলেন, তাহাতে বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, আগামী যুগ তাহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য ; ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, সে বিদ্যার যাহা সার-সত্য, তাহা শাশ্বত সত্যের বিরোধী নয়—বরং সেই সত্যকেই আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে, মানব-সভ্যতার পূর্ব্ব ইতিহাসে যদি কোথাও কোন সত্য থাকে, তবে ইহার সাহায্যে তাহাই পুনর্জ্জীবিত হইবে। কিন্তু সার-সত্য যাহাই হউক, কোন বিদ্যাই—সেই বিদ্যার অধিকারী যে জাতি, তাহার সমাজ, ধর্ম্ম ও জীবনযাত্রাপদ্ধতির নানা সংস্কার হইতে মুক্ত নয়। য়ুরোপ আজ যে সংস্কৃতির অধিকারী, তাহার আধারও য়ুরোপীয় জীবন, তাহার সত্যও সেই জীবনকে আশ্রয় করিয়া আছে। সত্যের সার্ব্বভৌমিকতা একটা তত্ত্ব মাত্র ; ব্যবহারিক জীবনে তাহা দেশ, কাল ও জাতির বিশিষ্ট সাধনায় একটা বিশিষ্ট রূপেই প্রকাশ পায়। যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির আধারে নবযুগের নূতন সত্যকে য়ুরোপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সেই আধারও সেই সত্যের একটা বড় সহায় ; সে আধার হইতে সেই সত্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া সহজ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র এ দেশের প্রাচীনপন্থীদের মত, দেশ, কাল ও জাতিধর্ম্মের সম্পর্ক বাদ দিয়া, এবং অপর সকল জাতি ও সমাজের অস্তিত্ব যেন অস্বীকার করিয়া, একটা বদ্ধ সমাজের বদ্ধ ব্যবস্থাকেই চিরস্থায়ী মনে করিতে পারেন নাই। তিনি শুধু য়ুরোপের সাহিত্য বা বিজ্ঞানদর্শন নয়—য়ুরোপীয় ইতিহাসও অসাধারণ মেধা ও ভাব-গ্রাহিতার সহিত পাঠ করিয়াছিলেন, এবং তাহা হইতেই বিভিন্ন জাতির জাতিধর্ম্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য—তাহার রক্ষা ও পুষ্টিসাধন করিতে কোন্ জাতি কতটুকু সমর্থ হইয়াছে, অথবা কি কারণে অপর জাতির দ্বারা কবলিত হইয়াছে, তাহা গভীরভাবে অনুধাবন করিয়াছিলেন, এবং তাহারই আলোকে মনুষ্য-জাতির ইতিহাসগত নিয়তিকে বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে অতি অল্প বয়স হইতেই ইতিহাসপাঠে আসক্ত হন, এবং তিনি যে সেকালের ইতিহাস-সাহিত্যে অতিশয় ব্যুৎপন্ন ছিলেন—এ সংবাদ অতিশয় মূল্যবান্।

য়ুরোপীয় ইতিহাসের মধ্যেই যে একটি তত্ত্ব তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত একটি য়ুরোপীয় জাতির প্রত্যক্ষ পরিচয় মিলাইয়া, তিনি সেই তত্ত্ব সম্বন্ধে আরও নিঃসংশয় হইয়াছিলেন। ইংরেজ-জাতির মত স্বজাতি-প্রেমিক তিনি তাঁহার কালে আর কোথাও দেখেন নাই। কিছু পূর্ব্বেই ভারতে সিপাহী-বিদ্রোহ হইয়া গিয়াছে—সেই দারুন সঙ্কটে ইংরেজ-চরিত্রের যে দিকটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার বহু কাহিনী তিনি শুনিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইংরেজের সেই স্বজাতি-বাৎসল্যই তাহার সকল পৌরুষ সকল মনুষ্যত্বের মূল; তাহার অদম্য সাহস, অমিত বীর্য্য, অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ ও অবিচলিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠার মূলে আছে এক প্রবল জাত্যাভিমান—আত্মশ্লাঘা নয়, জাতিশ্লাঘা; জাতীয় গৌরববুদ্ধিই তাহার যত কিছু মহত্ত্বের নিদান। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাও অনুভব করিলেন যে, তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিগত আদর্শ কেবল যে সত্যের বলেই এমন প্রভাবশালী হইয়াছে তাহা নয়—কোন তত্ত্বেই কেবলমাত্র বিশুদ্ধতার বলে মানুষের ধর্ম্ম ও কর্ম্মসাধনায় আধিপত্য করে না, তাহার পিছনে থাকে মানুষের বা জাতির—জীবন ও চরিত্র-শক্তির মহিমা। আমরা জানি যে, জগতে যে সকল ধর্ম্ম মনুষ্যসমাজে গৃহীত হইয়াছে, তাহার তত্ত্ব, নীতি ও শিক্ষা যতই উৎকৃষ্ট হউক, তাহা যে মানুষের জীবনে প্রবেশলাভ করিয়াছে তাহার কারণ—সেই সকল ধর্ম্মগুরুর সাক্ষাৎ চরিত্রশক্তি বা ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব। বঙ্কিমচন্দ্র য়ুরোপীয় বিদ্যার প্রভাবও যেমন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তেমনই তাহার পিছনের সেই শক্তিকেও ভালরূপ বুঝিয়াছিলেন; ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, এই বিদ্যাকে গ্রহণ করিতে হইলে সেই শক্তির সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য্য; সেই বিদ্যার সার-সত্যটুকুই কেবল নিরাপদে আত্মসাৎ করা চলিবে না—হয়, নিজ আত্মার, উদ্বোধন করিয়া এবং তাহাকেই মূলধনরূপে খাটাইয়া উহাকে নিজ সংস্কৃতির খাতায় লাভের অঙ্কে পরিণত করিতে হইবে, নতুবা, পাশ্চাত্যের সেই জাতিধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া নিজের জাতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র এই শেষের ব্যবস্থায় রাজি ছিলেন না। কচের মত, দৈত্যগুরুর নিকটে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, তিনি নিজের মুমূর্ষু জাতিকে পুনর্জ্জীবিত করিতে অধীর হইয়াছিলেন; কিন্তু সেজন্য গুরুগৃহের সেই শক্তিরূপিনী কন্যাকে স্বগৃহে আনিয়া নিজের কুলধর্ম্ম বিপন্ন করিতে তিনি একান্ত পরাঙ্মুখ ছিলেন। দৈত্যগুরুর শিক্ষাতেই তিনি আর এক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; তিনি বুঝিয়াছিলেন, সেই সঞ্জীবনী-মন্ত্রও যে তন্ত্রের অন্তর্গত—যে সাধনায় তাহা আর এক জাতির প্রতিভার আয়ত্ত হইয়াছিল, তাহাও—সেই জাতিপ্রেম; ইহার বলে তাহারা শুধুই নিজেরা অপূর্ব্ব জীবনীশক্তির অধিকারী হয় নাই—অপর জাতির জীবনও প্রভাবিত করিতেছিল। এই তত্ত্ব যে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল তাহার কারণ, যে প্রেম ছিল প্রতিভার মতই তাঁহার জন্মগত সম্পদ, এই বিদ্যার স্পর্শে তাহাই উদ্দীপ্ত হইয়াছিল।

অতএব সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল এই যে, জ্ঞান ও বিদ্যার বিস্তার অবশ্যম্ভাবী,

এবং নবযুগের নূতন অবস্থায় জাতির পক্ষে যাহা একান্ত আবশ্যক, তাহাকে আত্মসাৎ করিয়াই আত্মস্থ হইতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, ইহার জন্য তত্ত্ব বা তর্কবুদ্ধি নয়, বিবেক ও নীতিজ্ঞান নয়—কেবল সংস্কার-আন্দোলন এবং কুপ্রথার উচ্ছেদ-সাধনের সৎসাহসই নয়, যে শক্তি প্রাণের ভিতর হইতেই প্রাণকে সঞ্জীবিত করে, সেই প্রেম শক্তিকে চাই সর্ব্বাগ্রে। বাহিরে নয়—ভিতরে দৃষ্টি করিতে হইবে; যোগী যেমন করিয়া জাতিস্মর হইয়া আপনাকে চিনিয়া লয় —আত্মার অতি দীর্ঘ যাত্রাপথে তাহার সকল উন্নতি ও অধোগতি এবং তাহার কারণ প্রত্যক্ষ করিয়া সে যেমন বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের পথ ও পাথেয় স্থির করিয়া লয়, তেমনই, এই জাতিকে আত্মসাক্ষাৎকার করাইতে হইবে; বাহিরের প্ররোচনায় নয়—স্বধর্ম্মের গ্লানিকুণ্ঠাহীন, স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন স্ফূর্ত্তির বশে, তাহাকে নূতন জীবনে জাগাইতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র গভীর প্রেমে ও গভীর দুঃখে এ জাতির নষ্ট-সাধনার ইতিহাস এবং বহু ভ্রষ্টলগ্নের আত্মঘাত-কাহিনী পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন; এবং সেই ইতিহাসের মধ্যেই তিনি এমন একটা কিছু লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যাহাতে আশায় উল্লাসে তিনি সহসা এক অপূর্ব্ব কবি-শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন।

ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা; একদিকে উৎকৃষ্ট ভাব-সত্যের প্রতিষ্ঠা, অপরদিকে স্বজাতির মনে-প্রাণে তাহা সঞ্চারিত করিয়া নূতন জীবন-ধর্ম্মে তাহাকে সঞ্জীবিত করা। পাশ্চাত্য বিদ্যা হইতেই তিনি এই যে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, ইহার কারণ আর একটু ভিতরে অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমি বঙ্কিমের জাতিপ্রেমকে প্রাক্তন-সংস্কার বলিয়াছি; কথাটা হিন্দুর ভাষায় বলিয়াছি, কিন্তু তাই বলিয়াই অযথার্থ নয়। তাঁহার স্বজাতি-প্রীতি ঠিক য়ুরোপীয় স্বাজাত্যবোধ নয়—তাহা কেবল জাতিহিসাবেই গৌরববোধ নয়। যে হিন্দুসাধনা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী বলিয়া তিনি নিজেকে ধন্য বোধ করিতেন, ইহা সেই স্বধর্ম্ম-প্রীতিরই পরিণাম—স্বজাতি-প্রীতি। য়ুরোপ হইতে যে প্রেরণা তিনি পাইয়াছিলেন—তাহা হইতেই যেন চকিতে হিন্দুর ইতিহাস, জাতিস্মরের হৃদয়ে পূর্ব্বজন্মস্মৃতির মত, তাঁহার চিত্তে চমকিয়া উঠিয়াছিল; তিনি যেন নিমেষে শত শতাব্দী পার হইয়াছিলেন। তিনি যখন নিষ্পলক মুগ্ধদৃষ্টিতে পাশ্চাত্য সরস্বতীর সেই জয়জয়ন্তীর-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তখনই সেই সরস্বতীরই আর এক মূর্ত্তি আরও পরিস্ফুট, আরও মহিমময়রূপে, তাঁহার দৃষ্টি ভরিয়া তুলিল; এ যেন প্রতিধ্বনি দ্বারা ধ্বনিকে চিনিতে পারা—পরধনের হিসাব করিতে গিয়া আত্মধনের পরিচয় পাওয়া; অথবা পরকে জানিতে গিয়াই আত্মজ্ঞানের উদয়। সেই যে আত্মজাগরণ, তাহাতে জ্ঞান ও প্রেমের যুগ্মধারায় তাঁহার প্রতিভার পূর্ণাভিষেক সম্পন্ন হইয়াছিল। য়ুরোপীয় জাতি-প্রেম হিন্দু-আদর্শের দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া যে দেশ-প্রেম বা জাতি-প্রেমের রূপ ধারণ করিল, তাহা আপাত-সাধনায় সংকীর্ণ হইলেও—মূলে তাহা মানব-প্রেম; সে জাতীয়তা পর-বিদ্বেষ নয়—আত্মোন্নতির দ্বারা পূর্ণমনুষ্যত্বে আরোহণ করিবার সোপানমাত্র;

কারণ কবি-বঙ্কিম ঋষির মত সাহিত্যের যে নব ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন; তাহার ভাষাই হিন্দু, কিন্তু তাহার দেবতা—মানুষ। এইবার তাঁহার এই নূতন মন্ত্রদৃষ্টি কেমন করিয়া লাভ হইয়াছিল তাহাই বলিব।

৩

যুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পশ্চাতে বঙ্কিমচন্দ্র মানুষকেই এক নূতন চক্ষে দেখিয়াছিলেন—বিশেষ করিয়া তথাকার সাহিত্য ও ইতিহাস তাঁহার দৃষ্টিকে বিস্মিত ও চিত্তকে উদ্বিগ্ন করিয়াছিল। সেখানে তিনি দেখিয়াছিলেন—পাপে-পুণ্যে মানুষের আশ্চর্য্য শক্তিমত্তা; উল্লাসে ও যাতনায় তাহার অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর; মমত্বে ও নির্ম্মমতায় তাহার অদ্ভুত চিত্তবিকার, বুদ্ধি ও কর্ম্ম-কৌশলে তাহার অসাধারণ সজীবতা। যুরোপের আধুনিক ইতিহাসে তখন দুইটি নরসূয়-যজ্ঞ হইয়া গিয়াছে—একটি বৈদিক সোমযাগ, তাহার নাম রেনেসাঁস; আর একটি তান্ত্রিক ভৈরবী-সাধন, তাহার নাম ফরাসী-বিপ্লব। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সমাজে ও রাষ্ট্রনীতিতে, শিল্পে ও সাহিত্যে, বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের বীর্য্য, মনীষা ও প্রতিভার যে পরিচয় পাইয়াছিলেন,—তথাকার ইতিহাসে, মানব-সভ্যতায় বিভিন্ন জাতির যে অবদান, এবং কালচক্রে তাহার যে গতি ও পরিণামের কাহিনী অবগত হইয়াছিলেন, তাহাতে একদিকে মানুষের মহিমা যেমন তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়াছিল, তেমনই তাঁহার জন্মগত হিন্দু-সংস্কার, সেই ইতিহাসকে সৃষ্টির বৃহত্তর নিয়মের সঙ্গে মিলাইয়া, সে-সাধনার ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানে তাঁহাকে ব্যাপৃত করিয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, সেখানকার জাতিসকলের জ্ঞান-কর্ম্মের সেই অপূর্ব্ব সাধনাও পূর্ণ নহে—যেন কোন একটা উপাদানের অভাবে সে সাধনা কালজয়ী হইতে পারিতেছে না। সেখানকার মানুস কেবল ইতিহাসের—অর্থাৎ যুগ-দেবতার পূজার অর্ঘ্য সাজাইয়াছে, মানুষের সকল কীর্ত্তির নশ্বরতার জয়গানে নূতন নূতন সুর যোজনা করিয়া চলিয়াছে; এমন একটি বস্তুকে জীবনের সেই অস্থির তরঙ্গ-ভঙ্গের উর্দ্ধে সে তুলিয়া ধরিতে পারিতেছে না, যাহা অকূল সিন্ধুবক্ষে ধ্রুবতারকার মত, সর্ব্বকালে সর্ব্বমানবের দিক্‌ভ্রম নিবারণ করিতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র এই বস্তুর অভাবকে সেই প্রেমের অভাব বলিয়া বুঝিয়াছিলেন—হিন্দু যাহাকে পরমপুরুষার্থের একমাত্র সাধনোপায় বলিয়া নিশ্চিত-জ্ঞান করিয়াছিল। এ প্রেম কামনাকেই নিষ্কাম করিয়া তোলে; কর্ম্মকে ফলাকাঙ্ক্ষাহীন করিয়া, জ্ঞানকে আত্মজ্ঞানের পরমানন্দে চরিতার্থ করে; এ প্রেম সর্ব্বপ্রবৃত্তিকে পরিশুদ্ধ করিয়া মানুষকে জীব-জীবনের নিয়তি-পাশ হইতে মুক্ত করে; জীবনকে তুচ্ছ করিয়া নয়—আত্মত্যাগের দ্বারাই, তাহাকে আরও বড় বলিয়া গ্রহণ করে; জীবন-বিমুখতা, বৈরাগ্য বা আধ্যাত্মিক মোক্ষসাধন নয়—পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বসাধনের দ্বারা জীবনকে নিরতিশয় মহিমান্বিত করে। এই প্রেম ব্যতিরেকে মানুষের সকল উদ্যম বৃথা—অন্ধ জীবনপ্রবৃত্তির নিস্ফল আয়াস মাত্র। এই প্রেম, মানুষের দেহভাণ্ডেই, তাহার মানবীয় বৃত্তিসমূহের স্বাভাবিক বিকাশ-

মুখে—ক্ষুধা-তৃষ্ণা, বাসনা-কামনার আত্যন্তিক আক্ষেপে—বিকশিত হয়; ইহা তাহার দেবত্ব নয়, মনুষ্যত্বেরই নিদান। তিনি মানুষের জীবনের স্থূল অংশকে বাদ দিয়া, মানবতার কোন সূক্ষ্ম ভাবগত আদর্শে আকৃষ্ট হন নাই; মানব-জীবন-বৃক্ষের শাখাপল্লব বাদ দিয়া তাহার ফুলগুলিকে মাত্র চয়ন করিয়া, এবং তাহারও কেবল সুরভি-নির্যাসটুকুকেই হাওয়ায় মিশাইয়া, সেই ঘ্রাণে মুগ্ধ হইতে পারেন নাই। মানুষের বাস্তব-জীবনের নিয়তিকে তিনি মুগ্ধনেত্রে পরম বিস্ময়ে দৃষ্টি-গোচর করিয়াছিলেন। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই মৃত্যুর সহিত অমৃতের যে দ্বন্দ্ব রহিয়াছে, এবং—জয় হউক আর পরাজয় হউক—সেই দ্বন্দ্বই যে তাহাকে দেবতারও অধিক গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়াছে, মানুষের এই পরিচয় তিনি নূতন করিয়া পাশ্চাত্য সাহিত্যে ও ইতিহাসে পাইয়াছিলেন। সকল দুর্ব্বলতা ও মোহ সত্ত্বেও জ্ঞানের, ধ্যানের যত কিছু আদর্শ—তাহা মানুষেরই সৃষ্টি, মানুষের মহত্ত্বই সর্ব্ব সাধনার আদি ও শেষ, যাহা মানুষের মধ্যে নাই তাহা আর কোথাও নাই—ইহাই উপলব্ধি করিয়া তিনি মানব-পূজার নূতন ধর্ম্মে—পাশ্চাত্য কবি ও ভাবুকের সেই Humanism বা নরনারায়ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই দীক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছিল ভারতীয় হিন্দু-ঋষিগণের শিক্ষায়। আমরা জানি, বঙ্কিমচন্দ্র ফরাসী দার্শনিক কোঁতের (Comte) প্রত্যক্ষ-মানব-ধর্ম্মবাদে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি তৃপ্ত হইতে পারেন নাই; যদিও সে ধর্ম্মের যাহা মূলমন্ত্র—সেই মানবপ্রীতি তাঁহার সারাজীবনব্যাপী সাহিত্য-সাধনার প্রেরণারূপে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সেইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে মানুষের পূর্ণ মনুষ্যত্ববিকাশের অবকাশ নাই, তাহাতে মানুষের জীবনকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিবার উপায় নাই—ইহাই বুঝিয়া, তিনি সেই প্রেম—সেই মানব-প্রীতিকে—একটিমাত্র বৃত্তির পরিবর্ত্তে, সর্ব্ববৃত্তির মূলে স্থাপন করিয়া, আদর্শকে বাস্তবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত করিলেন। নিজ প্রতিভা বা বোধির বলে, এই যে সত্যকে তিনি অন্তরের মধ্যে অনুভব করিলেন, হিন্দু-সাধনার ইতিহাসে তাহার উৎকৃষ্ট চিন্তাভিত্তি এবং সিদ্ধিলাভের আশ্বাস দুই-ই রহিয়াছে দেখিয়া তিনি সর্ব্বসংশয়মুক্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র মুখ্যত কোন তত্ত্বের সাধক বা প্রচারক ছিলেন না—নূতন সমাজ বা শাস্ত্রবিধির প্রণয়নে তাঁহার উৎসাহ ছিল না। মানুষের জীবন ও মনুষ্য-প্রকৃতিকে গভীরভাবে অনুধ্যান করিয়া, দেশ ও কালের অধীনে তাহার ঐতিহাসিক গতি ও অগতিকে—তাহার বাস্তব নিয়তিকে—তিনি গ্রাহ্য করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের সাধ্য ও সাধনের শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাস করিতেন। একদিকে পাশ্চাত্যের প্রত্যক্ষ শক্তিসাধনা যেমন তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, তেমনই আর একদিকে সেই মানবীয় সাধনার ভারতীয় রূপ এবং তাহাকে সিদ্ধিলাভের কথা চিন্তা করিয়া তিনি আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যাহা তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা উদ্বিগ্ন করিয়াছিল তাহা এই যে, সেই কালে তাঁহার স্বজাতি-সমাজে এই মানব-ধর্ম্ম বিপন্ন হইয়াছে; মনুষ্য-প্রকৃতির যে অলঙ্ঘ্য নিয়মে মনুষ্যত্বের

শেষ সোপানে আরোহণ করিতে হইবে তাহারই বিরুদ্ধাচার প্রবল হইয়া উঠিতেছে। সেই যুগ-সঙ্কটে একটি বিশেষ জাতি ও সমাজের অবস্থা তিনি প্রাণের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, আমি ইহাকেই বলিয়াছি—প্রেম। ইহা মানুষের ধ্যান, জ্ঞান প্রভৃতি সকল বৃত্তির সমন্বয়-জাত এক অপরা বৃত্তি, ইহাই সেই "impassioned expression which is in the countenance of all science"। এই যে প্রেম, ইহারই বলে মনুষ্যত্বের সেই "পুরুষং মহান্তং"-কে জানিয়াও, এবং ভূয়োভূয়: তাহাকে প্রণাম করিয়াও তিনি তাঁহার মানব-পূজায় কোন অত্যুচ্চ ভাব-বিগ্রহ স্থাপন করিলেন না, মানুষের ভিতর দিয়াই মানবত্বের আদর্শ সন্ধান করিলেন। এ বিষয়ে তিনি—রেনেসাঁস, ও ফরাসী-বিপ্লবের যে য়ুরোপ, তাহারই শিষ্য। আবার হিন্দুর বিশিষ্ট ভাবনা ও সাধনা তিনি যতটুকু বুঝিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার এই মানব-পূজা সুসম্পূর্ণ হইয়াছিল—মানুষের মহত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার সর্ব্বসংশয় দূর হইয়াছিল। সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা ইহা অপেক্ষা সত্য বা উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মপ্রচার, ইহাই অধুনা বহুনিন্দিত তাঁহার অসাহিত্যিক সাহিত-ব্রত বা সাহিত্য-দ্রোহ। সর্ব্বযুগের সর্ব্ব-সাহিত্যের যাহা শ্রেষ্ঠ প্রেরণা—মানুষের প্রতি আস্থা, মনুষ্য জীবনের মহিমাকীর্ত্তন, মানুষের নিয়তিকে আদ্যন্ত ধ্যান করিয়া তাহার পূর্ণমণ্ডল আবিষ্কার—বঙ্কিমের সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে আছে তাহাই। হোমার নয় শেক্স্পীয়ারও নয়—মহাভারতকার যে দৃষ্টিতে মানব-সংসারকে দেখিয়াছিলেন, কবি-বঙ্কিম সেই দৃষ্টিকেই এক অভিনব সাহিত্যিক রসসৃষ্টিতে পুনরুদ্ধার করিয়াছেন।

৪

বাংলা দেশের সেই যুগ-সংঙ্কটের কথা বলিয়াছি—বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যান, জ্ঞান ও প্রতিভার কথাও বলিয়াছি তাহা হইতে তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা বুঝিয়া এক্ষণে সেই সাহিত্যের প্রকৃতি ও অন্তর্গত ভাব-রূপ সম্বন্ধে কিছু বিশেষ আলোচনা করিব। জাতির সেই সঙ্কট-অবস্থাই তাঁহার প্রতিভাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল—ইহাতে কোন সংশয় নাই; পরে ধ্যান ও জ্ঞানের সঙ্গে প্রেম মিলিয়া সেই প্রতিভাকে রস-সৃষ্টির পথে প্রবর্ত্তিত করিল। তিনি আপনার কালে ও আপনার সমাজে, মানুষকেই যে বিশিষ্টরূপে চাক্ষুষ করিয়াছিলেন, সেই রূপ হইতেই—সেই বাস্তব হইতেই—তিনি মানুষের চিরন্তন ও সার্ব্বভৌমিক রূপটিকে কল্পনা করিয়াছিলেন; তাঁহার সেই মানবপূজার বিগ্রহ হইল—এই দুর্ব্বল, আত্মভ্রষ্ট, অধঃপতিত স্বজাতি। এই জাতির মধ্যেই তিনি মনুষ্য নিয়তির ঐতিহাসিক লীলা, মানুষের প্রকৃতিগত শক্তি ও অশক্তির বীজকে প্রত্যক্ষ করিবার যে দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার প্রতিভা। অতএব জাতির জীবনে যুগ-সঙ্কট; সেই সঙ্কটে মানব-প্রকৃতি ও মানব-ইতিহাসের অনুধ্যান; সেই অনুধ্যান হইতেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের ধারণা; সেই মনুষ্যত্ব-সাধনায় জাতির স্বধর্ম্ম-রক্ষার আবশ্যকতা-বোধ; এবং তজ্জন্য, স্বজাতিপ্রীতি হইতেই সাহিত্যের প্রেরণা-

লাভ ; বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্তগহনের এই ঘটনা-পরম্পরা স্মরণ রাখিয়া বঙ্কিম-সাহিত্যের শিল্পশালায় প্রবেশ করিতে হইবে।

যিনি উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টি করেন (নিছক রসসৃষ্টি নয়), তাঁহার সৃষ্টি-কল্পনা বাস্তব-সমস্যার সংঘাতে বাধা না পাইয়া বরং সঞ্জীবিত হইয়া থাকে ; অবশ্য, সে সমস্যা কবি কল্পনাকে বিদ্ধ করে মাত্র—তাহাকে গ্রাস করিয়া তাহার ধর্ম্মহানি করে না। সে সাহিত্য কেবল রস নামক চিত্ত-চমৎকারের বস্তু নয় ; তাহা আমাদের গভীরতম জাগ্রত-চৈতন্যকে স্পর্শ করে ; একাধারে আমাদের জাগ্রত ও মগ্ন-চৈতন্যের সকল আকুতি তাহাতে চরিতার্থ হয় ; সে সাহিত্যে আমরা আমাদের আত্মগত মনুষ্যত্বকেই পূর্ণভাবে উপলব্ধি করি। একজন আধুনিক ইংরেজ লেখক—যিনি গল্পে ও নাটকে অতিশয় আধুনিক ভাব ও ভাবুকতাকেই উৎকৃষ্ট রসরূপ দিতে পারিয়াছেন—তিনিও তাঁহার 'আত্ম-কথা'য় একস্থানে বলিতেছেন—"I am not speaking now of those who practise an art to teach ; they are propagandists and with them art is a side issue...The work created may be good or bad. That is a matter for the layman to decide. He forms his decision from the aesthetic value of the communication that is offered to him. If it yields escape from the reality of the world he will welcome it ; but is very likely at best to describe it only as a minor art ; if it enriches his soul and enlarges his personality he will rightly describe it as great."

"Enriches his soul and enlarges his personality"—আমিও ঠিক এই কথাই বলিতেছিলাম, উৎকৃষ্ট সাহিত্যের কাজ ইহাই। বঙ্কিম-সাহিত্যে আছে সেই মানুষের কাহিনী—যে মানুষ সমগ্র জীবন-রঙ্গভূমির নায়ক ; কেবল সমাজে ও সংসারে, অথবা ব্যক্তি-জীবনেই নয় (সাইকলজি নয়)—বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়াছেন, সকল আবরণ ভেদ করিয়া তাহার অন্তরতম রূপটিকে—যে-রূপ ব্যক্তির হইলেও বিরাটের সহিত বাঁধা, যে-রূপ দেহ ও আত্মার জটিল যোগবন্ধনে—মহাকালের অট্টহাস্যে সমুজ্জ্বল। এই যে দেখা, ইহার মূলে আছে—বাস্তব জীবন-দর্শন, এবং সেই জীবনের সকল সমস্যার মূল-সমস্যাকে স্থিরদৃষ্টিতে ভেদ করিবার শক্তি ও সাহস। অতএব ইহাতে এক দিকে যেমন জীবনের রস-রূপ, তেমনই আর এক দিকে তাহার তত্ত্বরূপ—দুই-ই সমভাবে উদ্ভাসিত হইবার কথা। কিন্তু তথাপি এই পূর্ণদৃষ্টির ফলে সেই তত্ত্বও জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে না—একই মূল রহস্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া দেখা দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-কাব্যে—নীতি বা তত্ত্ব, জাতীয়তাবাদ বা অধ্যাত্ম-চিন্তা—যাহাই আসিয়া পড়ুক, কিছুই বাহির হইতে আরোপিত নয় ; তিনি কোনও নীতিবাদ বা অধ্যাত্ম-তত্ত্বকে আগে মানাইয়া লইয়া, পরে তাহারই শাসনে জীবনকে শাসিত হইতে দেখেন নাই, তিনি এমন কোন ধর্ম্ম—কোন নীতিকেই প্রশ্রয় দেন নাই যাহা মানুষের প্রকৃতি বা জীবন-ধর্ম্মের বিরোধী। মানুষের মনুষ্যত্ব সন্ধান করিতে গিয়া মনুষ্য-প্রকৃতির

তলদেশে তিনি সৃষ্টিরই যে নিয়তি-নিয়মকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাকে—তর্ক-সিদ্ধান্তের মত নয়—আবিষ্কারের মত, তিনি তাঁহার রচিত মানবজীবন-কাহিনীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সে সাহিত্যে যে রূপসৃষ্টি আছে, তাহা মানুষের এই মনুষ্যত্বের রূপ ; তাহার রস কেবল আর্টের রস নয়—মানুষের একটি বিশেষ বৃত্তির চরিতার্থতাই তাহার ফলশ্রুতি নয়। এ রস আস্বাদন করিতে হইলে যে 'বাসনা'র প্রয়োজন, তাহা সকল বাসনার মূল—অতি সহজ, সুস্থ ও সুগভীর মনুষ্যত্ব-চেতনা। অতএব সাহিত্যের রস-ভূমি যেমনই প্রশস্ত তেমনই গভীর ; এবং সেই প্রেরণা ইহার যেখানে যতখানি সফল হইয়াছে, সেইখানে সাহিত্যিক সৃষ্টি-হিসাবে তাহা অনবদ্য।

আবার হিন্দু-আদর্শ বা জাতীয়তা-মন্ত্র এই সাহিত্যের রসহানি না করিয়া, রসসৃষ্টিরই সহায়তা করিয়াছে। কাব্যে বা সৃষ্টিতে নির্বিশেষের স্থান নাই—যাহা নির্বিশেষ তাহাই একটা বিশেষের রূপে রসবৎ হইয়া উঠে। বিশেষের মধ্যেই নির্বিশেষের যে আভাস—তাহাই তো রস-হেতু। এই বিশেষের বিশেষত্ব কবিকল্পনায় যেমন সুস্পষ্টরূপে ধরা দেয়, তেমন আর কোথাও নয় ; এবং রসের রহস্যই এই যে, এই বিশেষ আমাদের চেতনায় যত তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট হইয়া উঠে, ততই—আমাদের অজ্ঞাতসারেই যেন—অন্তরে সেই এক নির্বিশেষের সংবেদনা জাগে। অতএব বঙ্কিম-সাহিত্যে মানুষের যে বিশেষ রূপ—একটি বিশেষ জাতি ও সমাজের বিশিষ্ট ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির বেষ্টনীবন্ধনে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা যদি সুকল্পিত হইয়া থাকে, তবে সেই নির্বিশেষ মনুষ্যত্বের সংবেদনা তাহা হইতেই জাগিবে। এজন্য তাঁহার কবি-সংস্কার অতিশয় অভ্রান্ত বলিতে হইবে। তিনি যে মনুষ্যত্বের একটা ভাব-তত্ত্বকেই আশ্রয় করেন নাই—কালধারায়, জীবনেরই কঠিন শিলাতটে প্রহত ও আবর্ত্তিত হইয়া, দেশ ও জাতির বিশিষ্ট মাটি ও জল-হাওয়ায় যে জীবন বিকশিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি যে তাহারই স্বরূপ অতি গভীর করিয়া পরম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহা তাঁহার প্রজ্ঞা বা কবিদৃষ্টির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এইরূপ স্বজাতি বা স্বধর্ম্ম-প্রীতি—দার্শনিক, বা ভাবুক তত্ত্ববাদীর পক্ষে, অথবা নির্বিশেষের রস-রসিক ভাবপন্থী কবি, আর্ট-সর্ব্বস্ব শিল্পীর পক্ষে নিষ্প্রয়োজন, এমন কি, মিথ্যা ও তুচ্ছ হইতে পারে ; কিন্তু সৃষ্টিধর্ম্মী কবি-প্রতিভার পক্ষে ইহাই যে অতিশয় সত্যকার প্রেরণা, বঙ্কিম-সাহিত্য তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। আসলে, ইহা কোনরূপ ক্ষুদ্র সংকীর্ণ হৃদয়-বৃত্তি নয়, তাহার প্রমাণ, বঙ্কিম-সাহিত্যের কোথাও পরধর্ম্মবিদ্বেষ নাই—অধর্ম্ম ও অ-মনুষ্যত্বের প্রতিই জ্বালাময় আক্রোশ আছে ; অত্যাচার, অনাচার ও মিথ্যাচার—অর্থাৎ, মনুষ্য-ধর্ম্মের গ্লানির উপরেই কশাঘাত আছে, অপর কোন ধর্ম্মনীতি বা সংস্কৃতির অবমাননা তাহাতে নাই। তাহা যদি থাকিত, তবে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাধন-মন্ত্রই মিথ্যা হইত ; কারণ মানুষের পূজা, মনুষ্যত্বের আদর্শ-সন্ধানই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার মূল-মন্ত্র ছিল। স্বজাতি-প্রেম ও স্বধর্ম্মের গৌরব-বোধেও তিনি সেই মনুষ্যত্বের আদর্শই সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়াছিলেন ; তাঁহার সেই সাধনার পথেও তিনি মানব-প্রীতিকেই মানুষের

শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং তাহা প্রচার করিতে ক্লান্তি-বোধ করেন নাই। এই মানব-প্রীতি ও মনুষ্যত্বের আদর্শ-সন্ধানের সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বজাতি ও স্বধর্ম্মপ্রীতির মূল মর্ম্ম, বুঝিয়া লইতে হইবে। সুস্থ ও সবল মানুষের প্রাণ, এবং সত্যপিপাসু মন লইয়া বঙ্কিম-সাহিত্য পাঠ করিলে, তাঁহার হিন্দুত্ব-প্রীতি ও স্বাজাত্যবোধ দূষণীয় হওয়া দূরে থাক, তাহাই তাঁহার মনুষ্যোচিত প্রাণ-ধর্ম্ম এবং কবিজনোচিত সত্যদৃষ্টি গৌরব বলিয়া বিবেচিত হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের যে প্রতিভা, তাহার পক্ষে উহাই সত্য ও স্বাভাবিক—অপর জাতি বা অপর সম্প্রদায়ের ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইবার কিছুই নাই ; বরং তাহাদের মধ্যেও যদি এমন প্রতিভার উদয় হয়, তবে তাহারাও ধন্য হইবে—মানুষের মনুষ্যত্বসাধনার সেই একই আদর্শ, আর এক পন্থায়, সেই একই সত্যের জয় ঘোষণা করিবেন।

তথাপি, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-প্রেরণা এই জাতীয়তাবোধ বা হিন্দুত্ব-গৌরবের দ্বারা ক্ষুণ্ণ না হইবার অন্য কারণও আছে ; সেই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের কবিদৃষ্টি আরও সত্য, আরও মহৎ। তাঁহার হিন্দুত্ব-প্রীতি কেবল নিজের হিন্দু-বংশে জন্ম বলিয়াই নহে, তাহার মূলে ছিল মনুষ্যত্বের সর্ব্বোচ্চ আদর্শের সহিত সাক্ষাৎকার। বঙ্কিমচন্দ্র সেকালের ইংরেজীশিক্ষিত মনীষিদের অন্যতম ; ইংরেজী শিক্ষার যাহা শ্রেষ্ঠ ফল—সেই বৈজ্ঞানিক বিচারদৃষ্টি, অপক্ষপাত ঐতিহাসিক বুদ্ধি, এবং বিজাতির ভিন্নতর আদর্শ দিয়া স্বজাতির সাধনা ও সংস্কৃতিকে যাচাই করিয়া লইবার শক্তি তাঁহার মধ্যেও পূর্ণমাত্রায় ফলিয়াছিল। সেই সঙ্গে যদি প্রেম না থাকিত—যদি অ'ঃপতিত এই জাতির প্রতি তিনি মমত্বহীন হইতেন, কেবল জ্ঞান ও ভাবের সত্য লইয়াই তিনি তৃপ্ত থাকিতেন ; তাহা হইলেই তিনি হয়তো সে কালের কোন এক সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব করিতেন, অথবা সমাজের সহিত বাহিরের সম্পর্ক রাখিয়াও ভিতরে তিনি একজন ঘোর নাস্তিক হইয়া উঠিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের যে ধর্ম্মমত তাঁহার যাবতীয় রচনার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে, তাহাতেও—'ধর্ম্মতত্ত্ব', এবং 'কৃষ্ণচরিত্র' হইতে 'দেবীচৌধুরাণী' 'সীতারাম' পর্য্যন্ত—সর্ব্বত্র সদাজাগ্রত জ্ঞানবৃত্তি ও কঠিন যুক্তিনিষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। তাঁহার সেই হিন্দুত্ব-প্রীতি হিন্দু-প্রীতিই নয় ; অপরাপর ভূখণ্ডে অন্যান্য জাতি মানুষের সাধনাকে কতখানি পুষ্ট করিয়াছে—সে সাধনা কেবল যুগ বা জাতির প্রয়োজন নয়—সর্ব্বকালের সর্ব্বমানুষের গভীরতম সত্তাকে পরম সিদ্ধিলাভের আশ্বাসে কতখানি আশ্বস্ত করিয়াছে—তাহাই তিনি প্রথমে মুক্ত-মন লইয়া অনুসন্ধান করিয়াছিলেন ; এবং পরে ঘরে ফিরিয়া, বহুশতাব্দীর আবর্জ্জনা-স্তর সরাইয়া তিনি যাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সেই জিজ্ঞাসা-পরায়ণ অবিশ্বাসী মনও মানুষের মনুষ্যত্ব-মহিমাসম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর, তিনি "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলিয়া বিশ্বজনকে না ডাকিয়া নিজের জাতিকেই ডাকিয়াছিলেন ; তাহার কারণ তিনি কেবল ঋষি ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্রষ্টা কবি। জাতির সেই যুগ-সঙ্কটে এই কবিকেই প্রয়োজন ছিল—যিনি মানুষের ধর্ম্মকেই একটি বিশিষ্ট জাতির

জীবনে একটা বিশেষ রূপে রূপময় করিয়া তুলিবেন। ইহারই প্রেরণায় বঙ্কিম-সাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল; কোন সাহিত্যের জন্মলগ্ন ও জাতকর্ম্মবিধি ইহার অধিক শুভ হইতে পারে না। সকল বড় সাহিত্যের জন্ম এমন করিয়াই হয়; সমগ্র জাতির প্রাণমূলে যে নূতন বেদনা অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হয়, তাহাই একাগ্র ও ঘনীভূত হইয়া প্রকাশের জন্য ব্যক্তিপ্রতিভা আশ্রয় করে—সে প্রতিভা সেই জাতিরই অন্তরমথিত শক্তি। বঙ্কিমচন্দ্রে সেই শক্তিরই বিকাশ হইয়াছিল। য়ুরোপীয় শিক্ষার প্রবল প্রভাব বাঙালীর চিত্ত অভিভূত করিয়াছিল; তাহা কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাব নয়—তাহা মুখ্যত সাহিত্যিক প্রভাব; অর্থাৎ, তাহা সেই শিক্ষার অন্তর্গত মনুষ্যত্বের এক জীবন্ত ও উচ্চতর আদর্শের প্রভাব। কিন্তু তাহাও মনুষ্যত্বের পূর্ণতম আদর্শ নয়, অধিকন্তু তাহার সহিত পরজাতির পরধর্ম্মের সংস্কৃতিও জড়িত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্রভাবকে আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে জাতির জন্য সাহিত্যই সৃষ্টি করিলেন—সে সাহিত্যে য়ুরোপীয় সাহিত্যরসকেই একটি বিশিষ্ট চেতনার পাত্রে ঢালিয়া নূতন রূপে সৃষ্টি করিলেন। সে সাহিত্যে পূর্ণ-মনুষ্যত্বের আদর্শই নানা ছন্দে, নানা ভাবে, নানা চিন্তায় বর্ণিত, কীর্ত্তিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এজন্য বঙ্কিম-সাহিত্য বলিতে বঙ্কিমের সমগ্র রচনাবলীই বুঝিতে হইবে। তথাপি, তাঁহার উপন্যাসগুলিতেই সৃষ্টিশক্তির পরাকাষ্ঠা ঘটিয়াছে, এবং তাঁহাদের মধ্যেই কবিদৃষ্টির বিকাশধারা—তাঁহার সাহিত্য প্রেরণার মূল হইতে তাহার উচ্চতম শাখা পর্য্যন্ত একটি সোপানপরম্পরা—অতিশয় সুস্পষ্ট হইয়া আছে। এজন্য বঙ্কিম-প্রতিভার পরিচয়-কল্পে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

ভাদ্র, ১৩৪৮

কপালকুণ্ডলা

১

'কপালকুণ্ডলা' বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস, ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হয়—তখন তাঁহার বয়স ২৭ বৎসর। প্রথমে উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছিল; ঐ উপন্যাস বিলাতী রোমান্সের আদর্শে রচিত হইলেও, ভাবে ভঙ্গিতে ও ভাষায় উহা খাঁটি দেশীয় পাত্রে এক নূতন রস পরিবেষণ করিয়াছিল। উহার ঐতিহাসিক আবহাওয়া-যুক্ত কাহিনী, নারী ও পুরুষ-চরিত্রের পৃথক মহত্ত্ব, আদর্শ-চরিত্র-সৃষ্টিতে স্বভাবের অনুবর্ত্তিতা, এবং অতি গভীর গুরু-গম্ভীর কাব্যরসের সহিত হাস্যরস—প্রভৃতির জন্য এক অভিনব গদ্য কাব্যের কবি-রূপে বঙ্কিমচন্দ্র সহসা খ্যাতিলাভ করিলেন; পরবর্ত্তী উপন্যাসগুলিতে তাঁহার সেই খ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

কিন্তু এই দ্বিতীয় উপন্যাসের ভাব-জগৎ আরও বিশেষ অর্থে রোমাণ্টিক, বা মুক্ত-স্বাধীন কবিকল্পনার বিশিষ্ট রসে সমুজ্জ্বল। এখানে তিনি নরনারীর সাধারণ ভাগ্য বা চরিত্রকেই উচ্চ কল্পনায় মণ্ডিত করিয়া একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী রচনা করিতেছেন না, ইহার ভাব-বস্তু উপন্যাসের প্রয়োজনকেও ছাড়াইয়া গভীরতর রসসৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছে। যে বিরাট প্রাকৃতিক শক্তি মানুষের জীবনকে অলক্ষ্যে বেষ্টন করিয়া তাহার শুভাশুভ নির্দ্ধারণ করিতেছে, তাহারই রহস্যগম্ভীর মহিমা, ভাষার অত্যধিক গাম্ভীর্য্যে এবং ভাবের ততোধিক লিরিক মূর্চ্ছনায়, ইহাকে হিক্র-কাব্যের রস-সাদৃশ্য দান করিয়াছে। এইজন্য 'কপালকুণ্ডলা' বঙ্কিমচন্দ্রের অপর সকল উপন্যাস হইতে স্বতন্ত্র। এইজন্যই, 'কপালকুণ্ডলা'র সমালোচনায় এক-জন পূর্ব্বসূরি, প্রতিভাবান কবি ও সমালোচক, এমন অপূর্ব্ব মন্তব্য করিয়াছিলেন—

> "কপালকুণ্ডলা প্রতিভার আনন্দ-স্ফূর্তি। কবি আপনাকে চিনিয়াছেন, আপন হৃদয়ের প্রতিভা-মূর্ত্তির পরিচয় পাইয়াছেন, কিন্তু সে তখনও বন্য, অসামাজিক সামুদ্রিক।...নবীনচন্দ্রের যেমন 'পলাশীর যুদ্ধ', তেমনই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'—উভয়ের কোন অর্থ নাই purpose নাই। তবু সুন্দর, অদৃষ্টপূর্ব, একক সৌন্দর্য্য! কপালকুণ্ডলা tale নহে, উপন্যাস নহে, উহা গদ্যরীতির কাব্যনাটক, গ্রীক নাটক।" (শশাঙ্কমোহন সেন)

—অর্থাৎ, 'কপালকুণ্ডলা'র নিজস্ব বৈশিষ্ট্য—কবি তাহাকে যে রূপ দিয়াছিলেন তাহার সেই রূপ—পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়াছে, ইহাই তাহার দোষের কারণ! অতএব, ইহা যে একখানি উচ্চাঙ্গের কাব্য, লেখক প্রকারান্তরে তাহাই স্বীকার করিয়াছেন; তিনি তাহার রূপ-রসে মুগ্ধ হইয়াও, অতিমাত্রায় তত্ত্বপিপাসু ও অর্থসন্ধানী বলিয়া, 'পলাশীর যুদ্ধ' ও 'কপালকুণ্ডলা'কে (তাহাদের কল্পনার রোমাণ্টিক প্রবৃত্তির জন্য) শ্রদ্ধা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন। শেক্স্পীয়ারের অমর নাটকগুলিকেও সমসাময়িক বিদ্বজ্জন, এবং পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ সাহিত্যিক সমাজও এই চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু লেখক

স্পষ্টই নিন্দাচ্ছলে স্তুতি করিয়াছেন—'কপালকুণ্ডলা'র সৌন্দর্য্যে তিনি মুগ্ধ ও বিস্মিত, কিন্তু তাহার মূলে তিনি কোন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারেন নাই বলিয়া, তাহার প্রতি বিমুখ হইয়াছেন—আর কোন কারণে নহে। তথাপি সমালোচকের ঐ শেষ মন্তব্যটি অতিশয় যথার্থ ও মূল্যবান—এমন উক্তি সেকালের কোন সমালোচক করিতে পারিতেন না। আমি এই মন্তব্যগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার কারণ, আমার আলোচনায় ঐ মন্তব্য-নিহিত প্রশ্নগুলির মীমাংসা—উক্তির প্রতিবাদ ও সমর্থন, দুইই পাওয়া যাইবে।

"কপালকুণ্ডলা tale নহে, উপন্যাস নহে, উহা গদ্যরীতির কাব্য-নাটক, গ্রীক নাটক"—এই উক্তি অধিকাংশে সত্য। ইহাতে আখ্যান-রচনার কৃতিত্ব আছে—খাঁটি উপন্যাসের নৈপুণ্য নাই; চরিত্রসৃষ্টিতে উৎকৃষ্ট রোমাণ্টিক কল্পনা আছে; ঘটনা-সংস্থান নাটকীয় লক্ষণযুক্ত। নাটকীয় লক্ষণ ইহার গঠনেও পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রথমতঃ, ইহার কলেবর অতিশয় ক্ষুদ্র; দ্বিতীয়তঃ ইহাকে স্পষ্ট চারিটি অঙ্কের মত চারিটি খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে (এই রীতি বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসেও লক্ষণীয়), পরিচ্ছেদগুলি যেন এক একটি গর্ভাঙ্ক। কাহিনী-সংক্ষেপের দ্বারা ইহাতে ঘটনার দ্রুতগতি রক্ষা করা হইয়াছে, এমন কি, পরিচ্ছেদগুলির নামেও সেই দ্রুত পট-পরিবর্ত্তনের ইঙ্গিত আছে—সবগুলিতেই অধিকরণের সপ্তমী-বিভক্তি যুক্ত করা হইয়াছে, যথা—"সাগরসঙ্গমে" "স্তূপশিখরে", "পান্থ-নিবাসে" ইত্যাদি। নাটক-হিসাবে ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে গ্রীক নাটকের মত (যথা, এস্কাইলাসের) ঘটনা-কাহিনী (plot action) অপেক্ষা ঘটনা-সংস্থানের (situation) চমকই অধিক—একটা বজ্রবিদ্যুৎগর্ভ ভাবমণ্ডল ও তাহারই ক্রমান্বয় বিস্ফুরণ; শেষে নিজেরই অনিবার্য্য বেগে একটা বিষম পরিণামে তাহার শান্তি বা সমাপ্তি-লাভ। ইহার আখ্যান-বস্তু সামান্য, ঐ নাটকীয় রচনা-ভঙ্গি সেই সামান্যকে অতিশয়িত করিয়াছে। অতএব, উপন্যাস হইলেও এই রচনা একটি সম্পূর্ণ নূতন ছাঁদের গদ্যকাব্যই বটে।

উহার ওই কাহিনীর অন্তরালে একটি বিশেষ ভাব-বস্তু আছে, সেই ভাব-বস্তুই উহার কাব্য-প্রেরণা হইয়াছে, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে সেই ভাব-বস্তু কি, তাহারই একটু সবিস্তার আলোচনা করিব। উপন্যাস পাঠ করিয়া একটা যে তত্ত্ব সকলেরই বোধগম্য হইবে তাহা এই যে, উহাতে মানুষের উপরে প্রকৃতি ও সমাজ এই দুইয়ের বিপরীত প্রভাব বিশেষ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে; কপালকুণ্ডলা আর কিছু নয়, একান্তভাবে প্রকৃতিপালিত এক মানব-কন্যা—সমুদ্র, আকাশ ও নির্জ্জন বনভূমির যে উদার উদাস প্রকৃতি, সে যেন তাহারই একটি সাকার বিগ্রহ। এই আরণ্য লতাটির মূলোৎপাটন করিয়া তাহাকে সমাজের উদ্যানে, গৃহবাটিকার প্রাঙ্গণতলে রোপণ করার ফলে একটা বিষম অনর্থ ঘটিয়াছে। এটুকু বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু ঐ ভাববস্তুর মূল আরও গভীর; উহার সহিত বহু তত্ত্ব জড়িত আছে—এই উপন্যাসে সেই তত্ত্বই একটি বিচিত্র রস-রূপ ধারণ করিয়াছে।

কথিত আছে, এই উপন্যাস-রচনার পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র আপনার মনে মনে একটি প্রশ্নের সমাধান চিন্তা করিতেছিলেন। সে প্রশ্ন এই। মনুষ্যসমাজ হইতে দূরে, প্রকৃতির নিঃসঙ্গ প্রতিবেশের মধ্যে, একটি মানব-দুহিতা যদি আবাল্য জীবন যাপন করে, তবে তাহার স্বভাব বা চরিত্র কিরূপ হওয়া সম্ভব? এই প্রশ্নের মূলে রহিয়াছে য়ুরোপীয় ভাব-চিন্তার প্রভাব। নব্য ইংরেজী-শিক্ষায় শিক্ষিত, যুবক বঙ্কিমের প্রাণ তখন য়ুরোপীয় কাব্যরসে টলমল করিতেছে; একদিকে তথাকার রিনেস্যান্স (Renaissance), ফরাসী বিপ্লব প্রভৃতির ভাবধারা, অপর-দিকে উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যে রোমাণ্টিক ভাববিপ্লব (Romantic Revolt), ও তাহার অন্তর্নিহিত প্রকৃতিবাদ (Nature-cult, Return to Nature) তাঁহাকে উৎকণ্ঠিত করিয়াছে। এই প্রশ্নও যে ইংরেজ-কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের (Wordsworth) নব-প্রকৃতিবাদ হইতেই সাক্ষাৎভাবে তাঁহার চিত্তে সংক্রামিত হইয়াছিল, এ অনুমান অসঙ্গত নহে, যদিও তদপেক্ষা মৌলিক তত্ত্বচিন্তার সহিত তাঁহার পরিচয় থাকাও সম্ভব। কিন্তু সেইকালে কাপালিক-সম্প্রদায়ের এক বামাচারী তান্ত্রিকের সহিত নাকি তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল—হওয়াটাও যেমন বিচিত্র নয়, তেমনই, ঐ একটি ঘটনাই দৈবের মত তাঁহার চিন্তা ও ভাবধারাকে এমন পথে প্রবর্ত্তিত করিল যে, য়ুরোপীয় প্রকৃতিবাদ অতিক্রম করিয়া তাহা হিন্দুচিন্তার অগম-গহনে, যেন অজ্ঞাতসারেই প্রবেশ করিল—সেই প্রকৃতিরও অন্তরালে এক বিরাট দুর্জ্ঞেয় শক্তির আভাস পাইল। তথাপি, য়ুরোপীয় কাব্য ও নব্য ভাব-চিন্তার সেই রোমাণ্টিক প্রকৃতি-প্রেম এ কাব্যের একটি প্রধান প্রেরণা হইয়াছে—ইহার কাব্যরসের প্রধান উপাদান হইয়াছে সেই প্রকৃতি প্রেমের রূপ-বিহ্বলতা। কিন্তু এই কাব্যের অন্তরঙ্গরূপে যে প্রাকৃতিক শক্তির ভাবনা আছে তাহা সেই রূপ-রসের প্রকৃতি নয়—সকল রস, সকল হৃদয়-সংবেদনাকে স্তম্ভিত ও তুচ্ছ করিয়া, সেই প্রকৃতিরও অন্তরালে একটা বিরাট সত্তা—একরূপ *Natura Naturans*, একটা মূলা-প্রকৃতি—দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সেই প্রকৃতিকে—ভারতীয় তন্ত্র বা শক্তিসাধনার সেই তত্ত্বকে—বঙ্কিমচন্দ্র যেন অজ্ঞানে, গূঢ়তর কবিপ্রেরণা ও প্রচ্ছন্ন হিন্দুসংস্কারের বশে—একটা ভাববস্তু-রূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ঐ কাপালিক অতিশয় গৌণ ও তির্য্যকভাবে তাঁহার মনে সেই তত্ত্বটির আভাস দিয়া থাকিবে। তাই কপালকুণ্ডলা-চরিত্রের একাংশে প্রকৃতিপ্রভাবের সেই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থীয় লক্ষণ থাকিলেও, একটি বিপরীত লক্ষণই সমধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সে ঐ অপর প্রকৃতির প্রভাব; সে প্রকৃতি বাহ্যপ্রকৃতির একটি কল্পিত আদর্শ-রূপ নয়, সে প্রকৃতি মনুষ্যজীবনেরই একটা উদারতার পটভূমিকা নয়—মনুষ্যহৃদয়ের সহিত তাহার কোন প্রত্যক্ষ সহযোগিতা নাই। ইহার সহিত তন্ত্র-তত্ত্বের সাদৃশ্য আছে; কিন্তু ইহা খাঁটি তন্ত্রতত্ত্বও নহে, সেই তন্ত্রতত্ত্বের একটা ভাবময় অনুবেদন মাত্র ইহাতে আছে। বঙ্কিমচন্দ্র, সম্ভবতঃ—এ সময়ে ত' নহেই, পরেও—তন্ত্রের আলোচনা বিশেষভাবে করেন নাই, বরং সজ্ঞানে, সেকালের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত, তিনিও তন্ত্রের

প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতেন, ঐ কাপালিক-চরিত্রই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অতএব বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, মনের সেই প্রশ্নই তাঁহাকে সজ্ঞানে এই কাব্যরচনায় প্রেরিত করিলেও, কাব্যসৃষ্টিকালে তিনি অন্যবিধ ভাবনার বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি-প্রেম—সেই অতি-গভীর রোমাণ্টিক প্রবৃত্তি—এই কাব্যে যতই উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকুক, সেই প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হইয়া তিনি যেমনই একটু ভিতরে দৃষ্টি করিলেন, অমনি এমন একটা তত্ত্বের সম্মুখীন হইলেন, যাহার তুলনায় আর সকলই তুচ্ছ হইয়া যায়,—মানুষের জীবন, তাহার কামনা-বাসনা, তাহার যত কিছু আত্মাভিমান, সকলই নিরর্থক ও হাস্যকর হইয়া পড়ে। সেই তত্ত্বই একটা ভাববস্তুর আকারে এই উপন্যাসের আদি-প্রেরণা হইয়াছে, তাহাকে বুঝিতে হইলে ঐ কপালকুণ্ডলা-চরিত্রটিকে সর্ব্বাগ্রে বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক।

যে ভাববস্তু এই উপন্যাসের মেরুদণ্ডস্বরূপ—তাহার নিম্নপ্রান্তে আছে ঐ কাপালিক, কিন্তু আর সকলকে গৌণ করিয়া তাহার ঊর্দ্ধপ্রান্তে বিরাজ করিতেছে এই উপন্যাসের প্রধানা নায়িকা—কপালকুণ্ডলা। নরনারী-চরিত্রে প্রকৃতি-প্রভাবের যে মনস্তত্ত্বঘটিত মতবাদ বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাকে প্ররোচিত করিয়াছিল, তাহা ঐ কপালকুণ্ডলা-চরিত্রে ব্যর্থ হইয়াছে। এই চরিত্রসৃষ্টিকালে বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয় শেক্‌স্‌পীয়ারের মিরাণ্ডা-(Miranda)-চরিত্র স্মরণ করিয়াছিলেন। সেখানেও এক নির্জ্জন দ্বীপে পিতামাত্র-সহচর হইয়া এক নারীশিশু বর্দ্ধিত হইয়াছে ; তাহারও কোন সাক্ষাৎ সমাজ-সম্পর্ক নাই ; একদিকে মুক্ত-প্রকৃতির প্রভাব, অপরদিকে তাহার ঐ স্নেহময় পিতার সঙ্গ—এবং সম্ভবতঃ রক্তের আভিজাত্যগুণে, মিরাণ্ডা-চরিত্র যেরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছে, সহজ বুদ্ধিতে তাহাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। সেখানে প্রকৃতি-প্রভাবই অধিক বটে, তথাপি ঐ পিতার চরিত্রের প্রভাবও আছে, সে চরিত্রে সুকর্ষিত সামাজিক সংস্কারও বিদ্যমান। অতএব, মিরাণ্ডা, ঐ পিতার সংসর্গে, তাহার অজ্ঞাতসারে, মানবীয় শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কার কতকপরিমাণে আত্মসাৎ করিয়াছে। তাহার পিতার মন্ত্রতন্ত্র-সাধনা ও ভূতপ্রেতের উপর আধিপত্য, তাহাকে একটা অতিপ্রাকৃত শক্তির বিষয়ে সচেতন ও অভ্যস্ত করিলেও, পিতার স্নেহ ও সহৃদয়তা সে সকলের প্রভাব হইতে তাহাকে মুক্ত রাখিয়াছে। অতএব যে নিয়মে মিরাণ্ডার প্রকৃতি ঐরূপ হইয়াছে, সেই নিয়মেই কপালকুণ্ডলা-চরিত্র কিরূপ হওয়া সঙ্গত ? প্রকৃতির প্রভাব যদি দুইয়ের পক্ষে সমানও হয়, প্রস্পেরো (Prospero) ও কাপালিকের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ ; কপালকুণ্ডলার রক্তেও কোন বিশেষ বংশগত প্রভাবের অবকাশ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নায়িকাকে আরও মুক্ত ও অনাবৃতভাবে প্রকৃতির মুখে স্থাপন করিয়াছেন, এবং সমাজকে আরও বেশি করিয়া দূরে রাখিবার জন্য একটি অতিশয় অসামাজিক, এমন কি, সাধারণ মনুষ্যস্বভাবের বিরুদ্ধাচারী, ঐ কাপালিকের সংসর্গে তাহাকে নিক্ষেপ করিয়াছেন। প্রকৃতি-প্রভাব এবং ঐ সংসর্গ, এই দুইয়ের মিলিত ফল, ঐ প্রকৃতিবাদের নিয়মে কি রূপ হইতে

পারে ? কাপালিকের সেই অতি নিষ্ঠুর আত্মসাধনা ও পৈশাচিক ক্রিয়াকলাপের সহিত আশৈশব পরিচয়ের ফলে কপালকুণ্ডলার চরিত্র তিনটি বিভিন্ন মুখে বিকাশ পাইতে পারিত ; (১) সেও সেইরূপ নিষ্ঠুর হইয়া উঠিত ; (২) সেই নিষ্ঠুরতার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ তাহার চিত্ত অতিশয় স্নেহ-কোমল, প্রেমপ্রবণ হইতে পারিত ; (৩) তাহার হৃদয় অসাড় হইয়া যাইত, কোন বৃত্তিরই স্ফুরণ হইত না। ইহার কোনটাই হয় নাই। দুর্ব্বল হইলে তাহা অসাড় হইত সন্দেহ নাই ; কিন্তু কবি এই নারীচরিত্রকে অতিশয় সুস্থ ও সবলরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা উদাসীন হইলেও নিষ্ঠুর নহে, বরং অপূর্ব্ব করুণাময়ী। ইহাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের কবিদৃষ্টির প্রসার ও গভীরতা লক্ষ্য করিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। গভীরতর দৃষ্টির প্রমাণ এই যে, তিনি কাপালিকের ঐ প্রভাবের উপরে তাহার নারী-প্রকৃতিকে জয়ী করিয়াছেন,—নারীর প্রকৃতিগত মহত্ত্বকে তান্ত্রিকের মতই স্বীকার করিয়াছেন। যে নির্ম্মমতা কেবল ঔদাসীন্যই নয়, যাহা আত্মত্যাগের অসীম শক্তি এবং সর্ব্ব-স্বার্থশূন্যতার অপার করুণাও বটে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে, পুরুষ অপেক্ষা নারী-সুলভ বলিয়াই ধারণা করিয়াছেন, এবং সেই শক্তিকেই তিনি কপালকুণ্ডলা-চরিত্রে মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিয়াছেন। কেবল সাগরের সীমাহীন তরঙ্গবিস্তার, আকাশ, অরণ্য ও নির্জ্জন বনভূমির মন্ত্রগুঞ্জরণই যথেষ্ট নয়—প্রকৃতির সেই প্রভাবও নানা কারণে মানবহৃদয়ের পক্ষে ব্যর্থ বিকৃত হইতে পারে ; কেবল নারীই তাহার একটি বিশিষ্ট শক্তির বলে সেই প্রভাবকে হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া তাহাকে আত্মসাৎ করিতে সক্ষম। কপালকুণ্ডলা নারী বলিয়াই, সে নিজে সেই মহাশক্তির প্রতীক ; এইজন্য সে প্রকৃতির গভীরতর প্রভাবকেই স্বীকার করিয়া, ঐ কাপালিকের প্রভাবকে জয় করিয়াছে। এই যে চরিত্র-বিকাশ ইহা বিজ্ঞান বা মনস্তত্ত্ব, বা তাহারই অনুরূপ কোন প্রকৃতিবাদের নিয়মানুমোদিত নয়। এ চরিত্র moral নয়, un-moral ; psychological নয়—mystical, spiritual। য়ুরোপীয় কাব্যে এইরূপ চরিত্রসৃষ্টি সম্ভব নয়—সেখানকার প্রকৃতি প্রেরণাই অনুরূপ।

নারী-রূপা ওই শক্তি বা প্রকৃতি সেই একই শক্তি—যাহাকে জয় করিয়া, আত্মবশ করিয়া, মূর্খ কাপালিক শক্তিমান হইতে চায়। এই কাপালিক-চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্র নিজ প্রয়োজনমত গড়িয়া লইয়াছেন, তিনি সে চরিত্রের ভিতরে প্রবেশ করিয়া, কবিকল্পনাসুলভ সহানুভূতিযোগে, তাহার অন্তরবাসী মানুষটাকে আবিষ্কার করেন নাই ; শাইলকের (Shylock) প্রতি শেক্স্‌পীয়ারের যেটুকু সহানুভূতি আছে এই কাপালিকের প্রতি কবির সেটুকু পক্ষপাতও নাই ; তার কারণ, তাহাকে তাঁহার পৃথক প্রয়োজন নাই, সে এই কাহিনীর একটা machinery বা অতিরিক্ত অথচ প্রয়োজনীয় অঙ্গ—সে ইহার ঘটনাধারাকে ধাক্কা দিবার বা সচল রাখিবার একটা উপায় মাত্র। আরও কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র তন্ত্রতত্ত্ব বা তান্ত্রিক সাধনার প্রতি আদৌ শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন না, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তথাপি শুধু কাহিনী বা ঘটনার প্রয়োজনই নয়, এই কাপালিক চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের

সেই মূল ভাবকল্পনারও পুষ্টিসাধন করিয়াছে—কপালকুণ্ডলা-চরিত্রের উপরে তাহার গৌণ প্রভাব নানাদিক দিয়া সেই চরিত্রকে স্ফুটতর করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে একটা নিষ্ঠুর নির্ম্মমতার মূর্ত্তিরূপেই চিত্রিত করিয়াছেন বটে, তথাপি, প্রথম দিকে তাহার সেই নির্ম্মমতার মধ্যেও এমন একটা আত্মস্থতা ও দৃঢ়তার আভাস আছে যে, বিতৃষ্ণা-সত্ত্বেও আমরা কেমন যেন একটু আকৃষ্ট হই, ভয়ের মধ্যেও একটু শ্রদ্ধা অনুভব করি--শক্তিমানের প্রতি দুর্ব্বল যেমন করে। কিন্তু পরে তাহার সেটুকু মহিমাও আর রহিল না, অতিশয় সাধারণ স্বার্থপর মানুষের মতই তাহার মধ্যে একটা দুর্ব্বল, অসহায়, লোলুপ মূর্ত্তি দেখা দিল—হৃত-সম্পত্তি-পুনরুদ্ধারের জন্য সে অতি হীন উপায় অবলম্বন করিতেছে। ইহাতে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র ঐরূপ ব্যক্তির ঐরূপ সাধনার ঐরূপ পরিণামই যথার্থ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু খাঁটি তান্ত্রিক সাধকের চরিত্র ঐরূপ নহে ; সে চরিত্র আমাদের চক্ষে যতই ভ্রান্ত বা দুর্নীতি-কলুষিত হউক, তাহার একটা স্বতন্ত্র বিশ্বাস ও তত্ত্ব-নিষ্ঠা আছে—প্রকৃত সাধক যে, সে ঐরূপ দুর্ব্বল, মোহগ্রস্ত হয় না। ঐ কাপালিক শেষে যে অবস্থায়, যে উপায়ে, যাহা করিতে চাহিতেছে, তাহাতে সে আমাদের কৃপার পাত্র হইয়াছে। তান্ত্রিকের সাধনা সর্ব্বসংস্কার-মুক্তির সাধনা—দেহ-মনের যতকিছু বন্ধন, যতকিছু অভিমান, যাহাকিছু আত্মাকে দুর্ব্বল করে, তাহাই উচ্ছেদ করিবার জন্য তান্ত্রিক ঐরূপ নির্ম্মমতার সাধনা করে। কেবল জ্ঞানের দ্বারা, উচ্চ তত্ত্বচিন্তার দ্বারা, ভাব-সাধনার দ্বারা স্বভাব সংশোধন করা বড়ই দুরূহ ; কারণ, সেই সকল চেষ্টার মূলে স্বভাবের ক্রিয়াই থাকিবে ; ভিতরে ভিতরে সেই স্বভাবই মানুষকে ভুলাইয়া, অতিশয় সূক্ষ্মভাবে প্রবঞ্চনা করিয়া, তাহার সাধনা ব্যর্থ করিয়া দেয় ; তাই স্বভাবকেও নিহত করিতে হইবে। এই জন্যই যোগপন্থা ও তন্ত্রপন্থা—বৈদান্তিক সাধনা ও তান্ত্রিক সাধনায় এত প্রভেদ। বঙ্কিমচন্দ্রের এই কাপালিক কেবল সেই নির্ম্মমতার একটা ভীষণ মূর্ত্তি মাত্র। তাহার ভবানী-ভক্তিও একটা অন্ধভক্তি বলিয়াই মনে হয়। তথাপি তাহার এই সাধন-মন্ত্রের দ্বারা, সে তাহার পালিতা কন্যার সারা চৈতন্য আবিষ্ট করিয়াছে ; সে যাহাকে একটা অসম্পূর্ণ জ্ঞান, এবং কতকগুলা অনুষ্ঠানের দ্বারা লাভ করিতে চায়—এখনও করে নাই, ঐ কন্যা তাহার নারীসুলভ অজ্ঞান-অনুভূতিতেই তাহাকে প্রাণে লাভ করিয়াছে, তন্ময় হইয়া গিয়াছে ; সেই শক্তিকে—সেই দেবী-ভবানীকে সে বিশ্বময় দেখিতেছে, তাহার নিজের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা ইচ্ছাশক্তি নাই। কাপালিকের সাধনার মূলে যে সত্য ছিল, তাহা কাপালিকের চরিত্রে নয়—ঐ অপর চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে ; এইজন্য কাপালিক-চরিত্রের যাহাকিছু নীচতা ও দুর্ব্বলতা তাহাই যেন কপালকুণ্ডলা সংশোধন করিয়া লইয়াছে। কপালকুণ্ডলাও নির্ম্মম বা মমতাহীন ; কাপালিক যাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই, সে তাহাতে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কিন্তু সেই নির্ম্মমতার বলেই সে অপূর্ব্ব করুণাময়ী, কাপালিকের প্রতিও তাহার করুণার অন্ত নাই। কাপালিক তাহাকে অজ্ঞান অবোধ মনে করে, এমন কি

তাহার সাধনায় বিঘ্ন ঘটাইয়াছে বলিয়া তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে; কিন্তু সেও জানে না—যে-শক্তির সে আরাধনা করে সেই শক্তির সহিত তাহার ঐ কন্যা একাত্ম হইয়া গিয়াছে। কপালকুণ্ডলা-চরিত্রের সহিত কাপালিক-চরিত্রের যোগে, উপন্যাসের ভাববস্তুর যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার সবিস্তার আলোচনা করিলাম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, 'কপালকুণ্ডলা' কাব্য হইলেও ইহার এক প্রকার নাটকীয় প্রকৃতিও লক্ষণীয়। ইহাও সত্য যে, ইহার ঘটনাধারা একটা নিদারুণ ব্যর্থতায় সমাপ্ত হইয়াছে। অতএব ইহাকে বিলাতী কাব্যশাস্ত্রের মতে ট্র্যাজেডি বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভাল করিয়া ভিতরে দৃষ্টি রাখিলে ইহাকে ঠিক সেই আদর্শের ট্র্যাজেডি বলা যায় না। কারণ, ইহাতে—ভিতরে ও বাহিরে মানুষের জীবনগত কোন বৃহৎ সংঘর্ষ নাই, এই কাহিনীতে মানুষের জীবন বা চরিত্র বিশেষ মর্য্যাদালাভও করে নাই—একটা দুর্দ্ধর্ষ দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় শক্তির সম্মুখে মানুষ মুহূর্ত্তকালও দাঁড়াইতে পারে নাই। যাহাকে 'human interest' বলে তাহাও ইহাতে অল্প। ইহাকে প্রেমের ট্র্যাজেডিও বলা যায় না, কারণ, মতিবিবির প্রেমে সেইরূপ ট্র্যাজেডির আভাস থাকিলেও শেষ পর্য্যন্ত তাহা শোচনীয় না হইয়া অকিঞ্চিৎকর হইয়াছে, এবং নবকুমারের প্রেমও পৌরুষের অভাবে নিতান্তই কৃপার যোগ্য হইয়াছে। অতএব কপালকুণ্ডলা সেই বিলাতী আদর্শের খাঁটি ট্র্যাজেডি নয়।

তথাপি ইহাতে একটা ভিন্নতর ট্র্যাজেডিব ইঙ্গিত আছে। ব্যক্তিবিশেষের জীবন বা চরিত্রঘটিত যে নিদা॰ণ পরিণাম, তাহাই মহিমান্বিত হয় নাই বটে,—ইহা 'ওথেলো' 'ম্যাকবেথ' 'এ্যান্টনি'র ট্র্যাজেডি নয়; কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়ার তাঁহার 'হ্যামলেট' এবং বিশেষ করিয়া 'ল'য়ারে' যে ট্র্যাজেডি-রসের সৃষ্টি করিয়াছেন—সমগ্র মানবজীবন বা সৃষ্টির মূলে যে একটা নির্ম্মম বা অন্ধশক্তির লীলা, ও তাহারই কারণে মানুষের নিষ্ফল সংগ্রামের যে নিরাশ্বাস তাহাতে ঘনাইয়া উঠে—অথবা, ইংরেজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির (Thomas Hardy) উপন্যাসগুলিতে যে ধরণের ট্র্যাজেডি আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়—'কপালকুণ্ডলা'র সহিত তাহার কিছু সাদৃশ্য আছে। তথাপি কপালকুণ্ডলা ঠিক সেইজাতীয় ট্র্যাজেডি নয়। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র ইহাতে যে শক্তিকে জয়যুক্ত করিয়াছেন তাহার মহিমা এমনই যে, মানুষ তাহার তুলনায় আপন ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতা স্বীকার করে—অভিভূত হইলেও হতাশ্বাস (demoralised) হয় না, পরাজিত হইলেও সে পরাজয়ে নিরাশ্বাস জাগিয়া থাকে না। উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদের শেষ দৃশ্য স্মরণ করিলেও ইহা নিঃসংশয় হইয়া উঠিবে। সেখানে সেই শক্তিরই প্রতীক-রূপিণী মানবী-কপালকুণ্ডলা মানব-নবকুমারের প্রেম যে ভাবে প্রত্যাখ্যান করিল, এবং তাহার ফলে সেই হতভাগ্য পুরুষের জীবন-নাট্যে যে যবনিকা পড়িল, তাহা চিন্তা করিয়া পাঠকের হৃদয় যেমন মথিত হয়, তেমনিই, সেই ভাবাকুলতার মধ্যেও একটি অনির্ব্বচনীয় বৈরাগ্য বা শান্তরসের উদ্রেক হয়—ঠিক এই রস য়ুরোপীয় ট্র্যাজেডির রস নয়। আবার নবকুমার এই উপন্যাসের নায়ক

হইলেও, নায়িকা কপালকুণ্ডলাই তাহার অসাধারণ চরিত্র-মহিমায় উপন্যাসের আর সকল চরিত্রের মত, ঐ নায়ককেও এমন ম্লান করিয়া দিয়াছে যে, এই উপন্যাসের ট্র্যাজেডি মুখ্যতঃ তাহারই জীবনের ট্র্যাজেডি। কিন্তু তাহার সেই আত্ম-বিসর্জ্জন, আমাদের চক্ষে যেমনই হোক, তাহার নিজের পক্ষে তাহাই একটা পরম সিদ্ধিলাভ—'a consummation devoutly to be wished'; অতএব দুঃখ করিবার কিছু নাই।

এই সকল কারণে, কপালকুণ্ডলা ট্র্যাজেডি হইলেও এ টা নূতন রসের ট্র্যাজেডি—ইহার প্রেরণাই স্বতন্ত্র। আমি পুনরায় সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি। খাঁটি য়ুরোপীয় ট্র্যাজেডির উপযুক্ত নায়ক-নায়িকা ইহাতে নাই; একমাত্র কপালকুণ্ডলার চরিত্রই ট্র্যাজেডির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবার উপযুক্ত বটে; কিন্তু সে চরিত্র সাধারণ মানব-চরিত্র নয়, তাই সে তাহার নিয়তিকে অনায়াসে, বিনা সংগ্রামে পরাস্ত করিয়াছে—তাহার পক্ষে কোন ট্র্যাজেডিই সম্ভব নয়। অপরগুলির মধ্যে কোথাও কঠিন প্রবৃত্তি-বিরোধ বা দুর্জ্জয় প্রবৃত্তি-বেগ নাই; মতিবিবির মধ্যে যাহা ছিল তাহা অর্দ্ধপথেই প্রায় নিরস্ত হইয়াছে, কপালকুণ্ডলার সহিত পুনরায় সাক্ষাতের পরে সে দ্বিধাগ্রস্ত ও নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছে। যেন সেই এক শক্তিই আর সকলকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিয়া ফেলে। সমুদ্রতীরের সেই মরু-ক্ষেত্র হইতে যে ঝড় প্রবাহিত হইয়াছে তাহার গতিরোধ করে এমন সাধ্য কাহারও নাই; সেই ঝড় অবাধে ও দ্রুতগতিতে সকল তুচ্ছ বাধা অপসারিত করিয়া আপন ধ্বংসকার্য্য সমাধা করিয়াছে—শেষে ভাঙন-ধরা নদীর কূলে, অপর এক শ্মশানে সে তাহার প্রাপ্য বলি আদায় করিয়া লইয়াছে। সেই বলিও নবকুমার নয়—কপালকুণ্ডলা, অর্থাৎ তাহার বলি সে নিজেই। নবকুমার সামান্য মানুষ মাত্র—বড় ক্ষুদ্র; তাই অন্তিমকালে সে সেই মহাশক্তিরূপিণীর নিকটে উন্মাদের মত প্রেম ভিক্ষা করিল, পাইল কেবল করুণা—সুমহতী ক্ষমা। অতএব এই ট্র্যাজেডিতে মানুষের প্রতি কৃপা আছে, সেই কৃপার মধ্যেই করুণ-রস আছে। কিন্তু মানুষ যে কত ক্ষুদ্র—তাহার সমাজ, তাহার সংসার, তাহার সুখদুঃখ, সম্পদবিপদ, তাহার ন্যায়-অন্যায়, তাহার সদসৎ, তাহার চরিত্র-নীতির অভিমান, এবং প্রেমনামক তাহার সেই পিপাসার যতকিছু বিকার—সকলই যে কিরূপ মূঢ়তা, দুর্ব্বলতা ও স্বার্থপরতার নিদর্শন, এই কাব্যে তাহাই নির্ম্মমভাবে প্রকটিত হইয়াছে। সেই ঝড়ের ঝাপটে যে নীড় ধ্বংস হইয়া গেল, তাহাও আকারে বা আয়তনে বড় নয়। কবির দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ। ইংরেজীতে যাহাকে Sublime বলে তাহারই রুদ্রকান্ত রূপের ধ্যানে কবি তন্ময়—সেই Epic Sublimity-ই এ কাব্যের প্রধান রস। তাই, ইহাতে মানুষের বিদ্রোহী আত্মার মহিমা-ঘোষণা নাই; তাহাকেও অতিক্রম করিয়া একটা বিরাট—বিশালের স্তুতি এই কাব্যের মূল প্রেরণা হইয়াছে। এ যেন অর্জ্জুনের বিশ্বরূপদর্শনের মতই—একটা ক্ষুদ্রতর পটভূমিকায়—আর এক প্রকার শক্তিরূপ-দর্শন। এ তুলনার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, ঐ তুলনা দ্বারা একটা বস্তু সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে, তাহা এই যে,—এই কাব্যেও সেই এক ভারতীয়

ভাবদৃষ্টির প্রেরণা রহিয়াছে; সে যে কি দৃষ্টি তাহা বুঝাইবার পক্ষে ঐ এক তুলনাই যথেষ্ট। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা —নাটক-রোমান্স-উপন্যাস-ট্র্যাজেডি—যে গুণযুক্ত হউক, তাহা যে একটি সম্পূর্ণ মৌলিক সৃষ্টি তাহাতে সন্দেহ নাই।

২

'কপালকুণ্ডলা'র ভাব-বস্তু সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি, অতঃপর ইহার কাব্য-পরিচয় আরম্ভ করিলাম। 'কপালকুণ্ডলা'র আখ্যান-বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ।—

এখন হইতে প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। নবকুমার নামে সপ্তগ্রাম-বাসী এক গৃহস্থ যুবক গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম হইতে দেশে ফিরিবার কালে ঘটনাচক্রে সমুদ্রতীরবর্ত্তী এক নির্জ্জন বনভূমিতে সহযাত্রিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। ওই বনে এক কাপালিক বাস করিত, সে সেই নির্জ্জন স্থানে তাহার তান্ত্রিক সাধনার আসন করিয়াছিল। কিছুদূরে বনের অপর প্রান্তে একটি কালী-মন্দির ছিল, সেই মন্দিরের অধিকারী ঐ বনের দ্বিতীয় অধিবাসী। আরও একজন ছিল —ঐ কাপালিক এক কন্যাকে শৈশব হইতে পালন করিয়াছিল, তাহার নাম, কপালকুণ্ডলা।

নবকুমার প্রথমে সেই কাপালিকের দর্শনলাভ করে এবং তাহারই আশ্রয়ে একরাত্রি ও একদিন যাপন করে। তাহাকে দৈবপ্রেরিত মনে করিয়া কাপালিক তাহার ইষ্টদেবী তর্পণার্থে নবকুমারকে বলি দিতে মনস্থ করিয়াছিল, আয়োজনও করিয়াছিল, কিন্তু সেই কন্যা কপালকুণ্ডলা ইতিমধ্যে নবকুমারকে দেখিয়া এবং পরে কাপালিকের অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া তাহাকে সুকৌশলে উদ্ধার করে, এবং সেই দূরস্থ দেবীমন্দিরে তাহাকে লুকাইয়া রাখে। মন্দিরের অধিকারী সেই পূজারী ব্রাহ্মণ এই কার্য্যে সহায়তা করিলেও, কপালকুণ্ডলার প্রতি কাপালিকের ভীষণ রোষ ও তাহার ফল কি হইবে স্মরণ করিয়া—উভয়ের বিবাহ দিয়া, নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলাকেও সেই স্থান হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় করিয়া দিল—যাহাতে কাপালিক আর তাহার সন্ধান না পায়।

পথে এক চটিতে অবস্থান কালে নবকুমারের সহিত তাহার পূর্ব্ব-বিবাহিত ও বহুকাল-পরিত্যক্ত পত্নী পদ্মাবতীর সহিত হঠাৎ দেখা হইয়া গেল; সেও ঐ পথে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যাকালে অতিশয় বিপন্ন অবস্থায় সেই একই চটিতে আশ্রয় লইয়াছিল। কিন্তু পদ্মাবতী এখন আর বাঙালী নহে; তাহার পিতা মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আগ্রার ওমরাহ-সমাজে অতি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পদ্মাবতীর এখন নাম হইয়াছে, লুৎফ-উন্নিসা; এখন সে পূর্ণবয়স্কা যুবতী; তাহার বেশভূষা, কথাবার্ত্তা ও আদব-কায়দা অতিশয় সম্ভ্রান্ত মোগল-অন্তঃপুরিকার ন্যায়। তাই এতদিন পরে কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিল না—বয়সের সহিত নবকুমারের চেহারার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, রাত্রির অন্ধকার এবং অস্পষ্ট দীপালোকও একটা কারণ। লুৎফ-উন্নিসা একটা গুরুতর রাজনৈতিক অভিপ্রায়-

সিদ্ধির জন্য উড়িষ্যায় গিয়াছিল, এখন এই পথে ফিরিতেছে। সঙ্গে লোকজন দাসদাসীও আছে। এইরূপ ভ্রমণকালে সে একটি ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়া থাকে, সে নাম মতিবিবি।

নবকুমার তাহাকে চিনিল না বটে, কিন্তু মতিবিবি তাহার নামধাম জিজ্ঞাসা করিয়া শীঘ্রই চিনিয়া ফেলিল, এবং সেই মুহূর্ত্তে অন্তরে একটা প্রবল বেদনা ও বাসনা অনুভব করিল। সে-ও আর বিবাহ ক.র নাই; আগ্রার বিলাস-ঐশ্বর্য্যে লালিত হইয়া সে এতদিন অতিশয় দুর্নীতিপূর্ণ ভোগসর্ব্বস্ব জীবন যাপন করিতেছিল। আজ তাহার বিবাহিত স্বামীকে দেখিয়া সে পুনরায় দ'ম্পত্য সুখভোগের জন্য আকুল হইয়া উঠিল; অথবা এইবার সে সত্যই প্রথম প্রেমে পড়িল। সপত্নী কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়া যদিও সে তাহার রূপে ও স্বভাব-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইল, তথাপি আশা ছাড়িল ন', কারণ সে নিজেও অসামান্য রূপবতী। ইহার কিছুদিন পরে সে আগ্রার ভোগবিলাস ত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রামে আসিয়া একান্তে একটি সুসজ্জিত অট্টালিকায় বাস করিতে লাগিল, উদ্দেশ্য—নবকুমারকে তাহার রূপ ও ঐশ্বর্য্যের দ্বারা বশীভূত করিয়া নিজের সেই কামনা চরিতার্থ করিবে।

এদিকে নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে স্বগৃহে আনিয়া বড় সুখের আশায় নূতন করিয়া সংসার পাতিল। কিন্তু কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি এমনই যে, সে কিছুতেই সংসার বা সমাজের শাসন, এমন কি—স্নেহপ্রেমের বন্ধনও স্বীকার করিবে না। সে নিজের সুখেও সম্পূর্ণ উদাসীন, যদিও পরের প্রতি করুণাময়ী। নবকুমার যতই তাহার প্রতি প্রেম-বিহ্বল হয় সে ততই কঠিন হইয়া উঠে—সেই দুর্ব্বলতা তাহার কৃপা উদ্রেক করে মাত্র।

মতিবিবি সকল সংবাদই লইতেছিল। সে নানা ছলে নবকুমারকে নিজগৃহে আনিয়া বহুপ্রকারে তাহার প্রেমভিক্ষা করিল; নবকুমার প্রতিবার তাহা প্রত্যাখ্যান করিল। অবশেষে একদিন এইরূপ সাক্ষাৎকালে, উত্তেজিত ও অপমানিত মতিবিবির মুখে সে যখন শুনিল যে, সে তাহারই প্রথমা পত্নী পদ্মাবতী, তখন সে আরও ভীত ও চিন্তিত হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিল, আর তথায় পদার্পণ করিল না।

মতিবিবি তাহাতেও হতাশ হইল না, বরং আরও কঠিন সঙ্কল্প করিল। অতঃপর সে এক অভিসন্ধি করিয়া নবকুমারের গৃহসন্নিহিত নিবিড় অরণ্যে পুরুষবেশে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল; স্বাধীনপ্রকৃতি স্বেচ্ছাবিহারিণী সরলহৃদয়া কপালকুণ্ডলাকে ঐ বনে সে নিশ্চয় দেখিতে পাইবে, এবং ঐ পুরুষবেশেই তাহার সহিত এমনভাবে মিশিবে, যাহাতে তাহাদেব সেই বন্ধুত্ব ক্রমে নবকুমারের চিত্তে ঘোরতর সন্দেহের উদ্রেক করে। এইরূপে কপালকুণ্ডলাকে স্বামীপ্রেম-বঞ্চিত করিতে পারিলেই সে অনায়াসে নবকুমারকে জয় করিতে পারিবে—ইহাই তাহার বিশ্বাস।

হঠাৎ দুইটা সুযোগ ঘটিল। বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া সে সেই সমুদ্রতীরবাসী কাপালিকের দেখা পাইল। কপালকুণ্ডলা কর্ত্তৃক নবকুমারের উদ্ধারসাধনের পরে

সেই রাত্রেই কাপালিক তাহাদের সন্ধানে একটি বালুস্তূপের শিখরে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল ; ঐ স্তূপের তলদেশ বর্ষার জলস্রোতে একদিকে ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল, কাপালিক তাহা লক্ষ্য করে নাই, সেইক্ষণে সহসা স্তূপসহ ভূপতিত হইয়া তাহার দুইবাহু ভগ্ন হইয়া যায়। তথাপি সেই অবস্থাতেও বহু সন্ধানের পর এতদিনে সে নবকুমারের বাসস্থান আবিষ্কার করিয়াছে, ঐ বনের মধ্যেই সে পুনরায় তাহার আসন করিয়াছে, এবার সে কপালকুণ্ডলাকেই বলি দিবে,—এতদিন দেরী করিয়াছিল বলিয়াই দেবী তাহাকে ঐ শাস্তি দিয়াছেন, আর সে ভুল করিবে না। মতিবিবি এই কাপালিকের দ্বারা কিছু সাহায্য পাইবার আশা করিল—দুইজনে একটা ষড়যন্ত্র চলিল।

দ্বিতীয় সুযোগ এই যে, ঠিক ঐ সময়ে কপালকুণ্ডলা তাহার ননদিনী শ্যামাসুন্দরীর দুঃখমোচনের জন্য—স্বামীসহবাসবঞ্চিত কুলীন-কন্যার পতি-বশীকরণ কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য—রাত্রিকালে বন হইতে একটি লতা-মূল সংগ্রহ করিতে বাহির হইয়াছিল। বনে মতিবিবির সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে তাহার মুখে কাপালিকের পুনরাবির্ভাব ও তাহার কারণ অবগত হইল, তাহাতে তাহার পূর্ব্বজীবনের সেই সংস্কার এবং কাপালিকের প্রতি তাহার সেই পূর্ব্ব-মনোভাব আবার জাগ্রত হইল। প্রথম দিন সে সব কথা শুনিবার অবসর পায় নাই, লতা-মূলও সংগ্রহ করিতে পারে নাই, তাই পরদিন সে মতিবিবির পুরুষ-নামে স্বাক্ষরিত একখানি ক্ষুদ্রলিপি পাইয়া পুনরায় রাত্রিকালে বনে বাহির হইল ; নবকুমার দেখিতে পাইয়া তাহাকে নিষেধ করিল, সে তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার নিষেধ মানিল না। ইহার পর নবকুমার সেই লিপি-খানিও কুড়াইয়া পাইল, লিপি পাঠ করিয়া তাহার মনে দারুণ সন্দেহ জন্মিল—হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল। কাপালিক পূর্ব্বরাত্রে কপালকুণ্ডলার অজ্ঞাতসারে তাহার অনুসরণ করিয়া বনপথে নবকুমারের গৃহে প্রবেশ ও নির্গমনের দ্বারপথ দেখিয়া গিয়াছিল ; আজ সে ঐ সময়ে গৃহের নিকটে থাকিয়া সকলই লক্ষ্য করিতেছিল। কপালকুণ্ডলার বহির্গমন, নবকুমারের সেই আকস্মিক দুরবস্থা ও তাহার কারণ, সকলই তাহার কার্য্যসিদ্ধির বড় অনুকূল হইল। সেই সময়ে সাহসা নবকুমারের গৃহপ্রাঙ্গণে আবির্ভূত হইয়া সে তাহাকে যেমন বিস্মিত করিল, তেমনই, পুরুষবেশী মতিবিবির অবৈধ প্রণয় উল্লেখ করিয়া তাহার সন্দেহ আরও বৃদ্ধি করিল ; শেষে নবকুমারকে নিঃসংশয় করিবার জন্য সে তাহাকে সঙ্গে লইয়া বনে প্রবেশ করিল, এবং কিছুদূর গিয়া একস্থানে সেই পুরুষের সহিত আলাপ-রতা কপালকুণ্ডলাকে দেখাইয়া দিল। ইহার পর নবকুমারের বুদ্ধিলোপ হইল। সেই অবস্থায় কাপালিক তাহাকে মদ্যপান করাইল, এবং তদ্দ্বারা নবকুমারকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া, কপালকুণ্ডলাকে ধরিয়া বলি দিবার জন্য পূজার স্থানে লইয়া যাইতে তাহাকে সম্মত করিল।

এদিকে কপালকুণ্ডলা মতিবিবির মুখে কাপালিকের সম্বন্ধে সকল কথা শুনিয়া অতিশয় বিচলিতচিত্তে সেই অন্ধকার বনপথ ধরিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল।

সহসা পশ্চাৎ হইতে অতি গম্ভীর কণ্ঠে কে তাহাকে ডাকিল, সেই স্বরে চমকিত হইয়া কপালকুণ্ডলা ফিরিয়া দাঁড়াইল, এবং তৎক্ষণাৎ কাপালিককে চিনিতে পারিয়া তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। কাপালিক তাহাকে গঙ্গাতীরবর্ত্তী শ্মশানে লইয়া গিয়া বলির পূর্ব্বে স্নান করাইয়া আনিবার জন্য নবকুমারকে আদেশ করিল। মদিরার প্রভাবে নবকুমার তখন অপ্রকৃতিস্থ, সে তাহাকে লইয়া যে উচ্চ পাড়ের উপরে দাঁড়াইল—তাহা একটা ভাঙ্গনের ধার, নীচে খরস্রোত বহিতেছে। সেইকালেও কপালকুণ্ডলার ধীর প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া সহসা নবকুমারের নেশা ছুটিয়া গেল, সে আকুলভাবে কপালকুণ্ডলাকে তাহার সেই হৃদয়বিদারক সন্দেহ দূর করিতে বলিল। কপালকুণ্ডলা সে সন্দেহ দূর করিল, কিন্তু আর গৃহে ফিরিতে চাহিল না। তাহাতে নবকুমার আরও ব্যাকুল হইয়া যেমনই তাহার দিকে অগ্রসর হইল, অমনিই কপালকুণ্ডলার পদতলস্থ সেই ভূমিখণ্ড ভাঙ্গিয়া তাহাকেও লইয়া নদীগর্ভে পড়িয়া গেল; নবকুমারও সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কেহই আর উঠিল না।

এই আখ্যানে ঘটনার বাহুল্য নাই; ঘটনার ধারাও জটিল নয়, তাহার কারণ, ইহা যে-সমাজ ও গৃহ-সংসারের কাহিনী, তাহার জীবনযাত্রা অতিশয় সহজ ও সরল। অতি-স্থির প্রবাহহীন জলতলে লোষ্ট্রক্ষেপের মত দুই একটা উৎপাত মাত্র আছে, তাহাতে সেই জলরাশি বিক্ষুব্ধ হইয়া আবার আপনার খাতে পূর্ব্ববৎ বহিয়া চলে। লেখক এই জীবনযাত্রার পশ্চাতে একটা ঐতিহাসিক পটভূমিকা যুক্ত করিয়াছেন বটে—কিন্তু ইহার মূল কাহিনীটি পারিবারিক, অতিশয় সাধারণ জীবনের কাহিনী। ইহার যাহা-কিছু অভাবনীয়তা বা কাহিনীসুলভ চিত্ত-চমৎকার তাহার কারণ হইয়াছে দুইটি চরিত্র—একটি অসাধারণ, অপরটি অস্বাভাবিক। ইহার ঘটনাধারাও অবিচ্ছিন্ন নয়, এবং তাহাতেও চরিত্রগুলি সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট নয়; অর্থাৎ পাত্র-পাত্রী নিজ নিজ স্বভাব বা প্রবৃত্তির বশে যে কর্ম্মজালে জড়াইয়া পড়ে, ঐ ঘটনাজাল সেইরূপ একটা কর্ম্মবন্ধ নহে—ঘটনাগুলি দৈবের মত বাহির হইতেই ঘটে, এবং তাহার সংঘাতে চরিত্রগুলি যেন অভিভূত হইয়া তাহাদের গূঢ়তর প্রবৃত্তি প্রকাশ করিয়া ফেলে।

এইজন্য উপন্যাস-হিসাবে কপালকুণ্ডলা বিশেষ নৈপুণ্য দাবী করিতে পারে না। মাত্র একটি কালানুক্রম-সূত্রে কতকগুলি ঘটনা গ্রথিত হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে এমন কয়েকটি সংস্থিতির (situation) সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাতে ঐ রোমাণ্টিক কাব্যকল্পনা একপ্রকার নাটকীয় রস-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। নাটক হিসাবে দেখিলে, ইহার ঘটনাচক্র (plot বা action) যে চারিটি খণ্ডে বা অঙ্কে নিঃশেষ হইয়াছে, তাহার প্রথমটিতেই নাটকের Crisis বা নায়ক-ভাগ্যের সেই সঙ্কট-মুহূর্ত্ত দেখা দিয়াছে—যাহাকে তাহার জীবনের একটা গুরুতর সন্ধিক্ষণ বলা যাইতে পারে। নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার বিবাহই সেই Crisis; তাহাতে নায়ক জয়লাভ করিয়া যেন সৌভাগ্যের পথে পদার্পণ করিল; কিন্তু তাহার পরেই ভিন্নমুখে অবতরণ, এবং Catastrophe বা পূর্ণ-পতনের সূচনা।

উপন্যাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে সেই Catastrophe-(পতন)-র বীজ দেখা দিয়াছে ও দ্রুত অঙ্কুরিত হইয়াছে। মধ্যে গতি-নিবারণের একটু সম্ভাবনা জাগিয়াছিল—হয়ত নবকুমার বাঁচিয়া গেল, কারণ মতিবিবি তখনও একটা অতিশয় উচ্চাশা পোষণ করিতেছিল; কিন্তু শীঘ্র তাহা ধূলিসাৎ হওয়ায়, এই ক্ষণ-রুদ্ধ পতন বেগ শেষ খণ্ডে দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে। Crisis Catastrophe-র মধ্যে ঐ যে গতিবেগের একটু বিশ্রাম এবং তজ্জনিত একটা আশা বা সংশয়ের অবকাশ, উহাও একটা নাটকীয় কৌশল; এই উপন্যাসেও গ্রন্থকার সেই কৌশল করিয়াছেন,—আগ্রার রাজ-অন্তঃপুরের ষড়যন্ত্র এবং মেহেরুন্নিসাকেও এই জন্য আবশ্যক হইয়াছে। অতএব 'কপালকুণ্ডলা'র ঐ নাটকীয় প্রকৃতিই লক্ষণীয়—"কপালকুণ্ডলাকে tale নহে, উপন্যাস নহে, উহা গদ্যরীতি কাব্য-নাটক, গ্রীক নাটক"—এ উক্তি যথার্থ। আখ্যানের জটিলতা থাকিলে উহা গ্রাক নাটক হইতে পারিত না। তথাপি নাটক-হিসাবেও ইহার গঠনে একটু অসামান্যতা আছে, কারণ ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, প্রথম অঙ্কেই ইহার Crisis শেষ হইয়াছে—বাকি সমগ্র ঘটনাধারা একটা বিলম্বিত Catastrophe মাত্র।

৩

এইবার ইহার অন্তর্গত চরিত্রগুলির কথা। কাপালিকের চরিত্র স্বাভাবিক বা সামাজিক মানব-চরিত্র নয়, তাহা আমরা দেখিয়াছি। সে একপ্রকার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার আশায় সকল মনুষ্য-সুলভ সংস্কার বিসর্জ্জন দিয়াছে; তাহার যে ইষ্ট-দেবতা—তন্ত্রে তাহার বহুতর নাম আছে; সেই মহাশক্তিকে আরাধনায় তুষ্ট করিয়া সেও মহাশক্তিমান হইতে চায়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে একটা বিকৃতমস্তিষ্ক নর-পিশাচমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাহার ঐ সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন এবং দুই একটি তত্ত্বকথার মত বচন শুনিয়া, এবং তাহার অসীম দেহবল ও নিষ্ঠুর মনোবল দেখিয়া প্রথমে যেমন ভয় ও বিস্ময় জাগে, পরে তাহার দুরবস্থা দর্শনে তেমনিই ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। একটা অমানুষিক সংকল্পসিদ্ধির জন্য তাহার যে একাগ্রতা, তাহাও যেন একটা 'fixed idea' বা একপ্রকার মানসিক ব্যাধির মত। গ্রন্থকার এ-চরিত্রে মনুষ্যপ্রকৃতির বিকৃতিই বিশেষভাবে চিত্রিত করিয়াছেন; এ চরিত্র স্বাভাবিকও নয়, আবার স্বভাবকে অতিক্রম করার যে মহত্ত্ব তাহাও ইহাতে নাই।

কপালকুণ্ডলা-চরিত্রে অসাধারণত্ব আছে, তাহার কারণ পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি। তথাপি, গ্রন্থকার তাহার সেই অনমনীয়, অতিমানবীয়, প্রকৃতির মধ্যেও যতদূর সম্ভব রক্তমাংসের বাস্তবতা রক্ষা করিয়াছেন। প্রথমতঃ, নারী-প্রকৃতিসুলভ দুর্ব্বলতা হইতে সে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়; পালক-পিতার প্রতি কন্যার মত স্নেহভক্তিও তাহার আছে। দ্বিতীয়তঃ, তাহারও একপ্রকার ধর্ম্মবিশ্বাস ও তজ্জনিত মিথ্যা ভয় (superstition) আছে—বিল্বপত্রের ঘটনা ও তাহার মনে সেই ঘটনার প্রভাবই তাহার প্রমাণ। তৃতীয়তঃ, শ্যামাসুন্দরীর দুঃখে সে যে দুঃখ অনুভব

করে, তাহাও একটা সহজ নারীসুলভ সহানুভূতি। এইজন্য যদিও তাহার চরিত্রের আর সকল লক্ষণ—অতিরিক্ত সরলতা, ঘোরতর স্বার্থশূন্যতা ও চিত্তের দুর্দ্দমনীয় স্বাধীনতা-স্পৃহা—এ সকলই তাহাকে কবি-কল্পিত একটি মানসী (Ideal) প্রতিমা করিয়া তুলিয়াছে, তথাপি ঐ অপর লক্ষণগুলি সেই আদর্শকে সম্পূর্ণ অবাস্তব হইতে দেয় নাই। কিন্তু এই সকলের অন্তরালে যে একটি গুণ অপরগুলিকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে—তাহার সেই কঠোর অনাসক্তি বা ঔদাসীন্য—তাহাই এই উপন্যাসের ট্র্যাজেডির কারণ হইয়াছে ; সেই ঔদাসীন্যের কঠিন বেষ্টনী অতিশয় দুর্ভেদ্য বলিয়াই তাহার সহিত কোন মানুষের কোনরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারিল না, সেই পাষাণ প্রাচীরে প্রহত হইয়া নবকুমারও চূর্ণ হইয়া গেল।

আখ্যানভাগে আর যে দুইটি প্রধান চরিত্র আছে তাহাদের একটি—এই উপন্যাসের নায়ক নবকুমার, আর একটি ইহার অন্যতম নায়িকা—মতিবিবি। কপালকুণ্ডলার মূল ভাব-বস্তু ও তাহার গভীরতর কাব্যরসের কথা ছাড়িয়া দিলে এই দুইটি চরিত্রই ইহার উপন্যাস-ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াছে। নবকুমার-চরিত্র লইয়াই উপন্যাসের আরম্ভ, এবং আরম্ভেই লেখক তাহাকে নায়কোচিত গুণসম্পন্ন করিয়া আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন। তাহার বুদ্ধি ও বিচারশক্তি একজন সুস্থ ও সবলচিত্ত যুবকের মত ; তাহার স্বভাবে যে সৎকর্ম্ম-প্রবৃত্তি আছে তাহাও পৌরুষের লক্ষণ। সে অতিশয় স্পষ্টভাষী, তাহার চিত্তও উদার—ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ সে অন্ধভাবে পালন করে না, তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। তীর্থ-দর্শনের ছলে সে সমুদ্র ও সমুদ্রতীরের প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করিতে আসিয়াছে —সে ভাবুক ও কাব্যরস-রসিক। লেখক প্রথম দুই পরিচ্ছেদেই নবকুমারের চরিত্র-পরিচয় প্রায় সম্পূর্ণ করিয়াছেন। পরবর্তী ঘটনাগুলিতে, বিশেষতঃ, কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করিয়া তাহার উদ্ধারসাধন, এবং পরে পথিমধ্যে মতিবিবির সহিত প্রথম সাক্ষাতে তাহার কর্ত্তব্যবোধ, স্ত্রীজনের প্রতি শিষ্ট ব্যবহার, তীক্ষ্ণ আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান ও সংযমের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে, ইংরেজীতে যাহাকে আদর্শ gentleman বলে সে তাহাই। পুরুষ-চরিত্রের এই আদর্শ আমাদের সাহিত্যে অতিশয় আধুনিক—বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব রুচির পরিচায়ক। মতিবিবির গৃহে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করার দৃশ্যে এই চরিত্রে যে দৃঢ়তা যুক্ত করা হইয়াছে, তাহাতেও একটু আধুনিকতার ছাপ আছে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নবকুমার-চরিত্রের এই সর্ব্বাঙ্গীণ বলিষ্ঠতার পরিচয় আমরা কাহিনীর প্রথমভাগেই পাই। শেষের দিকে তাহার সেই পুরুষোচিত উদারতা ও সুস্থ বিচারবুদ্ধির অভাবই লক্ষ্য করি। এইরূপ পরিণাম ট্র্যাজেডির নায়কের পক্ষেও ঘটিয়া থাকে ; অধঃপতনের কারণও সেই চরিত্রের মধ্যে নিহিত থাকে। পুরুষ যতই মহৎ হোক, তাহার মনুষ্যসুলভ দুর্ব্বলতা থাকিবেই —কোন না কোন রন্ধ্রে শনি প্রবেশ করিয়া তাহার সেই মহত্ত্বকে নিষ্ফল করিয়া দেয়। কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করার পর তাহার জীবনে যে নূতন একটি অবস্থার

সূত্রপাত হইল—কপালকুণ্ডলার প্রতি তাহার সেই আকস্মিক ও অতিপ্রবল অনুরাগই তাহার চরিত্রের মূল ভিত্তি শিথিল করিয়া দিল। লেখক তাহার হৃদয়কে এই প্রেমের দ্বারা বিস্ফারিত করিতে চাহিয়াছেন—এ চরিত্রের পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক বটে ; প্রেম এমন পুরুষকে আরও নিঃস্বার্থ আরও শক্তিমান করিবে। কিন্তু নবকুমারের প্রেম স্বাস্থ্য না হইয়া একটা ব্যাধিতে পরিণত হইল—একটা অস্বাভাবিক ক্ষুধার মত, রিপুর মত, তাহাকে আত্মভ্রষ্ট করিল। সর্ব্বশেষে সে নিজেও তাহা বুঝিয়াছে—প্রেমের পরিবর্ত্তে রূপমোহকেই তাহার দুরবস্থার কারণ বলিয়া আত্মগ্লানি প্রকাশ করিয়াছে (উপন্যাসের শেষ খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এইরূপ হইবার কারণ কি ? লেখক সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরুত্তর। এ চরিত্রের এই-রূপ পরিবর্তন সহসা অসঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু একটু ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলেই ইহার কারণ অতিশয় স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। বঙ্কিমচন্দ্রের কবিদৃষ্টি অভ্রান্তই আছে ; তাঁহার সৃষ্টিকল্পনা সৃষ্টিই করে এবং সে কল্পনা অব্যর্থ বলিয়া তিনি নিজে এই সকল গভীরতর কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। নবকুমারের এই অস্বাভাবিক চরিত্রভ্রংশ একটা অস্বাভাবিক কারণেই ঘটিয়াছে—সে কারণ কপালকুণ্ডলা, সে-ই সকল অস্বাভাবিকতার নিদান। কিন্তু ইহার একটা স্বাভাবিক কারণও নির্দ্দেশ করা যায়। নবকুমারের সেই প্রথম বিবাহের পরিণাম এমনই লজ্জাজনক ও দুঃখকর হইয়াছিল—তাহার মত পুরুষের হৃদয়ে, তথা আত্মসম্মানে, এমন আঘাত লাগিয়াছিল যে, তাহার ফলে সে আর বিবাহ করে নাই ; ইহা সেকালের পক্ষে একটু অসাধারণ। সম্ভবতঃ নারীর সহিত ঐ সম্পর্ক সে অতঃপর ভয় ও সন্দেহের চক্ষে দেখিত। কপালকুণ্ডলার প্রতি তাহার যে আকর্ষণ তাহার মধ্যেও এই সংস্কার জাগ্রত ছিল ; তাহার অন্তরের অন্তরে যেন একটা ভয় ছিল যে, নারী-সংস্পর্শ তাহার পক্ষে কল্যাণকর হইবে না। পরে বিবাহবিমুখ নবকুমার কপালকুণ্ডলার অসাধারণ রূপ ও অদ্ভুত চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া, এবং—তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতার বশেও—বিবাহ করিল ; তখন এতদিনের নিরুদ্ধ, অথচ সুস্থ ও স্বাভাবিক যৌনপিপাসা যেন প্রকৃতির প্রতিশোধের মত তাহাকে আক্রমণ ও অভিভূত করিল। তথাপি তাহার প্রথমা পত্নীর সেই স্মৃতি, সেই দাহচিহ্ন সে ভুলিতে পারে নাই ; ফলে, সে এই স্ত্রীর সম্বন্ধেও সন্দেহকাতর হইয়া উঠে। বাহিরেও যেমন সেই পদ্মাবতী তাহাকে এখনও অনুসরণ করিতেছে, ভিতরেও সেই পত্নীর স্মৃতি তাহার প্রেমকে পঙ্গু করিয়া তাহার চরিত্রের এমন অবনতি ঘটাইয়াছে।

মতিবিবি-চরিত্র লেখক নিজেই এমন সবিস্তারে ও গাঢ় বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন এবং নিজেই তাহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার পর সে বিষয়ে অধিক কিছু বলিবার নাই বটে, তথাপি এই চরিত্র উপন্যাসের এক ভাগে এমন রসসৃষ্টি করিয়াছে যে, পাঠকের দিক দিয়া ওই চরিত্রের কাব্য-সৌন্দর্য্য-বিচার করিবার পৃথক প্রয়োজন আছে। এই চরিত্রসৃষ্টিতে নারীপ্রকৃতি-সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর কবিদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কপালকুণ্ডলা-চরিত্রে তাঁহার দৃষ্টি একটা ভাববস্তু

বা তত্ত্বরসে নিবদ্ধ ছিল, এখানে তাহা মুক্তিলাভ করিয়াছে—সেখানে যাহার অবকাশ ছিল না, এখানে তাহার পূর্ণ অবকাশ মিলিয়াছে। কাহিনীর দিক দিয়া দেখিতে পাই, যে মুহূর্ত্তে মতিবিবির আবির্ভাব হইয়াছে সেই মুহূর্ত্তেই উপন্যাসের আখ্যান-গ্রন্থি দৃঢ়তর হইয়াছে; নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার বিবাহিত জীবনের ঠিক প্রবেশপথে সেই পথের অন্তও দেখা দিয়াছে। মতিবিবি যেন নবকুমারের প্রাক্তন কর্ম্মের দুশ্ছেদ্য বন্ধন—সেই কর্ম্মশৃঙ্খলই এই উপন্যাসের ঘটনাকে প্রসারিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। জীবনে এমনই করিয়া গ্রন্থি পড়ে এবং গ্রন্থিমোচন হয়; যেন তাহার আদ্যন্ত একটা অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যতের কর্ম্মধারায় সুবিন্যস্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া আছে। জীবনের আলেখ্যরচনায় যে কবি এই তত্ত্বটি আমাদের দৃষ্টিগোচর করেন—আদ্য, মধ্য ও অন্তকে এমনই একটা নিয়মাধীন দেখাইতে পারেন, তিনিই জীবনের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর; ঐ প্লট বা আদ্যন্তযুক্ত কাহিনীনির্ম্মাণই সেইরূপ সৃষ্টি-প্রতিভার প্রধান কৃতিত্ব।

আবার, এই চরিত্রই উপন্যাসের রসবস্তুকেও নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে। প্রকৃতি ও পল্লীসমাজের যে মূল বর্ণ-ভূমিকায় এই আখ্যান চিত্রিত হইয়াছে, তাহার উপরে একটি বিপরীত বর্ণের অত্যুজ্জ্বল ছটা উদ্ভাসিত করিয়াছে এই মতিবিবির আবির্ভাব। উহার দ্বারা মোগলযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, বিলাস ও ঐশ্বর্য্য, বৈদগ্ধ্য ও শিষ্টাচার যেমন ঐ পল্লী-প্রতিবেশের মধ্যে আরও প্রেক্ষণীয় হইয়াছে, তেমনই মতিবিবি-চরিত্রে নারীপ্রকৃতির যে আরেক রূপ—তাহার সেই দুরন্ত ভোগ-পিপাসা—তাহাও কপালকুণ্ডলা-চরিত্রের অতিশয় বিপরীত হইয়া, এই কাব্যের ভাববস্তুকে অতিশয় পরিস্ফুট করিয়াছে। আগ্রার রাজ-পরিবারের সঙ্গে সপ্তগ্রামের এক বাঙালী গৃহস্থ পরিবারের যোগস্থাপন সহজ বা স্বাভাবিক নয়—কবি সেই দুঃসাহস করিয়াছেন; যোগটা একটু কষ্ট-কল্পিত হইলেও, ইহার দ্বারা উপন্যাসের পটভূমিকাও যেমন বিস্তার লাভ করিয়াছে, তেমনই তদ্দারা রোমান্সের ইতিহাস-রস ও যুক্ত হইয়াছে।

মতিবিবি চিরন্তনী নারী,—পুরুষের ভোগ-সহচরী, তাহার সুখদুঃখবিধায়িনী, বাসনাকামনাময়ী, মোহিনী, নায়িকারূপিণী নারী! নারীর এই মূর্ত্তিই শ্রেষ্ঠ কবিগণের কল্পনাকে যেমন উদ্বুদ্ধ তেমনই মূর্চ্ছিত করিয়াছে। এই নারী প্রকৃতির নিয়মে সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বসমাজে মুকুলিত হয়, কিন্তু সর্ব্বদা প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। কবিগণ কাব্যে, নাটকে, সেই অস্ফুট বা অর্দ্ধস্ফুট মুকুলের পূর্ণস্ফুট রূপটিকে কল্পনাচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া আমাদেরও চক্ষের অতি সম্মুখে স্থাপন করেন। যে কয়টি গুণ এইরূপ নারী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাহার প্রায় সবই মতিবিবির চরিত্রে আছে—কামনা-উদ্রেককারী (voluptuous) রূপ, প্রখর বুদ্ধি, সাহস বা প্রগল্‌ভতা, এবং সুনিপুণ রসিকতা-শক্তি। কিন্তু এসকল সত্ত্বেও মতিবিবির চরিত্র বড়, অর্থাৎ মহনীয় নয়; কবি নিজেই বলিয়াছেন, তাহার সকলই আছে, নাই কেবল—নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ সেই হৃদয় বা প্রেম; তৎপরিবর্ত্তে আছে এক দুর্দ্দমনীয় ভোগলালসা। কিন্তু তাই বলিয়া মতিবিবি একজন সাধারণ নারীও নয়।

সত্য বটে, ঐ সকল গুণ একজন উচ্চশ্রেণীর গণিকারও থাকিতে পারে, তথাপি মতিবিবি সেইরূপ সাধারণী নারীও নয়, নয় বলিয়াই সে এই উপন্যাসের খণ্ড-আকাশে সচন্দ্রতারকা বিভাবরীর মত উদয় হইয়াছে; শেষে অগ্নিময়ী উল্কার মত নিজে দগ্ধ হইয়া অতি তীব্র ও অশুভ আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়াছে। তাহার সেই প্রবল ভোগাসক্তির মধ্যেও দুইটি বিরোধী চরিত্র-লক্ষণ ছিল—একটি তাহার অত্যুগ্র আত্মাভিমান, আরেকটি তাহার স্বাভাবিক ঔদার্য্য। এই দুইটিই তাহার ভোগ-জীবনের বাধা হইয়া শেষে তাহার সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে। প্রথমটির জন্য সে আগ্রার বিলাসজীবন ত্যাগ করিয়াছিল, অথচ নবকুমারকে বশ করিবার মত নম্রতা, বিনয় ও সহিষ্ণুতা তাহার ছিল না। দ্বিতীয়টির জন্য সে কাপালিকের সহিত ষড়যন্ত্রে সম্যক সম্মত হইতে পারে নাই; সেই দ্বিধা তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির কতখানি অন্তরায় হইয়াছিল তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়; সে কপালকুণ্ডলার প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া এমন কাজ করিল যাহাতে অবস্থা আরো দারুণ হইয়া উঠিল—শেষে সব গেল। এইজন্য মতিবিবির চরিত্রসৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে নারীচরিত্রের জটিলতর গ্রন্থি-মোচন করিতে হইয়াছে; কপালকুণ্ডলায় যেমন প্রকৃতি-ধ্যানমূলক ভাব-কল্পনার কবিত্বই অধিক, এই চরিত্রে তেমনই নারীচরিত্রের রহস্যগভীর তলদেশে কবিকল্পনার স্বচ্ছন্দ প্রবেশ আছে।

এই উপন্যাসে কয়েকটি অপ্রধান চরিত্রও আছে; যথা—ভবানী-মন্দিরের অধিকারী, মতিবিবির বাঁদী পেষমণ, মেহেরুন্নিসা ও শ্যামাসুন্দরী। এ সকলের মধ্যে মেহেরুন্নিসা-চরিত্রের সহিত এই উপন্যাসের ঘটনাগত সম্পর্ক নাই, গ্রন্থকার একটি সুযোগ-সৃষ্টি দ্বারা উপন্যাসমধ্যে এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধা নারীর একটু স্থান করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে এ কাহিনীর শোভাবৃদ্ধি হইয়াছে। এ চরিত্র-সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মন্তব্যই যথেষ্ট। বাঁদী পেষমণ যেন মতিবিবিরূপ হীরকখণ্ডটিকে বসাইবার একটি রূপার আংটি, আংটিটি অতি সামান্য বটে, কিন্তু এই সাধারণ সামান্যা নারীর সাংসারিক বুদ্ধি ও তাহার অবস্থা-অনুযায়ী আশা-আকাঙ্ক্ষা মতিবিবির আভিজাত্য ও উচ্চাভিলাষকে তুলনায় অতিশয় লক্ষ্যগোচর করিয়াছে। যাহাকে ক্ষুদ্র মনে হইতেছে তাহারও মূল্য কম নহে; এই উপন্যাসের কল্পনামণ্ডলটি সুসম্পন্ন করিবার জন্য এই সকল খণ্ড-চরিত্র যথাস্থান অধিকার করিয়া শিল্পীর শিল্প-কৌশলের সাক্ষ্য দিতেছে। পেষমণের সহিত মতিবিবির কথোপকথন যদি বাদ দেওয়া যায়, তবে মতিবিবির কাহিনী অঙ্গহীন হইয়া পড়ে। শ্যামাসুন্দরীও ঠিক এইরূপ চরিত্র, কপালকুণ্ডলা-চরিত্রকে তুলনায় উজ্জ্বলতর করিবার জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল—এই দুইটিকে একত্র স্থাপন করিয়া লেখক, সমাজ-সংসার ও প্রকৃতি এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব অতিশয় পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন—শ্যামাসুন্দরীর পাশে না দেখিলে আমরা কপালকুণ্ডলাকে উত্তমরূপে চিনিতে পারিতাম না। আরও দুই কারণে শ্যামাসুন্দরীর চরিত্র উল্লেখযোগ্য; প্রথমতঃ, বঙ্কিমচন্দ্র এই একটি মাত্র চরিত্রের দ্বারা এই উপন্যাসে একটু বাস্তব আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছেন; এমন সরলহৃদয় স্নেহকাতর খাঁটি বাঙালী নারী এ

সমাজে এখনও সর্ব্বত্র সুলভ ; দ্বিতীয়তঃ, শ্যামাসুন্দরীর সেই স্ত্রীজনসুলভ কুসংস্কার, সেকালের পক্ষে যেমন আরও স্বাভাবিক হইয়াছে, তেমনই, উহার ফলে উপন্যাসের ঘটনাধারা একটা অপ্রত্যাশিত গতিবেগ লাভ করিয়াছে,—সে পক্ষে এই চরিত্র বড় কাজে লাগিয়াছে। অধিকারী-চরিত্রটিও এই কাহিনীর পক্ষে বড় প্রয়োজনীয় হইয়াছে ; কপালকুণ্ডলার জীবনের গতি সেই ফিরাইয়া দিয়াছে ; কপালকুণ্ডলার চরিত্রের উপরেও তাহার প্রভাব অল্প নহে। সংসারত্যাগী ঐ পুরুষটির মধ্যে যে হৃদয়মাধুর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহা যেমন মুগ্ধ করে, তেমনই সে চরিত্রের নিরভিমান নম্রতা, সামাজিক শিষ্টতা ও ব্যবহার-জ্ঞান প্রভৃতি সদ্‌গুণে উহা আমাদের চিত্তে একটি গভীর রেখাপাত করে। কপালকুণ্ডলাকে বিদায় দেওয়ার কালে কণ্ব-কর্ত্তৃক শকুন্তলা-বিদায়ের অনুরূপ দৃশ্য মনে পড়ে। অতএব এই অপ্রধান চরিত্রগুলিও বঙ্কিমচন্দ্রের কবিপ্রতিভার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

৪

কপালকুণ্ডলা যে কিরূপ উপন্যাস তাহা পূর্ব্বে সবিস্তারে বলা হইয়াছে। তথাপি ইহা যে খাঁটি রোমান্সধর্ম্মী তাহাতে সন্দেহ নাই। রোমান্স-জাতীয় পদ্য বা গদ্যকাব্যে যে ধরণের রসসৃষ্টি করিতে হয়, তাহার পক্ষে দূর কাল ও অপরিচিত প্রতিবেশ বড়ই অনুকূল ; এইজন্য ইহা কখনও বর্ত্তমানের কাহিনী হইতে পারে না ; বরং সে কাহিনীর স্থানকাল যতই অনির্দ্দেশ্য হয় ততই সেই রস গভীর হইয়া উঠে। প্রাচীন আখ্যান-আখ্যায়িকার এই রসই ছিল মুখ্য। কিন্তু নব্য রোমান্স-কাব্য সেই কল্পনাকে একটা বিশিষ্ট দেশ-কালের ছাপ দিয়া—যাহা সচরাচর ঘটে না তাহাকে একটু বাস্তবের রূপ দিয়া, পাঠকচিত্তকে অধিকতর আকৃষ্ট করে ; যাহা কল্পনামাত্র তাহারও সম্ভাব্যতা বড়ই উপাদেয় মনে হয়। আখ্যান-রচনায় এইরূপ ঐতিহাসিকতার মাত্রা ও প্রকারভেদ আছে। ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনাকে কাহিনীর সহিত যুক্ত করিয়া সাধারণ মানুষের জীবনকাহিনীকেই গৌরবদান করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা এ প্রসঙ্গে অতিশয় মূল্যবান ; তিনি লিখিয়াছেন—

"যাহা স্বভাবতই আমাদের হইতে-দূরস্থ, যাহা আমাদের অভিজ্ঞতার বহির্বর্ত্তী তাহাকে কোন একটা ছুতায় খানিকটা প্রকৃত ঘটনার সহিত বাঁধিয়া দিতে পারিলে পাঠকের প্রত্যয় উৎপাদন লেখকের পক্ষে সহজ হয়। রসের সৃজনটাই উদ্দেশ্য, অতএব সেজন্য ঐতিহাসিক উপকরণ যে পরিমাণে যতটুকু সাহায্য করে সে পরিমাণে ততটুকু লইতে কবি কুণ্ঠিত হন না।

ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে; ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোন খাতির নাই। ['ঐতিহাসিক উপন্যাস'—সাহিত্য]

'কপালকুণ্ডলা'কে কি অর্থে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে? ইহাতে কোন বৃহৎ ঐতিহাসিক পটবিস্তার নাই, নায়কনায়িকার কেহই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি নহে। তথাপি ইহাতেও ইতিহাস-রস আছে। ইহার কাহিনী বর্ত্তমানের নহে,—তাহাতে মোগলযুগের আবহাওয়া রহিয়াছে ; সংসার ও সমাজ-

চিত্রে প্রাক্-আধুনিক যুগের ছাপ রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই কাব্যের ইতিহাস-রস বলিয়াছেন; ইহার অধিক না বলিলেও চলে।

য়ুরোপীয় সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে নানা রূপ ও ভঙ্গি দেখা দিয়াছে, তাহার কলা-কৌশলেরও অন্ত নাই; এখানে সে আলোচনা অবান্তর। 'কপালকুণ্ডলা' সম্বন্ধে কেবল ইহাই বলা সঙ্গত হইবে যে, ইহা কোন বিশেষ আদর্শের ঐতিহাসিক উপন্যাস না হইলেও, একরূপ ইতিহাস-রস যখন ইহার কাব্যরসকে সমৃদ্ধ করিয়াছে তখন এক অর্থে ইহাও 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বা ইতিহাসগন্ধী রোমান্স। বঙ্কিমচন্দ্রের অপর কয়েকখানি উপন্যাসে ইতিহাসের সংশ্রব কিছু অধিক থাকিলেও, সেগুলিও ঠিক এই অর্থে ঐতিহাসিক উপন্যাস—সেখানেও, ইতিহাসের সত্য নয়, ঐ ইতিহাস-রস সঞ্চারিত করাই কবির একমাত্র উদ্দেশ্য।

'কপালকুণ্ডলা'র ভাববস্তু সম্বন্ধে আর একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে—এই কাব্যে এক প্রকার অদৃষ্ট বা অখণ্ডনীয় নিয়তির ক্রিয়া যেন অতিশয় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ঐ কাহিনীর মূলে যে মহাশক্তির লীলা আছে বলিয়াছি, অথবা যে শক্তির মহিমাই এ কাব্যের কল্পনা-বস্তু হইয়াছে, তাহাকেই যদি 'অদৃষ্ট' বা সর্ব্বজয়ী নিয়তি বলা হয়, তবে 'কপালকুণ্ডলা'র অদৃষ্টবাদকে একটু ভিন্ন বা বিশেষ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। কপালকুণ্ডলার কাহিনীতে, তাহার ঘটনাধারার গতি ও প্রকৃতিতে, আমরা যেন একটা দুর্ব্বার ও প্রচ্ছন্ন শক্তির লীলা লক্ষ্য করি বটে, কিন্তু একমাত্র কপালকুণ্ডলার চিত্তে ও চরিত্রে সেই শক্তির সজ্ঞানতা এবং ভবিতব্যের দৃঢ়মূল দেখিতে পাই; নতুবা এই উপন্যাসে যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহা মানব-প্রকৃতির বা বহিঃপ্রকৃতির নৈসর্গিক নিয়মেই ঘটিয়াছে, ইহার দৈবসংঘটনকে সাধারণ অর্থে দৈবই বলা যায়, অদৃষ্টমূলক বলা যায় না। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসেও কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন ও সেই চরিত্রে তাহার প্রভাব এই প্রসঙ্গে তুলনীয়। কপালকুণ্ডলার ঐরূপ ভয়ের কারণও মনস্তত্ত্বের দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যাইত পারে। অতএব প্রকৃতির নিয়মকেই যদি 'নিয়তি' বা 'অদৃষ্ট' বলা যায়, তবে 'কপালকুণ্ডলা'য় অদৃষ্টবাদের সমর্থন আছে। কপালকুণ্ডলার ঐ যে ভবিতব্যে বিশ্বাস, উহাও তাহার চরিত্রের একটি লক্ষণ। কপালকুণ্ডলা সেই অদৃষ্টকে কি চক্ষে দেখে? তাহাকে সে ভবানীর ইচ্ছা বলিয়াই, অতিশয় নিশ্চিন্ত, নির্ব্বিকারভাবে, এমন কি আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লয়। বনপথে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সে আকাশে যে ভৈরবীমূর্ত্তি দেখিতেছে (চতুর্থ খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ), তাহার সেই ভীষণ সঙ্কেতও সর্ব্বসংশয় দূর করিয়া তাহাকে যেন আশ্বস্ত করিল। তাহার নিকটে সেই অদৃষ্ট বা ভবিতব্য আর কিছু নয়—সেও যেন এক মহাশক্তির মঙ্গলময় বিধান, তাহাতে সৃষ্টির সত্যই আছে: ঐ ভবিতব্যের অব্যর্থতা একটা অন্ধ নিষ্ঠুর কিছু নয়, উহাতেই গূঢ়তর ও মহত্তর কল্যাণ নিহিত আছে। অতএব কপালকুণ্ডলার ঐ 'অদৃষ্ট' সাধারণ মানবীয় সংস্কারের 'অদৃষ্ট' নয়—উহা সেই দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় শক্তিরই লীলা। এ কাব্যের ভাবনা-কল্পনা যেমন সর্ব্বাংশেই মৌলিক, তেমনই ইহার প্রত্যেকটি সমস্যা সেই এক ভাববস্তুর অনুগত; এই 'অদৃষ্ট'ও সেই ভাববস্তুর একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—অথবা

তাহারই আর এক রূপ। এই ভাববস্তুকেই একজন বিদেশী সমালোচক আখ্যা দিয়াছেন—"a mystic form of Eastern thought"; বস্তুতঃ কপালকুণ্ডলার কবিকে সেই ভারতীয় তত্ত্ববাদের একটা গূঢ়-গভীর প্রেরণাই আবিষ্ট করিয়াছে; 'mystic thought' অর্থে—চৈতন্য-গহনের অপরোক্ষ অনুভূতি; এইজন্যই ইহার রস-রূপ সুনির্দ্দেশ্য নয়—ইহা অতিমাত্রায় রোমাণ্টিক হইয়াছে। আমি উক্ত সমালোচকের সম্পূর্ণ উক্তিটিই এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, তাহাতে বাঙালী পাঠকপাঠিকা বুঝিতে পারিবেন, এ কাব্য একজন বিদেশী সাহিত্যবিদ্‌কেও কিরূপ মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছে; এই উদ্ধৃতির জন্য আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণের নিকট ঋণী। উক্তিটি এই—

"The force that moves the whole with emotion, and gives to it its subtle spell, is the mystic form of Eastern thought that clearly shows the new forms that lie ready for inspiring a new school of fiction with fresh life. Outside the *Marriage de Loti* there is nothing comparable to the *Kapalkundala* in the history of Western fiction" [R. W. Fraser : *Literary History of India*]

লেখক বলিয়াছেন 'The force that moves' ইত্যাদি কপালকুণ্ডলার অদৃষ্টবাদ সেই এক শক্তিরই তত্ত্ববাদ—যে শক্তি অদৃষ্ট হইতেও বড়, মানুষের চিন্তা মানুষের ভাষা যাহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না। ইহাকে শোপেনহাউয়ের (Schopenhauer) বা হার্ডির 'Will' বলা যাইতে পারিত, কারণ এই শক্তির অদৃশ্য আকর্ষণে উপন্যাসের পাত্রপাত্রীগণ যেন সম্পূর্ণ অবশে একটা নিশ্চিত পরিণামের দিকে ছুটিয়াছে বলিয়া মনে হয়; যেন একটা দুর্নিবার fatalism সমগ্র জীবনের উপরে ছায়া বিস্তার করিয়াছে। কিন্তু তখনই স্মরণ হয় যে, ঐ শক্তির মহিমা এমনই যে, তাহার সম্মুখে মানুষের মঙ্গল-অমঙ্গলের কোন অর্থই নাই, তাহার এই নির্ম্মমতাও বন্দনীয়—সেই শক্তিকে বরণ করিয়া তাহার সমকক্ষ বা তাহার সহিত একাত্ম হইতে পারাই মানব-জীবনের নিঃশ্রেয়স।

শেকস্‌পীয়ারের ট্র্যাজেডিগুলিতেও যে নিয়তির লীলা আছে বলিয়া মনে হয়, একজন মনীষী আধুনিক সমালোচকের মতে, তাহা একটা ভ্রান্ত ধারণা। তিনি বলিয়াছেন, উহা একটা 'blank necessity' নয়—একটা 'moral necessity' অর্থাৎ উহার দ্বারা সৃষ্টিমূলে একটা 'শিব' বা 'মঙ্গল'-এর আধিপত্যই সূচিত হয়। কপালকুণ্ডলার কল্পনামূলে যে অদৃষ্ট বা নিয়তির আভাস আছে তাহা এইরূপ মানবীয় সংস্কারের মঙ্গল-অমঙ্গল-বোধকে তৃপ্ত করে না। উক্ত সমালোচক যে বলিয়াছেন—

But the name 'fate' may be intended to imply something more—to imply that this order is a blank necessity totally regardless alike of human weal and of the difference between

good and evil, or right and wrong. [A. C. Bradley : *Shakespearean Tragedy*, p. 30.]

—এখানে যেন সেই 'fate'-এর লক্ষণই সবিশেষ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। অতএব পাশ্চাত্য সমালোচক ইহাকে শেকস্‌পীরীয় ট্র্যাজেডির লক্ষণ বলিবেন, না-হয় বড় জোর উহার ঐ নিয়তিকে একটা গূঢ়তর তত্ত্ববাদের (mysticism) অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিবেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত আর এক ইংরেজ সমালোচকের মন্তব্য তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। ইহার কারণ, আমি পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি—য়ুরোপীয় জীবন-দর্শনে morality বা ন্যায়-অন্যায়ের সংস্কার এমনই বদ্ধমূল যে, সর্ব্বসংস্কার-মুক্তির সেই ভারতীয় সাধনা ও তদনুগত বিরাট বা ভূমার উপলব্ধি—যাহা কেবল অনুভবযোগ্য, প্রকাশযোগ্য নহে—তাহাই তথাকার ভাষায় ঐ এক mystic নামে সকল জিজ্ঞাসার বহির্ভূত হইয়া থাকে; আমিও পূর্ব্বে ঐ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু ঠিক ঐ অর্থে নহে। যাহা moral নহে তাহাই দুর্ব্বোধ্য ও ভীতিজনক, তাহাই অবস্থা বা ঘটনা-বিশেষে অন্ধ-নিয়তির রূপ ধারণ করে। কিন্তু 'কপালকুণ্ডলা'র কবি এই শক্তিকে ভিন্নরূপে ভাবনা করিয়াছেন, সেইজন্যই কপালকুণ্ডলার চরিত্র ঐরূপ হইয়াছে এবং নবকুমার ও মতিবিবি কেহই পৃথক্ চরিত্র-মহিমা লাভ করে নাই—করিলে moral necessity-র প্রশ্ন উঠিতে পারিত, সে প্রশ্ন এখানে যেন অবান্তর। 'কপালকুণ্ডলা'য় যে শক্তির লীলা আছে তাহা ঐরূপ নিয়তি নয়: তাহা 'অদৃষ্ট' বটে, কিন্তু তাহা একটা পরম সত্যের মত অন্তর-গভীরে 'দৃষ্ট' হইয়া থাকে; তখন তাহাকে স্বীকার করিয়া, অন্তরে বরণ করিয়া সর্ব্বভয় ও সংশয়ের পারে যাওয়া যায়। যতক্ষণ ইহা 'অদৃষ্ট' থাকে ততক্ষণই ভয়—মানুষের হৃদয়-দৌর্ব্বল্যই তাহার কারণ। 'কপালকুণ্ডলা'য় সেই শক্তির যেন একটা ঝলক আকস্মিক বজ্রদীপ্তির মত ফুটিয়া উঠিয়াছে, দুর্ব্বল মানুষ তাহা সহ্য করিতে পারিল না, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা অন্ধ-নিয়তি নহে।

তথাপি, যদি এই কাহিনীর কোন অংশে অদৃষ্টবাদের ইঙ্গিত থাকে, তবে তাহা নবকুমারের জীবনে অন্যভাবে আছে, তাহাও ঠিক অদৃষ্টবাদ নয়, হিন্দুর কর্ম্মফলবাদ। নবকুমার পূর্ব্বে যে একবার বিবাহ করিয়াছিল তাহারই দুর্লঙ্ঘ্য কর্ম্মফল তাহাকে নির্ম্মমভাবে অনুসরণ করিয়াছে; পদ্মাবতীর সহিত সেই বিচ্ছেদে নিশ্চয় এমন একটা কিছু ছিল, যাহার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েই দায়ী (তৃতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), তাহাতেই যে বিষপাত্র প্রস্তুত হইয়াছিল উভয়কেই তাহা পান করিতে হইয়াছে। আমার মনে হয়, কাহিনীর অন্তর্গত এই তত্ত্বটি অনেকের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহাই একহিসাবে সমগ্র আখ্যানটিকে একটি গভীরতর জীবন-সত্যের মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে।

৫

এইবার কপালকুণ্ডলার কয়েকটি বিশিষ্ট কাব্য-লক্ষণ বা কলা-কৌশলের কথা বলিব :—

১. রোমান্টিক কল্পনার কতকগুলি উপাদান এই উপন্যাসের কাব্যগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে, যথা—নির্জ্জন অরণ্য ও সমুদ্রতীর ; অপরিচিত দেশ, দুর্গম পথ, দস্যুভয় ; আভিজাত্যের ঐশ্বর্য্য, অতীতের মায়া ; অতিশয় সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা। কিন্তু ইহার প্রধান রোমান্টিক কাব্যরস হইয়াছে সেই বস্তু, ইংরেজীতে যাহাকে বলে grotesque ও bizarre ; একটা দুর্জ্জ্ঞেয়-ভীষণ অনৈসর্গিক ভাবের ঘটনা ও চরিত্রসৃষ্টিতে, ঐ তান্ত্রিক কাপালিক ও তাহার ক্রিয়াকলাপে, সেই রস সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়াছে। ইহাও লক্ষণীয় যে, এই কাহিনীর আরম্ভ হইয়াছে যেরূপ ভীষণ-গম্ভীর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে—শেষও হইয়াছে প্রায় অনুরূপ প্রতিবেশে।

২. ইহার রোমান্টিক ভাবমণ্ডল, তথা নাটকীয় অবস্থাসঙ্কটকে ঘনীভূত করিয়াছে আর একটি কল্পনা-কৌশল—একটা দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি বা ভবিতব্যের অবতারণা ; ইহাও ট্র্যাজেডি-রসকে পুষ্ট করিবার একটি প্রকৃষ্ট কৌশল, ইহাও একপ্রকার দুর্জ্জ্ঞেয়তার রহস্য-রসে পাঠকের চিত্ত অভিভূত করে। শেকস্পীয়ার তাঁহার বড় নাটকগুলিতে প্রায় সর্ব্বত্র এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন—কোথাও দৈবজ্ঞের ভবিষ্যৎ-বাণী, কোথাও নায়ক বা নায়িকার চিত্তে অজ্ঞাত-বিপদের আশঙ্কা, কোথাও স্বপ্নদর্শন, কোথাও বা প্রেতমূর্ত্তি বা ডাইনী প্রভৃতির আবির্ভাব। 'কপালকুণ্ডলা'র কবিও সেইরূপ কলা-কৌশলের সুযোগ লইয়াছেন। উহার মূলে কোন বিশ্বাস বা মতবাদের প্রতিষ্ঠা নাই (পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য)।

৩. এ কাব্যের কল্পনামুখে কয়েকটি দ্বন্দ্ব (contrast ও antithesis) প্রচ্ছন্ন-ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে ; একাধারে একপ্রকার দ্বন্দ্বের ব্যঞ্জনা ইহার ভাবৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রথমতঃ, প্রকৃতি ও সমাজ—এই দুইয়ের মূলগত বিরোধ এই উপন্যাসে নানারূপে প্রকাশ পাইযাছে, শুধুই প্রতিকূল নয়—অনুকূল সম্বন্ধের আভাসও আছে। কাপালিক-চরিত্রে মানবপ্রকৃতির বিকার যেমন তাহার লাঞ্ছনার কারণ হইয়াছে, তেমনই, কপালকুণ্ডলায় সেই প্রকৃতি স্বাভাবিক মানবিকতাকে লঙ্ঘন করিয়াই, সমাজ-ধর্ম্মের উপরে আধ্যাত্মিক প্রকৃতি-ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়াছে। এখানে প্রকৃতি ও সমাজের মুখামুখি বিরোধ। কপালকুণ্ডলা ও কাপালিক এবং কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের মধ্যে লেখক আর একটি বিরোধ বা বৈসাদৃশ্যের স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন—তাহা নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত পার্থক্য। আরও কয়েকটি দ্বন্দ্বের আভাস ইহাতে আছে ; যেমন মতিবিবি ও কপালকুণ্ডলা যেন দুই সম্পূর্ণ বিপরীতের—একটি ত্যাগ ও অপরটি ভোগের—প্রতীক। এতদ্ভিন্ন, দৈব ও পুরুষকার, বুদ্ধি ও কুসংস্কার প্রভৃতি নানা বিপরীত-বোধের উপকরণ ইহাতে আছে। প্রেমেরও দুই বিপরীত রূপ ইহাতে স্থান পাইয়াছে—একটি সমাজবিরুদ্ধ, স্বাভাবিক বা প্রকৃতিসঙ্গত ; অপরটি সামাজিক-সংস্কার শাসিত ; কবি ইহার কোনটিকে ক্ষুদ্র করেন নাই বলিয়া এই দ্বন্দ্ব অতিশয় গভীর ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতিরও দুই মূর্ত্তির দুইরূপ প্রেরণা এই কাব্যের বৈচিত্র্য সম্পাদনা করিয়াছে—একদিকে তাহার রোমান্টিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষরূপ, অপরদিকে ভারতীয় প্রকৃতিতত্ত্বের অধ্যাত্ম-রস।

৪. কাব্যকলার দিক দিয়া অভিনব সৌন্দর্য্যসৃষ্টির মূলেও রহিয়াছে ঐ দ্বন্দ্ব বা contrast। ঐ দ্বন্দ্ব ভাবগত হইলেও, কাব্যের রূপ-কলায় তাহাদের কয়েকটি বড় কাজে লাগিয়াছে। পান্থনিবাসে মতিবিবির আকস্মিক সমাগমে তাহার সেই ঐশ্বর্য্য ও অবস্থার জাঁকজমক দরিদ্র-দম্পতির চিত্রটিকে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়াছে। অতিশয় অনাড়ম্বর পল্লীজীবন-কাহিনীর মধ্যে আগ্রা-দিল্লীর অন্তঃপুর, ও আমীর-ওমরাহের বাদশাহী বিবরণ অতিশয় চমকপ্রদ হইয়াছে। চরিত্র-চিত্রণেও মতিবিবি ও মেহেরউন্নিসা এবং কপালকুণ্ডলা ও শ্যামাসুন্দরী যেন দুই বিভিন্ন জগতের অধিবাসী—এজন্য তুলনায় তাহাদের মূর্ত্তিগুলি অতিশয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

৫. উপন্যাসের প্রতি পরিচ্ছেদের শিরোদেশে যে একটি করিয়া কবি-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, এ কাব্যের রসপুষ্টির পক্ষে তাহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হইবে। এই কলা-কৌশলটি বঙ্কিমচন্দ্র স্কটের (Sir Walter Scott) উপন্যাস হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। উহার দ্বারা প্রত্যেক পরিচ্ছেদের ঘটনা যেন একটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে—যেন এইরূপ ঘটনা একটা শাশ্বত নিয়মেই ঘটিয়া থাকে, অন্যত্রও এমনই ঘটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আর কোন উপন্যাসে এই কৌশল অবলম্বন করেন নাই, তাহাতে মনে হয়, তিনি ঐ কৌশলটিকে একমাত্র এই কাব্যের বড়ই উপযোগী মনে করিয়াছিলেন। উহাও এই কাব্যের রোমান্স-রসকে গাঢ়তর করিয়াছে। এই উদ্ধৃত বচনগুলি যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনই সুপ্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের প্রাসঙ্গিক ভাব-সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

৬. কিন্তু এই কাব্যের সর্ব্বাধিক কাব্যগুণ—তাহার দৃপ্ত কবিত্ব, কল্পনার দিব্যস্ফূর্ত্তি। প্রথম হইতেই সে কল্পনা একমুখে ও সমান গর্ব্বিমায় অগ্রসর হইয়াছে ; কাব্যে যাহা ক্রমে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সেই ভাব-সৌন্দর্য্যের আবেশ কবি-চিত্তকে যেন সহসা একটা জ্যোতিঃ-দর্শনের মত চমকিত করিয়াছে। এইজন্য এ কাব্যের unity of inspiration এমন লক্ষণীয়। যে-সৌন্দর্য এবং যে ভাববস্তুকে কেন্দ্র করিয়া এই কাহিনী আরব্ধ ও সমাপ্ত হইয়াছে, কবি প্রথমেই তাঁহার সেই অবাস্তব-রমণীয় মানসীপ্রতিমাকে যেরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে এবং পরিপূর্ণ মহিমায় আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত করিয়াছেন, তাহাতেই সমগ্র কাব্যখানির রসরূপ-মুহূর্ত্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। কপালকুণ্ডলার সেই যে প্রথম আবির্ভাব, তাহাতেই তাহার আদি ও শেষ পরিচয় রহিয়াছে—গ্রন্থের শেষ দৃশ্যে আমরা সেই অপার্থিব মনোহর কাব্যকুসুমটিকে তাহার সেই এক স্বভাবের বশেই ঝরিয়া পড়িতে দেখি। অতএব, কপালকুণ্ডলার ঐ প্রথম আবির্ভাব-দৃশ্যটি কেবল কবি-কৌশলই নয়, উহা কবি-শক্তির অতি তীক্ষ্ণ, একাগ্র, একমুখী কল্পনার নিদর্শনও বটে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, সেই আবির্ভাব দৃশ্যের যে বর্ণনা, সেই প্রতিমা ও তাহার পট-ভূমিকা, এবং তৎসহ জড়প্রকৃতি ও মানবচৈতন্যের যে সুর-সঙ্গতি কবির দিব্য ভাবাবেশের পরিচয় দিতেছে তাহা শুধুই এই কাব্যের নয়, জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্যের গৌরবস্থল। বঙ্কিমচন্দ্রের কবিশক্তির আরও দুইটি অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন এই উপন্যাসে

আছে—একটি, দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষ দৃশ্যে ("প্রদীপ নিবিয়া গেল"); আর একটি, "আমি পদ্মাবতী" এই উক্তির স্থান, কাল ও পাত্র-যোজনায় (তৃতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ); উভয় ক্ষেত্রেই নাটকীয় কল্পনা ও কাব্য-কল্পনার চূড়ান্ত মিলন ঘটিয়াছে।

৭. এ কাব্যের আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ—ইহার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি-প্রেম; এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-প্রীতির নিদর্শন প্রায় সর্ব্বত্র পাওয়া যাইবে। এমন কথাও বলা যাইতে পারে যে, লেখকের সেই প্রকৃতি-প্রেমই, গভীরতর তত্ত্বের আকারে মানব-জীবন-ব্যাপারকেও গৌণ করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের দেশীয় সাহিত্যে, ইহার পূর্ব্বে এই ধরণের প্রকৃতি-প্রেম কোথাও লক্ষিত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র যে ইংরেজী কাব্য-সহিত্যের—বিশেষ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর সেই রোমাণ্টিক কাব্য-মন্ত্র—অতি গভীরভাবে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন—এই উপন্যাসের শুধু ভাব-কল্পনায় নয়, প্রাকৃতিক চিত্রাঙ্কনেও তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। ইহাতে প্রাকৃতিক দৃশ্যের যে বর্ণনাগুলি আছে তাহা হইতেই ঐ রোমাণ্টিক প্রকৃতি-প্রেমের লক্ষণ বুঝিতে পারা যাইবে। প্রাচীন কবিগণ যে প্রকৃতি-বর্ণনা করিতেন তাহা বিশেষ (particular) না হইয়া সামান্য (general) সৌন্দর্য্যের চিত্র হইত; নব্য কবিগণের প্রকৃতি-প্রেম আরও গভীর ও বাস্তব বলিয়া, তাঁহারা প্রকৃতি-রূপসীর প্রতি অঙ্গের বিচিত্র বিশিষ্ট শোভা মুগ্ধ-দৃষ্টিতে আবিষ্কার ও উপভোগ করেন—প্রিয়তমার গণ্ডে তিল-চিহ্নের মত, সামান্য সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তে বিশেষ সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হন। এজন্য প্রাকৃতিক দৃশ্যবর্ণনার বিষয়ে রোমাণ্টিক কবিগণকে এক অর্থে Realist বা বস্তুনিষ্ঠ বলিতে হইবে। একজন বড় ইংরেজ সমালোচক ইহার নাম দিয়াছেন—'Sentiment of Reality', কারণ এইরূপ রোমাণ্টিক প্রকৃতি-বর্ণনায়—

"We find shape and identity perceived with a magical precision and delicacy, the mind fastening as it were with a peculiar intensity of vision upon any counterpart in the visible world of what it has imagined with delight."

'কপালকুণ্ডলা'র কাব্যলক্ষণ-বিচারে এই গুণটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে, প্রাকৃতিক বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের এই প্রকার রস-সংবেদনা ইতিপূর্ব্বে বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এত বড় স্থান অধিকার করে নাই। এই প্রসঙ্গে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে—প্রথম দিকের রচনাগুলিতে, এবং এই কাব্যে—নায়িকার রূপবর্ণনা-রীতিও উল্লেখযোগ্য।

৮. উপন্যাস-রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব দুই একটি রীতিও অনুধাবনযোগ্য। কাহিনীর কথন (narration)-এর মধ্যে তিনি নিজেই উপযাচক হইয়া স্থলবিশেষের ব্যাখ্যা করেন; কোথাও পাত্রপাত্রীর মনোগত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, কোথাও বা ঘটনার সম্ভাব্যতা নিজেই পাঠকচিত্তে সুস্পষ্ট করিয়া তোলেন। নাট্যকাব্যের তুলনায় উপন্যাস-লেখকের সে বিষয়ে যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকিলেও, এইজাতীয় উপন্যাসে,

লেখক কাহিনী হইতে যতদূর সম্ভব নির্লিপ্ত থাকিলেই ভাল হয় ; পাঠককে যেটুকু সাহায্য করিবার প্রয়োজন তাহার অধিক যেন না হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র, শুধু সেইটুকু সাহায্যই নয়—পাঠকের গুরুগিরিও করিয়া থাকেন। তথাপি এই ব্যাখ্যা ও বক্তৃতাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাহিনীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে ; গ্রীক নাটকের কোরাস (Chorus) এবং রোমাণ্টিক নাটকের 'স্বগতোক্তি' যে কাজ করিয়া থাকে, বঙ্কিমচন্দ্র উহার দ্বারা সে কাজও কতকটা করাইয়াছেন।

৯. এই উপন্যাসে কাহিনীর জগৎ নিত্য-পরিচিত জগৎ হইতে যতই উর্দ্ধে অবস্থিত হউক, যেন সেই কারণেই, বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তব-জগতের দৃঢ়ভূমি কিছুতেই ত্যাগ করিবেন না, তাই ক্ষুদ্র হইলেও এমন কয়েকটি চরিত্র, এবং ফাঁকে ফাঁকে এমন দুই একটি ঘটনা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, যাহাতে আমাদের বাস্তব-চেতনা বা কাণ্ডজ্ঞানও (common sense) জাগরূক থাকে ; আবার সেই সকল হইতেই তিনি যে হাস্যরসের সৃষ্টি করেন তাহাই কোথাও বা উৎকৃষ্ট হিউমার (humour), কোথাও বা বাস্তব-জীবনের সুনিপুণ ভাষ্যরূপে (criticism of life), আমাদের চিত্তের ভার-সাম্য রক্ষা করে। ইহাও উৎকৃষ্ট কবিশক্তির লক্ষণ।

'কপালকুণ্ডলা'র ভাষাও এই উপন্যাসের কল্পনা বা ভাবমণ্ডলের অতিশয় উপযোগী হইয়াছে—এ ভাষা এ কাব্যের নিজস্ব ভাষা, এজন্য উহাও কাব্যকলার দিক দিয়া সার্থক হইয়াছে। বাংলা গদ্যের অপরিণত রীতিকে এত বড় কাব্যের বাহন করিবার যে দুঃসাহস তিনি করিয়াছিলেন—শব্দ-যোজনা ও বাক্য-নির্ম্মাণের বহু বিঘ্ন সত্ত্বেও, তাহা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে ; অবাধ্য বাক্য-রীতিকেও বশীভূত করিয়া তিনি যে অপূর্ব্ব ষ্টাইল নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহাই প্রকৃত প্রতিভার নিদর্শন। ইতিপূর্ব্বে মধুসূদনও তাঁহার মহাকাব্যের উপযোগী ভাষা নিজেই সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন , তাহা যে অনবদ্য হইয়াছিল, সেও প্রতিভার গুণে ; তথাপি তাঁহাকে গদ্যের জটিলতর বাক্য-রীতি আয়ত্ত করিতে হয় নাই। 'কপালকুণ্ডলা'র ভাষায় সংস্কৃত বাক্‌ভঙ্গির যে প্রাধান্য দেখা যায় তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত আদর্শ এবং কাব্যের প্রয়োজন, দুই-ই মিলিয়াছে। এই কাব্যের ভাষার পারিপাট্যের অভাব সত্ত্বেও তাহা যে এমন রসোজ্জ্বল ও প্রকাশক্ষম হইয়াছে, ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, উৎকৃষ্ট কবিশক্তি বা সৃষ্টি-প্রতিভা যাঁহাদের আছে তাঁহাদের রচনায় ভাষার রীতিটাই বড় নয়, ষ্টাইলটাই বড় ; এই ষ্টাইল যদি সত্যকার বড় ষ্টাইল হয়—অর্থাৎ তাহার মূলে যদি অতি উচ্চ ও অনন্যসুলভ কবিদৃষ্টির প্রেরণা থাকে, এবং ভাষা যদি তাহারই ছাঁচে ঢালা হয়—তবে সর্ব্বপ্রকার রীতিকে লঙ্ঘন করিয়াই ভাষা আপনাকে গৌরবান্বিত করে।

* * *

'কপালকুণ্ডলা'র কাব্য-পরিচয় শেষ করিলাম। সর্ব্বশেষে, এই উপলক্ষ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-প্রতিভার সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বলা আবশ্যক। আমি ইতি-পূর্ব্বে নানা প্রসঙ্গে এবং একাধিক প্রবন্ধে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে কয়টি উৎকৃষ্ট প্রতিভার উদয় হইয়াছে, তাহাদের

মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এক হিসাবে যে শীর্ষস্থানীয় এমন কথা বলিলে তাহা অত্যুক্তি হইবে না; তথাপি উপন্যাস-রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যে সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাংলা কাব্য-সাহিত্যেও অতুলনীয় কেন, সে বিচার সংক্ষেপে করিবার নয়; আমি সেই সৃষ্টিশক্তির কয়েকটি লক্ষণমাত্র এখানে নির্দ্দেশ করিব। সেই প্রতিভা যে কত উচ্চ শ্রেণীর, তাহা এই একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাসের কাব্যপরিচয় হইতেই আশা করি সকলের উপলব্ধি হইবে। এই কাব্যেও কবিকল্পনা কত দূরান্তরে এবং কত বিভিন্ন দিকে বিচরণ করিয়াছে। এই সামান্য কাহিনীর ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যেই জীবন ও জগতের কত তত্ত্ব, কত রহস্য উঁকি দিতেছে! একটি ক্ষুদ্র হীরকখণ্ডের মত ইহাকে একটু ঘুরাইলেই তাহা যেন শতমুখে শতরশ্মি বিকিরণ করে। সে রহস্যের অন্ত নাই, কারণ তাহা সৃষ্টিরহস্যের অঙ্গীভূত। যিনি এই কাব্য-সৌধের যত ভিতরে প্রবেশ করিবেন, তিনি ততই নূতন নূতন কক্ষ আবিষ্কার করিবেন, কত নূতন অনাবিষ্কৃত তলদেশ ও উচ্চশিখর তাঁহার বিস্ময় বৃদ্ধি করিবে। আমি যে দিক দিয়া যে আলোচনা করিয়াছি তাহাও সম্পূর্ণ নয়—আরও কত দিক আছে—সৌন্দর্য্যের কত অলক্ষ্য সঙ্কেত রসিকচিত্তকে পর্য্যুৎসুক করিয়া তুলিবে। ইহাই শ্রেষ্ঠ কাব্য বা Great Art-এর লক্ষণ; তাই এইরূপ কাব্যেই সাহিত্য-সমালোচনার পূর্ণতম অবকাশ আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির প্রধান কাব্যলক্ষণ কি? সে কাব্য সৃষ্টির মতই স্বয়ম্প্রকাশ; অর্থাৎ, কাব্যের অন্তরালে কবিকে আবিষ্কার করিয়া, পরে সেই কবি-চিত্তের আলোকে এ কাব্য পাঠ করিতে হয় না। বরং কবিকে ভুলিয়া গিয়া কাব্যকেই দেখিতে হয়; সে কাব্যের রস-রহস্য এমনই যে, কবিও তাহাতে হারাইয়া তলাইয়া গিয়াছেন; সে যেন আপন সত্যে আপনি প্রতিষ্ঠিত; আপন রহস্যে আপনি সম্পূর্ণ। তাই এমন কাব্যের রস-বিচারে, সমালোচকের নিজস্ব অনুভূতির নবতম স্পর্দ্ধা প্রচার করিবার সুযোগ নাই; কাব্যগত নব নব বস্তুরই আবিষ্কার করিতে হয়, এবং তাহা, কবি-মানসের নয়—জগৎ ও জীবনেরই গভীরতর ব্যাখ্যার রূপ ধারণ করে। জীবনেও যেমন, কাব্যেও তেমনই—সেই রহস্য আমাদের সাক্ষাৎ দৃষ্টিগোচর হয়। এর যে সৃষ্টিকর্ম্ম, ইহা লিরিক-কবির আয়ত্ত নহে। কাব্যের আদর্শভেদ ও রসিকের রুচিভেদ থাকিতে পারে এবং আছেও; কিন্তু আজিও শ্রেষ্ঠ সমালোচকের মতে শেকস্পীয়ারই শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি যথার্থ 'সৃষ্টি' করিয়াছেন, তাঁহার সৃষ্ট নর-নারী ভাগবতী সৃষ্টির মতই বাস্তবের সুগভীর রহস্যে রহস্যময়। ঐ সৃষ্টি-প্রতিভাই শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। আমাদের সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রই কতক পরিমাণে সেই প্রতিভার অধিকারী; সেই জন্যই শেকস্পীয়ারের নাটকগুলির রস-বিচারে সমালোচনা-কর্ম্ম যেরূপ গভীর ও দূর-প্রসারী হইবার অবকাশ পাইয়াছে, একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেই বাংলা কাব্যসমালোচনা সেই অবকাশ পাইতে পারে।

এই যে সৃষ্টিধর্ম্মী কল্পনা; ইহার মূলে আছে সমগ্র-দৃষ্টি, তাই—ইংরেজীতে যাহাকে analytical বলে সে প্রবৃত্তি ইহাতে নাই; চরিত্র, প্লট—সকলই একটি

কেন্দ্রগত রহস্যে এমনই অঙ্গাঙ্গীভাবে সুসম্বদ্ধ হইয়া সেই কল্পনায় ধরা দেয় যে, কবিকে যেন কোন চিন্তাই করিতে হয় না, যতকিছু কার্য্য-কারণ-জিজ্ঞাসা, যতকিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সেই সৃষ্টিকর্ম্মের অন্তর্নিহিত (implicit) হইয়াই আছে। এইজন্য এরূপ কাব্যের নির্ম্মাণ-কৌশল প্রাকৃতিক নির্ম্মাণ-কৌশলের মতই সমালোচকের বিস্ময় উৎপাদন করে। সেই কলা-কৌশল যতই ভেদ করা যায়, ততই মনে হয়, কবি যেন তাহা সজ্ঞানে, অতি সাবধানে প্রয়োগ করেন নাই—কল্পনার পূর্ণ আবেশে, উপন্যাসের চরিত্রগুলিও যেমন, তাহাদের ঘটনাধারাও তেমনই, আপনা-আপনি বিকাশ লাভ করিয়াছে; কবির নিজের কোন ভাবনা নাই। পরে পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, কোথাও প্রকৃতি বা মানব-চরিত্রের গূঢ়তর নিয়ম লঙ্ঘিত হয় নাই; ঘটনার কার্য্য-কারণ এমনই অচ্ছেদ্য, এবং চরিত্রগুলির উপরে তাহার ক্রিয়া এমনই স্বাভাবিক—এবং সর্ব্বোপরি উপন্যাসের সকল অংশ ও উপকরণ এমনই একটা মূলসূত্রে অঙ্গাঙ্গীভাবে গ্রথিত যে, তাহাদের কোনটাকে অপর হইতে পৃথক করিয়া দেখা যায় না। ইহাকেই উৎকৃষ্ট সৃষ্টিকর্ম্ম বলে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'তেও এইরূপ সৃষ্টিশক্তির লক্ষণ আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আরও বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, তাহার চরিত্র-বিভাবনা (conception) এবং আখ্যানমুখে তাহার যে বিকাশ (growth বা development) এই উভয়ই নাটকীয় প্রেরণার অনুবর্ত্তী; এইজন্য সেই চরিত্রগুলিকে, ঘটনায়, কার্য্যে এবং কথায় বুঝিয়া লইতে হয়—ভিতরের রহস্য বাহির হইতেই অনুমান করিতে হয়। এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এরূপ কাব্যে কবির নিজেরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যেমন আবশ্যক হয় না, তেমনই, সেরূপ ব্যাখ্যা বা মন্তব্য মূলকাব্যের সৃষ্টি-ক্রিয়া ব্যাহত করিতে পারে না। ইহার ফলে, উপন্যাসগত মানব-মানবীকে আমরা বিধাতার সৃষ্টির মতই অতিশয় স্বপ্রতিষ্ঠ বলিয়া মনে করি—মানব-জীবনের যে-রহস্য, সেই রহস্যই তাহাদিগকে রহস্যময় করিয়া তোলে, সমালোচনারও শেষ হয় না। কাব্য-রচনার এই ভঙ্গিকেই কবি-কল্পনার objectivity বা আত্মভাব-নিরপেক্ষ বস্তুরস-পরায়ণতা বলে; 'বস্তু' অর্থে বহিঃসৃষ্টির যাহা-কিছু। ইহাই খাঁটি নাটকীয় কল্পনা; আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে এরূপ কল্পনার যতটুকু প্রসার দেখা যায়, তেমন আর কোথাও নয়। লিরিক বা subjective কবি-কল্পনা ইহার ঠিক বিপরীত; আমাদের সাহিত্যে এই কল্পনার প্রসারই সমধিক—আমাদের শ্রেষ্ঠ কাব্যসম্পদ লিরিক বা গীতিধর্ম্মী। এইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের কবি প্রতিভা এ সাহিত্যের পক্ষে কিছু অসাধারণ।

'কপালকুণ্ডলা'র আখ্যান-নির্ম্মাণে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই প্রতিভার একটি নিদর্শনমাত্র উল্লেখ করিয়া এই আলোচনা শেষ করিব। ঐরূপ কবিদৃষ্টি—ঐরূপ objective কল্পনা ব্যতিরেকে, কাহিনী, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতির মত কাব্য-রচনায় সৃষ্টি-রহস্যের উদ্ঘাটন হয় না। সেই কল্পনার সেই দৃষ্টিই জীবনের তুচ্ছতম ঘটনাকেও সমগ্রের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট দেখে; আবার, প্রাকৃতিক শক্তির সহিত মনুষ্য-জীবনের যে যোগ অহরহ ঘটিয়া থাকে, তাহাও যে সেই জীবনের নিয়ন্তা—

দৃষ্টিমাত্রে তাহা বুঝিতে পারে। তাই, বঙ্কিমচন্দ্র, ইংরাজীতে যাহাকে 'chance' বলে, সেই দৈব-সংঘটনাকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। Chance আর কিছুই নহে—দুইটি ভিন্নমুখী কার্য্যকারণ-ধারা যখন কোন এক লগ্নে পরস্পর মিলিত হয়, তখন যাহা ঘটে, তাহাই Chance, বা সংঘটন। 'কপালকুণ্ডলা'র প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই এইরূপ একটি সংঘটনা—সেই অকস্মাৎ নদীতে জোয়ার আসাই—সমগ্র কাহিনীর ভিত-পত্তন করিয়াছে। এই ঘটনাটি না ঘটিলে, কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার উভয়ের জীবন সম্পূর্ণ ভিন্নপথে পরিণতি লাভ করিত, এবং হয়ত তাহাতে কিছুমাত্র রোমান্সের অবকাশ থাকিত না। ইহা চিন্তা করিলে বিস্ময় বোধ হইবে। কিন্তু ঐ ঘটনাটি যে আদৌ অস্বাভাবিক বা অবাস্তব নয় এবং এইরূপ একটিমাত্র ঘটনাই যে মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণ শাসিত করিয়া তাহার সুখ-দুঃখের নিয়ামক হইতে পারে—কবি বঙ্কিমের এই দৃষ্টি যে সেই সমগ্রদৃষ্টির বা জীবনরহস্য বোধের অন্তর্ভূর্ত, এই কাহিনীর সমগ্র ঘটনাধারা তাহাই প্রমাণ করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অপরাপর উপন্যাসেও এই chance, ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানারূপে মানব-ভাগ্যের তথা জীবন-কাহিনীর একটা বড় দিক অধিকার করিয়া আছে।[১] অথচ ইহা অদৃষ্টবাদ নয়, ইহা যেন সৃষ্টির মূল নিয়মের সঙ্গেই মানব-জীবনের একটা স্বাভাবিক গ্রন্থি; ইহার কোন ব্যাখ্যা নাই, কোন কারণ-নির্দেশ নাই; এইজন্যই ইহা জীবনকে এমন রহস্যময় করিয়া তোলে। মানব-জীবনের যিনি শ্রেষ্ঠ কাব্যকার সেই শেকস্‌পীয়ারের মত, বঙ্কিমচন্দ্রও কেবল ইহাকে দেখিয়াছেন মাত্র; তাহার রহস্য-রসে তিনিও যেমন অভিভূত হইয়াছেন, তাঁহার অপূর্ব্ব কবিপ্রতিভার বলে তেমনই আমাদিগকেও তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছেন। জীবনের কেবল বাস্তব প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান রূপই নয়, তাহার উর্দ্ধতম শিখর ও নিম্নতম তলদেশ—লক্ষ্য ও অলক্ষ্য, বস্তুগত ও ভাবগত, যুক্তিগ্রাহ্য এবং যুক্তিরও অগ্রাহ্য—সর্ব্বাঙ্গীণ রূপটি, যে-কবি আমাদের যতখানি অনুভূতিগোচর করিতে পারেন তিনিই সেই হিসাবে তত বড় কবি; সেই কবির কাব্যই সুগভীর সৃষ্টি-সত্যে অনুপ্রাণিত। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় সেই স্পর্শমণির স্পর্শ আছে, তাই তাঁহার কাব্যগুলিতে মানব-জীবন-কাহিনীর একটি অভিনব রস-সংবেদনা আমাদিগকে এমন উৎকণ্ঠিত করে।

আষাঢ়, ১৩৫৪

বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-জীবন

১

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-বৃত্তান্ত আমরা প্রায় কিছুই জানি না, তথাপি তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় কিছু কম আছে বলিয়া মনে করি না ; বরং এরূপ প্রত্যক্ষ জীবন্ত পরিচয় একালের আর কোন লেখকের সঙ্গে ঘটে নাই। ইহার কারণ, লেখার মধ্যেই মানুষটি অতি সুস্পষ্ট আকারে বিরাজ করিতেছে—তাহার আকৃতি প্রকৃতি ও কণ্ঠস্বর অতিশয় অভ্রান্তভাবে ধরা দিয়াছে। তাই জীবন-বৃত্তান্তের অভাব—অন্য যে কোন কারণেই অনুভব করি না কেন, আজ তাঁহার তিরোধানের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরেও বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে আমরা জীবিত-দর্শনের মতই দর্শন করি, সে মানুষ যেন তাহার বিরাট ব্যক্তিত্ব লইয়া আমাদের চোখের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইহার কারণ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর মধ্যে অতি বিশুদ্ধ ভাব-চিন্তা বা কেবল কবিজনসুলভ কল্পনারই অভিব্যক্তি ঘটে নাই ; নিজের দেহমনপ্রাণের গভীর ব্যক্তিগত উপলব্ধিই সেই রচনাকে প্রাণবন্ত করিয়াছে—ভাবুকের ভাব-বিলাস বা শিল্পিজনোচিত কলাকুতূহল চরিতার্থ করিবার জন্যই তিনি কুত্রাপি লেখনী ধারণ করেন নাই। অথচ তিনি একজন খুব বড় কাব্যস্রষ্টা কবি—বঙ্কিম-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ইহাই। নিজের ব্যক্তিগত ও বস্তুগত জীবন-চেতনাকে লঙ্ঘন না করিয়া তিনি যে ভাব-চিন্তার অধিকারী হইয়াছিলেন, এবং আত্ম-পরীক্ষিত বলিয়া যাহার সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়াছিলেন তাহাই সাহিত্যের আকারে অকপটে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মত ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ আত্মপ্রচার সাহিত্যের পক্ষে বড়ই সুফলপ্রদ হইয়াছে, আমরা সে রচনায় কেবল কতকগুলি উৎকৃষ্ট ভাব-চিন্তা নয়—সেই সকলকে আশ্রয় করিয়া একটি অতিশয় জীবন্ত ও শক্তিমন্ত পুরুষের অন্তরতম স্বরূপ ব্যক্ত হইয়া উঠিতে দেখি।

জীবনবৃত্তের সাহায্যে আমরা মৃত ব্যক্তির পরিচয় পাইয়া থাকি, জীবিত ব্যক্তিরও জীবন-বৃত্তের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তেমন সুলিখিত জীবনবৃত্ত দুর্লভ, যাহার দ্বারা আমরা মানুষটিকে ঠিক চিনিয়া লইতে পারি। কারণ, জীবন-চরিত ও ইতিহাস এক নয়—মানুষের জীবন অঙ্কিত করা, আর কালের গতি-প্রবাহের অঙ্কপাত করা এক কাজ নহে। বাহিরের সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও সুনিপুণ ভাবে যোজনা করিলেও ভিতরের মানুষটি অনুমানসাপেক্ষ হইয়াই থাকিবে ; ঘটনাগুলিকেও ছোট বড় নানা আকারের রেখার মত করিয়া মানুষের আলেখ্য রচনা করিতে হইলে যে তূলিকার প্রয়োজন, সে তূলিকা কাহার হাতে আছে ? —যাহা একাধারে ব্যক্ত ও অব্যক্ত, বাস্তব ও কল্পনা-সাপেক্ষ তাহাকে কোনও কঠিন রেখা-বেষ্টনীর মধ্যে ধরিতে পারা অসম্ভব। তাই, কোন মানুষের সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা—সে ধারণা যতই ঘটনা-প্রমাণসিদ্ধ হউক, শেষ পর্যন্ত তাহা

কতকগুলি সাধারণ চিন্তা বা সংস্কারের দ্বারাই গঠিত হইয়া থাকে, ব্যক্তিকে আমরা সাধারণের কোঠায় টানিয়া আনিতে বাধ্য হই। এই জন্য মানুষের বাহ্যজীবন বা কীর্ত্তিকলাপ হইতেই যেখানে তাহাকে বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন বা সুবিধা থাকে, সেখানেই চরিত-গ্রন্থের কিছু মূল্য আছে; কিন্তু যে মানুষ প্রধানত অন্তর্জীবনই যাপন করিয়াছে, তাহার জীবন-চরিত-রচনা একরূপ অসাধ্য বলিলেই হয়।

অনেকে আত্মজীবন-চরিত রচনা করিয়া বাহিরের মানুষকে নিজের অন্তরের দিক দেখাইয়া থাকেন। এরূপ আত্মজীবন-চরিতও নির্ভরযোগ্য নহে; কারণ মানুষের নিজের সম্বন্ধে নিজের যে ধারণা, তাহাতে অতি সূক্ষ্মভাবেও আত্মাদর বা আত্মম্ভরিতা, এবং সেই সঙ্গে আত্মগোপনের প্রয়াস থাকাই স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া, পরে যেমন আমার সম্বন্ধে নানা ভুল ধারণা করিতে পারে, আমারও তেমনই আমার সম্বন্ধে ভুল হইবার সম্ভাবনা আরও অধিক। অতএব আত্মচরিত-লেখক যদি ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠার সহিত নিজের অন্তরের ঘটনা বিবৃত করেন, তথাপি সেই ঘটনাগুলির মাত্র মূল্য আছে, তাহার ভাব-অংশ পরিত্যাগ করিয়া তথ্য অংশটুকু জীবনীকারের কাজে লাগিবে; কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য ঐ অপর ব্যক্তির সহানুভূতি ও বিচার-বুদ্ধিই শেষ পর্য্যন্ত ভরসা। আত্মচরিতে লেখক নিজ জীবনের যে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন—বহির্গত ঘটনা ও বাহিরের সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার যে মত ও মনোভাব প্রকাশ করেন, তাহার মূল্যই অধিক; নিজের সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহাও তাঁহার একটা মত বা মনোভাব মাত্র, সাক্ষাৎ আত্মপরিচয় তাহাতে নাই।

কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষের আত্মপরিচয় তাঁহাদেরই জবানিতে আমরা এক বিচিত্র উপায়ে পাইয়া থাকি। বঙ্কিমচন্দ্রের মত কবি-ঔপন্যাসিক যে ধরণের উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, তাহাতে লেখক উপন্যাসের জবানিতে অনেক পরিমাণে আপনারও অন্তর্জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কবিমাত্রেরই কাব্যে যে আত্ম-প্রতিবিম্ব থাকে, আমি সেইরূপ আত্মপ্রকাশের কথা বলিতেছি না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে একটি জীবন্ত পুরুষের দেহমন-প্রাণের প্রতিকৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ যেন একটি ব্যক্তি তাহার রচনার ভিতর দিয়াই জীবনের সর্ব্ববিধ উৎকণ্ঠা ভোগ করিয়াছে; আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক যত কিছু ঝড়ঝঞ্ঝার মুখে আপনার প্রাণকে স্থাপনা করিয়া স্থিরদৃষ্টিতে তাহার অবস্থান্তর ও রূপান্তর নিরীক্ষণ করিতেছে; এবং আত্ম-চরিত্রের যত কিছু দুর্ব্বলতা ও রিপুপারবশ্য স্বীকার করিয়া জীবনের অতি দুরূহ সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছে। ইহাও জীবন—ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে এইরূপ আধ্যাত্মিক সঙ্কট ও অন্তর-সংগ্রাম কম বাস্তব নহে; কারণ ইহারও মূলে আছে, বাস্তবজীবনের অনুভূতি। তাঁহার সেই চরিত-কথা তাঁহার রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। সেইজন্য সেগুলি অত্যুচ্চ কাব্যকল্পনায় মণ্ডিত হইলেও তাহাদের ভিতর একটি আর্ত্ত-পীড়িত পুরুষ-বীরের কণ্ঠনির্ঘোষ নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে।

২

একালের সাহিত্যে, কাব্যের তো কথাই নাই, উপন্যাসের মত সাহিত্য-সৃষ্টিতেও, আমরা লেখকের যে পরিচয় পাই তাহাতে একটা ব্যক্তি-মানসের সুস্পষ্ট চিহ্ন থাকে ; জীবনের গভীরতর অনুভূতি, বা পুরুষের প্রাণগত উৎকণ্ঠার নিদর্শন প্রায়ই থাকে না। একালের মানুষ অতিমাত্রায় মানস-জীবন যাপন করে। ফলে, আমরা মানুষের দেহাধিষ্ঠিত বাস্তব বেদনাবাসনাময় যে পুরুষ—তাহার স্বরূপ-রসের আস্বাদ সাহিত্যে আর পাই না। উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আমরা মানুষের সেই কাহিনী কাব্যে উপন্যাসে নানা রূপে নানা ভঙ্গিতে রসোজ্জ্বল হইয়া উঠিতে দেখিয়াছি, কিন্তু আজিকার সাহিত্যে সে দৃষ্টি সে কল্পনা নাই—সর্ব্বজনীনতার সেই দেহ-বেদিকা ভাঙ্গিয়া দিয়া ব্যক্তির অহং-সর্ব্বস্ব ভাবনাই এখন যে রসের সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে মানুষকে আর পাওয়া যায় না,—পাওয়া যায় কেবল সূক্ষ্ম কারুকৌশল-ঘটিত এক একটি অভিনব মানস-যন্ত্র। এই Individual বা অহংসর্ব্বস্ব ব্যক্তিত্ব-ঘোষণার প্রসঙ্গে একজন সমালোচক যে আর একটি তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, এখানে তাহার উল্লেখ করিব। নভেল নামে যে কথাশিল্প আধুনিক সাহিত্যের একটি বড় বিভাগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে কবিকল্পনা মানুষের চরিত্র ও মানুষের জীবনকেই বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়াছে—মানুষ-হিসাবেই মানুষের মর্য্যাদাকে স্বীকার করিয়াছে ; ইহাতে প্রথম হইতেই একপ্রকার ব্যক্তিত্বের অভিযান সুরু হইয়াছে। কিন্তু এই যে ব্যক্তি-মানুষ ইহারও দুই রূপ আছে ; এক রূপের কথা আগে উল্লেখ করিয়াছি—সমাজ বা গোষ্ঠীনিরপেক্ষ, সার্ব্বজনীন মানবতার নিয়তিনিয়মচ্যুত, স্বৈরতান্ত্রিক ব্যক্তি ; তেমনই, আপনার মধ্যে কেবল আপনারই নয় সেই সঙ্গে মানব-সংসারের সহজ স্বভাবসিদ্ধ আকুতি ও উৎকণ্ঠা ভোগ করিবার যে সামর্থ্য—সেও আর এক ধরণের ব্যক্তি-প্রতিভা। এই শেষের যে ব্যক্তিত্ব তাহাকে individuality না বলিয়া personality বলা যাইতে পারে। এই personality-কে বাংলায় ব্যক্তি-মানুষ না বলিয়া ব্যক্তি-পুরুষ বলিব। এই যে অপর প্রকার ব্যক্তিত্ব ইহাকে উক্ত সমালোচক বলিয়াছেন—"a single person whose soul-struggle stands for the world-sadness and the world-stress of humanity ... A human soul not merely as a strong demanding individuality but as under stress of such relation to verdict of law and to the rights of fellow mortals as to compel its development into a completed personality"। এখানে humanity, verdict of law এবং rights of fellow mortals প্রভৃতি যে কথাগুলি রহিয়াছে, তাহা হইতেই আমার বক্তব্য বুঝিতে পারা যাইবে। যে জীবনকে আমরা সাহিত্যে গভীর ও সত্য করিয়া উপলব্ধি করিতে চাই তাহা ব্যক্তির ভিতর দিয়াই প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু সে ব্যক্তি যদি ব্যক্তিমাত্রই হয়—সে ব্যক্তিত্ব যতই প্রবল, গভীর ও সূক্ষ্ম হউক—তাহার ভিতর সৃষ্টির নিয়তিনিয়মপীড়িত মানুষের আকুতি যদি প্রকাশের পথ না পায়, তাহারই অন্তর-সংগ্রামে ভোগ ও ত্যাগের প্রবৃত্তি-

বিরোধ যদি সর্ব্বমানবের হৃদয়-কাহিনী হইয়া না উঠে, তবে তাহা এইরূপ completed personality হইতে পারিবে না। সকল উৎকৃষ্ট সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে ইহাই আছে—কবির ব্যক্তিত্ব যখন humanity বা সাধারণ মানব-গোষ্ঠীর সহিত যুক্ত হয়, তখন তাহা নিতান্ত নিজের, তাহাতেই বিশ্বমানবহৃদয়ের স্পন্দন অনুভূত হয়, যাহা অতিশয় আধিভৌতিক তাহাও আধ্যাত্মিক হইয়া উঠে—চক্ষে আশ্চর্য্য দীপ্তি ও কণ্ঠে বাগ্‌দেবতার আবির্ভাব হয়। ব্যক্তির সহিত বহুর এই যে যোগ, ইহার ফলে কবির কাব্য যেমন সর্ব্বমানবের হৃদয়শোণিতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে, তেমনই কবির ব্যক্তি-হৃদয়ের ইতিহাসও তাহাতেই ধরা দিবে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি যে কারণে এমন উৎকৃষ্ট কাব্য হইয়া উঠিয়াছে—সে রচনা এমন কাব্যগুণপ্রধান হইয়াছে, ঠিক সেই কারণেই তাহা কবির অন্তর্জীবনের পরিচয় বহন করিতেছে।

মানুষের জীবনে, শক্তি ও অশক্তির মূলে, একটি কোনও রিপু বা প্রবৃত্তিকে প্রবল হইতে দেখা যায়। যাহার মধ্যে একটা এইরূপ প্রবল প্রবৃত্তির আবেগ নাই, জগতে সে ছায়ার মতন বিচরণ করে, জীবনের সঙ্গে তাহার সত্যকার সাক্ষাৎলাভ ঘটে না। যে কণ্ঠে বিষের জ্বালা ভোগ করে নাই, সে অমৃত হয়তো আঘ্রাণ করিয়াছে—পান করে নাই ; কারণ জীবনকে মন্থন না করিলে অমৃত লাভ হয় না—এবং মন্থনকালে বিষের ভয় করিলে চলে না। এই বিষই সেই রিপু, ইহারই তাড়নায় মানুষ বাসনা-কামনার সমুদ্র মন্থন করিয়া থাকে ; যে দুর্ব্বল সে বিষমূর্চ্ছিত হইয়া তলাইয়া যায়, যে শক্তিমান সে হস্তে অমৃতপাত্র লইয়া উঠিয়া আসে ; যে ক্ষুদ্র সে মন্দবিষের মৃদু উত্তেজনায় মুগ্ধ-জীবন যাপন করে, যে মহৎ সে বিষপাত্র নিঃশেষে পান করিয়াই জ্বালা-নিবারণের জন্য অমৃত সন্ধান করে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে তাঁহার প্রাণমনের যে প্রতিকৃতি অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা করিবার পূর্ব্বে এই কয়টি কথা আপনা হইতে মনে আসিল—এইখানেই তাহা লিখিয়া রাখিলাম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের মনো-জীবনের যে উৎকণ্ঠা তাহা ভাবুকের ভাব-সাধনার মত নহে। জীবনের একটি গূঢ় গভীর উপলব্ধি তাঁহার সকল চিন্তা সকল কল্পনা আচ্ছন্ন করিয়া আছে। কোথায় কি ভাবে কোন্ বয়সে ইহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই ; কিন্তু তাঁহার সাহিত্যিক আদি হইতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। অতিশয় অল্প বয়সে রচিত তাঁহার কবিতাগুলিতে যে একটি কল্পনা বা রস-প্রেরণার উন্মেষ দেখা যায় তাহাও যৌন-আকর্ষণমূলক। তাহাতে অকালপকতার লক্ষণ আছে ; সেই সকল কবিতার কৃত্রিম অলঙ্কার-বাহুল্যের মধ্যেও বালক-কবির যে একটি বিশিষ্ট প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সেকালে কেহ লক্ষ্য করে নাই। উত্তরকালে সেই ধরণের কাব্যচর্চ্চা একে-বারে পরিত্যাগ করিয়া, নবযুগের নব্য কাব্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের যে দিকটিকে তাঁহার কবি-কল্পনার মুখ্য উজ্জীবনরূপে আশ্রয় করিয়াছিলেন, এই কবিতাগুলির মধ্যে তাহার সুস্পষ্ট অঙ্কুর রহিয়াছে। নায়িকারূপিণী নারীর

প্রতি এই যে আসক্তি, ইহাই তাঁহার জীবন-দর্শনের মূলসূত্ররূপে উপন্যাসগুলির সৃষ্টি-কল্পনায় অনুস্যূত হইয়া আছে। নারীই তাঁহার কল্পনা-বিশ্বের বাস্তব ভিত্তি, ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া পুরুষের নিয়তিচক্র কত অভাবনীয় অদৃষ্টপথে আবর্ত্তিত হইয়াছে! পুরুষ ও নারীর-সম্পর্ক-ঘটিত এই যে বিরাট ও জটিল সমস্যা, বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় ইহার শেষ নাই—এই রহস্যকে স্বীকার এবং ইহাকে ভেদ করিয়া—দেহ ও আত্মা, রূপ ও রস, শক্তি ও অশক্তির দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হইবার যে সংগ্রাম, কবি-বঙ্কিমের প্রাণমনের প্রতিভা তাহাতেই স্ফুরিত হইয়াছে; এবং তাহারই ফলে তিনি পুরুষের পুরুষার্থ বিষয়ে যে পরম উপলব্ধিতে পৌঁছিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যে একটি সুপরিপক্ক ফলরূপে দেখা দিয়াছে।

৩

উপন্যাসগুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-চরিত্রের যে মূলগ্রন্থির সন্ধান পাওয়া যায়—তাহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ নানা দিক্ দিয়া করা সম্ভব হইলেও, আমি তাহার যে রূপ নির্দ্দেশ করিয়াছি সে বিষয়ে মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ ছিল পূর্ণ-মনুষ্যত্বের, তাই তাঁহার উপন্যাসের কল্পনাভঙ্গিও যেমন নাটকোচিত, তেমনই তাঁহার নায়কগুলিও পূর্ণাবয়ব পুরুষরূপে কল্পিত হইয়াছে। তাঁহার নিজের জীবনে ও চরিত্রে তিনি ইহার প্রমাণ পাইয়াছিলেন—জীবনের নিম্নস্তরে মানুষের কামনা-বাসনার যে ক্ষুদ্রতা, আত্মস্ফূর্ত্তির যে বাধা, তাহা সে কল্পনার উপযোগী নয়। মানুষের মনুষ্যত্ব-গৌরব কেবল মানুষ বলিয়াই নহে, পরন্তু তাহার মধ্যে যে মহত্তর ক্ষুধা এবং সেই ক্ষুধার বশেই তাহার চিত্তের যে দিব্য উৎকণ্ঠা, তাহাই তাহাকে সৃষ্টির সারভূত করিয়াছে। অতএব পুরুষবিশেষের চরিত্র—সমাজ, বংশ, শিক্ষা প্রভৃতি গুণে সেই পক্ষে যতখানি নির্ভরযোগ্য হইতে পারে, তিনি তাহার উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি ছোট মানুষকে তাঁহার কল্পনায় তেমন আমল দেন নাই বলিয়া মানুষকে ছোট করিয়া দেখেন নাই। এই সকল চরিত্রের যে অন্তর-সংগ্রাম তাঁহার উপন্যাসগুলিতে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রেরই পুরুষমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাঁহারই দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর ও স্থিরদৃষ্টি অক্ষিতারকা সেগুলিকে এমন জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। জীবনের বাস্তব-নিয়তিকে মানুষের দেহাধিষ্ঠিত কামরূপেই তিনি তাঁহার দিব্যদৃষ্টির দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাকে তিনি ছদ্মবেশে লুকাইয়া থাকিতে দেন নাই। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে যে শক্তিকে তিনি খাড়া করিয়াছিলেন, তাহা যেমন ক্ষুদ্র মানুষের আয়ত্ত নয়, তেমনই কামের এই মূর্ত্তিও তাহার ক্ষুদ্র চৈতন্যে ধরা দেয় না।

এইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনা দুরারোহিণী; তিনি মানুষের নিয়তিকে যে দিক দিয়া ধরিতে চাহিয়াছিলেন, যে তত্ত্বের আলোকে তিনি তাহার মুখাবগুণ্ঠন মোচন করিয়াছিলেন, তাহা বীরাচারী তান্ত্রিকের পন্থা; তাহাতে অশক্তির বিশ্বপ্রেম নাই; ডিমোক্রেসির আত্মপ্রসাদ নাই। জীবনকে—যে তাহার তলদেশের পঙ্ক হইতেই

ঊর্দ্ধতম শিখরে তুলিয়া ধরিয়া, এবং সৃষ্টিরহস্যের সহিত যুক্ত করিয়া, তাহার আদি অন্ত নিরূপণ করিতে চায়, তাহার কল্পনা তুচ্ছ ও ক্ষুদ্রকে, সামান্য ও সাধারণকে পরিহার করিবেই—সে অ্যারিস্টোক্র্যাট না হইয়া পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে কবি-কল্পনার এই বিশিষ্ট লক্ষণ বিদ্যমান—কাব্যের মধ্যে কবি-চরিত্রের ইহা একটি সুস্পষ্ট সঙ্কেত।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে যাহারা অবাস্তব কল্পনাবিলাসের রোমান্স মাত্র বলিয়া নাসাকুঞ্চিত করে, তাহারা সাহিত্য-সমালোচনার কতকগুলি পুঁথিগত বুলি আয়ত্ত করিয়াছে; তাহারা জীবনের কোনও একটা সমগ্র সত্যরূপ নিজ চৈতন্য-গোচর করে নাই—কেবল পুঁথির সাহায্যে পুঁথির সমালোচনা করে। তাহারা পর-বাক্যোপজীবী, পর-মতাপহারী, পর-প্রত্যয়াভিমানী; তাহাদের আত্মজ্ঞান নাই। ভিতরের সেই ফাঁকি ঢাকিবার জন্য তাহারা বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতি ও আর্টবাদের শরণাপন্ন হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-বাদের মূলে বাস্তবের যে বেদমন্ত্র রহিয়াছে, সে মন্ত্রকে তিনি যে কেবল ভাবকল্পনার জাল পাতিয়া শূন্য হইতে আহরণ করেন নাই—নিজেরই দেহ-চৈতন্যের অন্তস্তলে, একটি পরমক্ষণে তাহাকে দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, এই মন্ত্রকে ত্যাগ করিবার বা পরিবর্ত্তিত করিবার প্রয়োজন তাঁহার কখনও হয় নাই; ইহা যদি তাঁহার "মর্ম্মে-বিজড়িত-মূল" হইয়া না থাকিত, তবে এত বড় কবি ও মনীষীর জীবনব্যাপী সাধনায় ইহারই সাহায্যে সর্ব্বাঙ্গীণ সিদ্ধিলাভ ঘটিত না। জীবনকে তিনি যে কোনও স্বকল্পিত আদর্শের অধীন করিয়া দেখেন নাই, বরং তাহারই অন্তঃস্রোত-নির্ণয়ে আপনার অন্তঃকরণপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে তাহার অধীন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ—তিনি তাঁহার উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনা-সৃষ্টিতে কত বিষম বস্তুকে স্থান দিতে গিয়া বিপন্ন হইয়াছেন। জীবনকে বা মানুষের চরিত্রকে—যাহারা নিজেদেরই একটা মনোগত আদর্শে শোধন ও সুসংলগ্ন করিয়া দেখে—একটা নীতিজ্ঞান ও মার্জ্জিত রুচির অভিমান যাহারা ত্যাগ করিতে পারে না, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদের কেহ নহেন। এইজন্যই তাঁহার কাব্যে তথাকথিত অবৈজ্ঞানিক তথ্য বর্জ্জিত হয় নাই; অথবা যে সকল আচারপ্রথাকে আমরা একালে দুর্নীতিদূষিত বলিয়া মনে করি বঙ্কিমচন্দ্রও নিশ্চয় করিতেন—যেমন পুরুষের বহুবিবাহ, তাহাকেও তিনি তাঁহার উপন্যাসের নায়ক-স্থানীয় পুরুষ-চরিত্রের সহিত যুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কারণ, তিনি জানিতেন, বিজ্ঞান বা নীতিশাস্ত্র যে নিয়ম বা যে তত্ত্বের আরাধনা করে, জীবনের সত্য তাহা অপেক্ষা গভীর; মানুষ যেখানে জীবনের সহিত বোঝাপড়া করিতেছে—কোনও ভাবগত সত্যের বা গণিতশাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেছে না, সেখানে সম্ভব-অসম্ভব, বাস্তব-অবাস্তব, নীতি-দুর্নীতির যুক্তিসঙ্গত সীমানা রক্ষা করা কঠিন; তাহাতে সৃষ্টির রহস্যকে যেমন অগ্রাহ্য করা হয়, তেমনই মানুষের যে মনুষ্যত্ব সকল অবস্থা ও সকল আচার-প্রথার উর্দ্ধে অনায়াসে উঠিতে পারে, তাহার মহিমা ক্ষুণ্ণ করা হয়। এই যে জীবন, যাহা অপেক্ষা বিস্ময়কর আর কিছুই নাই—সকল গ্লানি, সকল অশুচি-

সংস্কার এবং অক্ষমতার ভিতর দিয়াই যাহা শক্তি ও সৌন্দর্য্যের অভিমুখে, অতিশয় সঙ্কটসঙ্কুল অভিসারে যাত্রা করিয়া চলিয়াছে—বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় সেই জীবনের সেই যাত্রাপথে কখনও পথভ্রষ্ট হয় নাই; বরং সুদূর গন্তব্য অপেক্ষা পথের বিপদ ও বিভীষিকার প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছে। মানুষ কত বড় —সে জ্ঞান সত্ত্বেও, মানুষ যে কত অসহায়—বড় হইবার তাড়না তাহার মধ্যে রহিয়াছে সেই তাড়নার বশেই নিয়তির সঙ্গে তাঁহার যে সংগ্রাম করিতে হয়, সেই সংগ্রামে তিনি সন্ধি প্রার্থনা করেন নাই—এইজন্যই তাহার উপন্যাসগুলি কেবল ভাবকল্পনাপ্রসূত রোমান্স মাত্র নহে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এ প্রসঙ্গের বিষয় নহে—সে আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে করিতে হইবে। তথাপি, আমি এ পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-মানসের বা কবি-চরিত্রের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার উপন্যাস হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব।

৪

প্রেম ও রূপমোহ এই দুই পৃথক পিপাসা প্রায় একই প্রবৃত্তির অনুগত হইয়া যে দ্বন্দ্ব-সংশয়ের সৃষ্টি করে, কবি বঙ্কিম তাহা হইতে কখনও মুক্ত হইতে পারেন নাই। নগেন্দ্র দত্ত, গোবিন্দলাল, প্রতাপ, ভবানন্দ, মবারক, সীতারাম—ইহারা সকলেই সেই অমোঘ নিয়তির নাগপাশে মূর্চ্ছিত ও জর্জ্জরিত হইয়া মনুষ্যধর্ম্ম পালন করিয়াছে—সে পরিণাম রোধ করিবার প্রবৃত্তিই তাহাদের স্রষ্টার চিত্তে নাই; বরং রসবিহ্বল কবি পরম আগ্রহে সে দৃশ্য উপভোগ করিয়াছেন। আত্মস্থ হইবার চেষ্টার ত্রুটি নাই বটে—শৈবলিনী পাপীয়সী, রোহিণী কুলটা, গোবিন্দলাল মোহগ্রস্ত, প্রতাপ ইন্দ্রিয়জয়ী, ভবানন্দ আত্মঘাতী, সীতারাম ভাগ্যবিড়ম্বিত, অমরনাথ সংসারবিরাগী—ধর্ম্মকথা নীতি-উপদেশ ও আত্মশাসনের ত্রুটি নাই। এই মহামৃত্যু হইতে বাঁচিবার কি আকাঙ্ক্ষা, নিয়তির উপরে জয়ী হইবার কি প্রাণান্ত প্রয়াস! কিন্তু সেই রূপমোহ বা ইন্দ্রিয়লালসার মুখে বহ্নিবিক্ষু পতঙ্গের যে নিদারুণ পরিণাম, কবি তাহাকেই দীর্ঘনিশ্বাসের দ্বারা অর্চ্চনা করিয়াছেন; এই পাপের স্বস্ত্যয়নকল্পে যত মন্ত্রই উচ্চারণ করুন—নিয়তির সেই ভীষণ-মধুর বিকট-গম্ভীর মূর্ত্তি হইতে মুগ্ধ দৃষ্টি ফিরাইতে পারেন নাই। প্রেমই হউক, আর রূপ-মোহই হউক, ফল একই; প্রতাপের প্রেম ও গোবিন্দলালের রূপমোহ দুইয়েরই পরিণাম এক—মৃত্যু ছাড়া আর পথ নাই। এইজন্য, প্রেমিক বা ইন্দ্রিয়পরবশ, যেমনই হউক—কোনও নায়ক-চরিত্রের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, নীতিপ্রচারক বঙ্কিমচন্দ্র ও কাব্যস্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র এ দুইয়ের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক কি, অথবা তাঁহার কবি-চিত্তে নীতিধর্ম্মের প্রেরণা আসিয়াছিল, কি কারণে, কোথা হইতে।

বিষবৃক্ষ-রোপণকারী নগেন্দ্র বলিতেছে—

কুন্দ নামে যে কন্যার পরিচয় দিলাম—তাহার বয়স তের বৎসর—তাহাকে দেখিয়া বোধ হয় যে,

এই সৌন্দর্য্যের সময়। প্রথম যৌবন-সঞ্চারের অব্যবহিত পূর্ব্বেই যেরূপ মাধুর্য্য এবং সরলতা থাকে, পরে তত থাকে না। [নগেন্দ্র দত্তের স্ত্রী সূর্য্যমুখী এক্ষণে পূর্ণযৌবনা।]······কুন্দ যে নির্দ্দোষ সুন্দরী তাহা নহে। অনেকের সঙ্গে তুলনায় তাহার মুখাবয়ব অপেক্ষাকৃত অপ্রশংসনীয় বোধ হয়, অথচ আমার বোধ হয়, এমন সুন্দরী কখনও দেখি নাই।···যেন চন্দ্রকর কি পুষ্প-সৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে।

সূর্য্যমুখী কুন্দ অপেক্ষা সুন্দরী, কিন্তু সে সৌন্দর্য্যে নূতনত্ব আর নাই, তাহা আর রহস্যময় নয়, তাই নগেন্দ্র দত্ত রূপমোহের নূতন ইন্ধন পাইয়াছে। এ রূপের আকর্ষণ যেন দেহের আকর্ষণ নয়, এ যেন অতি সূক্ষ্ম অশরীরী এক লাবণ্য —এক নূতন পিপাসা উদ্রেক করিয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্ম পদার্থও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল-বস্তুতে পরিণত হইল—সৌন্দর্য্য-পিপাসা ও রূপলালসায় প্রভেদ রহিল না। তখন তাহার মুখে শুনি—

বাঁচিতে কে চাহে? এ সংসার বিষময়। বিষবৃক্ষ সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গণে। কে ভালবাসিতে চাহে?

—ইহাই হইল এক বঙ্কিমচন্দ্রের কথা, অপর বঙ্কিমচন্দ্র হরদেব ঘোষালের জবানিতে বলিতেছেন—

রূপজ মোহ দূর হইলে, কালে স্থায়ী প্রেমের সঞ্চার হইবে। তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়া সুখী হইতে পারিবে। এবং যদি তোমার জ্যেষ্ঠা ভার্য্যার সাক্ষাৎ আর না পাও, তবে তাঁহাকে ভুলিতেও পারিবে। বিশেষ কনিষ্ঠা তোমাকে ভালবাসেন। ভালবাসায় কখনও অযত্ন করিবে না। কেন না, ভালবাসাই মানুষের একমাত্র নির্ম্মল এবং অবিনশ্বর সুখ। ভালবাসাই মনুষ্যজাতির উন্নতির শেষ উপায়—মনুষ্যমাত্র পরস্পরে ভালবাসিলে আর মনুষ্যকৃত অনিষ্ট পৃথিবীতে থাকিবে না।

ইহার একটি বাস্তব সত্য, অপরটি আদর্শের সত্য—একটি দেহের নিয়তি, অপটি মনের কামনা। কিন্তু নিয়তিকে জয় করা সহজ নহে—বিষবৃক্ষ রোপণ করিতেও হইবে, তাহার ফলও ভক্ষণ করিতে হইবে।

রূপে মুগ্ধ? কে কার নয়? আমি এই হরিত-নীল-বিচিত্র প্রজাপতির রূপে মুগ্ধ। তুমি কুসুমিত কামিনী-শাখার রূপে মুগ্ধ। তাতে দোষ কি? রূপ ত মোহের জন্যই হইয়াছিল। গোবিন্দলাল প্রথম এরূপ ভাবিলেন। পাপের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া পুণ্যাত্মাও এইরূপ ভাবে।

কথাটা শুনিতে কেমন হইল? যে পুণ্যাত্মা সে পাপের সোপানে পদার্পণ করিবে কেন? গোবিন্দলাল পুণ্যাত্মা; রূপমোহ অনিবার্য্য, পুণ্যাত্মার পক্ষেও অনিবার্য্য।—তবেতো পাপ ও পুণ্যের আশ্রয়স্থল একই, এই দুইকে পৃথক রাখিবে কেমন করিয়া? পুণ্যাত্মা শেষে প্রায়শ্চিত্ত করে বলিয়াই পাপ তো মিথ্যা হইয়া যায় না। মিথ্যা নয় বলিয়াই তাহার সত্যকে স্বীকার করিতে—বুঝিয়া লইতে হইবে। গোবিন্দলালের মত পুরুষও এই রূপমোহের নিকটে অবশেষে আত্মসমর্পণ করে; তাহার বিবেকবুদ্ধি, এমন কি তাহার আত্মরক্ষণ-ধর্ম্মও স্তম্ভিত হইয়া যায় —অজগরচক্ষুর দৃষ্টিসম্মোহিত পক্ষীশাবকের মত সেই পুরুষের সকল, ভয় ভাবনা লুপ্ত হয়; সে বলিয়া উঠে—

এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছু দিন রূপের সেবা করিব।—আমার এ অসার, এ আশাশূন্য, প্রয়োজনশূন্য জীবন ইচ্ছামত কাটাইব। মাটির ভাণ্ড যে দিন ইচ্ছা সেই দিন ভাঙ্গিয়া ফেলিব।

অমরনাথ রজনীকে বলিতেছে—

প্রথম যৌবনে একদিন আমি রূপান্ধ হইয়া উন্মত্ত হইয়াছিলাম—জ্ঞান হারাইয়া চোরের কাজ করিয়াছিলাম। অঙ্গে আজিও তাহার চিহ্ন আছে।...আর কখন কোন অপরাধ করি নাই। চির-জীবন, সেই একদিনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি: আমাকে কি তুমি গ্রহণ করিবে?

অমরনাথ অতি কঠিন আত্মসংযমের দ্বারা পাপের প্রতিরোধ করিয়াছে, কিন্তু তাহার জীবনও ব্যর্থ হইয়াছে। বিদ্যার দ্বারা সে অন্তঃকরণ মার্জ্জিত করিয়াছে, সংসারের অভিজ্ঞতার দ্বারা সে ধীর বুদ্ধির অধিকারী হইয়াছে, সে ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্য করিয়া গার্হস্থ্য প্রেম-সুখের কামনা করিয়াছে। কবির তাহা পছন্দ হইল না। এত নীতিজ্ঞান, এত আত্মপরীক্ষা, এতখানি প্রায়শ্চিত্তের পরেও তাহার মত কৃপার পাত্র কে? বৈরাগ্যের পথই সে অবলম্বন করিল বটে, কিন্তু তাহার এই চরম আক্ষেপোক্তির মধ্যে বিশল্যকরণীর চিহ্ন নাই—

প্রভো, তোমায় অনেক সন্ধান করিয়াছি. কই তুমি? দর্শনে, বিজ্ঞানে তুমি নাই। জ্ঞানীর জ্ঞানে, ধ্যানীর ধ্যানে তুমি নাই। তুমি অপ্রমেয়, এজন্য তোমার পক্ষে প্রমাণ নাই। এই স্ফুটিতোন্মুখ হৃদপদ্মেই তোমার প্রমাণ—ইহাতে তুমি আরোহণ কর। আমি অন্ধ পুষ্পনারীকে পরিত্যাগ করিয়া, তোমার ছায়া সেখানে স্থাপন করি।...

প্রভো, আপনার কাছে একটা নিবেদন আছে। এ দেহ কলঙ্কিত করাইল কে, তুমি না আমি? আমি যে অসৎ, অসার, দোষ আমার না তোমার? আমার এ মনিহারির দোকান সাজাইল কে, তুমি না আমি? যাহা তুমি সাজাইয়াছ তাহা তোমাকেই দিব। আমি এ ব্যবসা আর রাখিব না।

সুখ! তোমাকে সর্ব্বত্র খুঁজিলাম—পাইলাম না। সুখ নাই—তবে আশায় কাজ কি? যে দেশে অগ্নি নাই, সে দেশে ইন্ধন আহরণ করিয়া কি হইবে? প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সব বিসর্জ্জন দিব।

—এ আক্ষেপ কাহার? অমরনাথের তো বটেই, কিন্তু ইহার ফাঁকে ফাঁকে কবিরই আর্ত্ত কণ্ঠের প্রতিধ্বনি শোনা যাইতেছে না?

প্রেম ও রূপমোহ, এ দুইয়ের পার্থক্য বঙ্কিমচন্দ্র বার বার নির্দেশ করিতে ত্রুটি করেন নাই—এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কিন্তু তথাপি ওই দুইকে তিনি খুব তফাৎ করিয়া রাখিতে পারেন নাই; বরং যে প্রেম রূপজ নহে, তাহার গভীরতা স্বীকার করিলেও প্রেমকে সম্পূর্ণ রূপমোহমুক্তরূপে কল্পনা করিতে তাঁহার বাধিয়াছে; তাহার কারণ এ মোহ কবির নিজেরই প্রাণের মোহ। প্রতাপ-শৈবলিনীর কাহিনী একটু স্বতন্ত্র হইলেও তাহাদের সেই পরস্পর আসক্তির মূলে বাল্যপ্রণয়ের প্রভাবই একমাত্র কারণ নয়, তাহার প্রমাণ—"শৈবলিনী বাড়িতে লাগিল—সৌন্দর্য্যের ষোল কলা পূরিতে লাগিল।" এক ভ্রমর ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সকল নায়িকা ও প্রধান নারীচরিত্রগুলি অপর সকল গুণের সঙ্গে রূপলাবণ্যেরও অধিকারিণী। নারী যতই বীর্য্যবতী, বুদ্ধিমতী এবং হৃদয়বতী হউক—রূপ তাহার চাই-ই; রাজরাজেশ্বরী-মূর্ত্তি না হইলে, সে যেমন পুরুষ-হৃদয়ের আরতিলাভের উপযুক্ত নয়, তেমনই শক্তিমান পুরুষের বৈষয়িক বা পারমার্থিক আত্মাভিমান লোপ করিয়া তাহার জীবনে দারুণ দুর্য্যোগ সৃষ্টি করিতেও সে অক্ষম। রাজ্যলোভী দুরাকাঙ্ক্ষ পশুপতির অতিপ্রবল বিষয়ৈষণার শাস্তি দিল মনোরমা; রাজ্যাপহারী শত্রুর হাত হইতেও সে উদ্ধার পাইয়াছিল, তাহার মৃত্যুর শেষ কারণ হইল—এক নারী। এই নারী পরম রহস্যময়ী, রূপসী, মোহিনী।

সেই রত্নপ্রদীপদীপ্ত দেবীমন্দিরে, চন্দ্রালোকবিভাসিত দ্বারদেশে, মনোরমাকে দেখিয়া পশুপতির হৃদয় উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্রের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিল।...

পশুপতি অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে লাগিলেন।...দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌকুমার্য্যময় মুখমণ্ডল গম্ভীর হইতে লাগিল। আর সে বালিকাসুলভ ঔদার্য্যব্যঞ্জক ভাব রহিল না।...সরলতাকে ঢাকিয়া প্রতিভা উদিত হইল। পশুপতি কহিলেন, "মনোরমা,...আজি তোমার এ ভাব কেন?

মনোরমা উত্তর করিলেন, "আমার কি ভাব দেখিলে?"

প। তোমার দুই মূর্ত্তি—এক মূর্ত্তি আনন্দময়ী, সরলা বালিকা—সেই রূপে আমার হৃদয় শীতল হয়। আর তোমার এই মূর্ত্তি গম্ভীরা, তেজস্বিনী, প্রতিভাময়ী, প্রখর বুদ্ধিশালিনী—এ মূর্ত্তি দেখিলে আমি ভীত হই।

আর একদিন পশুপতি মনোরমাকে বলিতেছে—

আমি এ বয়স পর্য্যন্ত কেবল বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছি—বিষয়ালোচনা করিয়াছি, অর্থোপার্জ্জন করিয়াছি, সংসারধর্ম্ম করি নাই। যাহাতে অনুরাগ তাহাই করিয়াছি. দারপরিগ্রহে অনুরাগ নাই, এজন্য তাহা করি নাই। কিন্তু যে পর্য্যন্ত তুমি আমার নয়নপথে আসিয়াছ, সেই পর্য্যন্ত মনোরমালাভ আমার একমাত্র ধ্যান হইয়াছে। সেই লাভের জন্য এই নিদারুণ ব্রতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

—অর্থাৎ মনোরমা বিধবা, তাহাকে বিবাহ করিতে হইলে শাস্ত্রবিধি খণ্ডন করাইতে হইবে, সে শক্তি রাজারই আছে, তাই পশুপতি রাজ্যলাভের জন্য সকল ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছে। তারপর রাজ্য গেল তাহাতেও দুঃখ নাই, প্রাণ যাইতে বসিয়াছিল তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই—মনোরমাকে চাই। শেষে তাহারই সন্ধানে ব্যর্থমনোরথ হইয়া, ক্ষোভে দুঃখে পশুপতি জ্বলন্ত মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেবী অষ্টভুজার স্বর্ণ-প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে গিয়া নিজ জীবন বিসর্জ্জন দিল।

পশুপতি ও মনোরমার এই যে দাম্পত্য-বিভ্রাট এবং তাহার যে কারণ, বঙ্কিমের কবি-জীবনে তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে—সীতারাম ও শ্রীর কাহিনীতে ইহাই আরও গাঢ় ও গভীর রসকল্পনায় মণ্ডিত হইয়াছে। 'মৃণালিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় উপন্যাস—তখন কবির কল্পনা সবেমাত্র পক্ষবিস্তার করিয়াছে; তাহাতে কাব্যরস-সৃষ্টির প্রয়াস যতটা আছে জীবনকে তেমন করিয়া দেখিবার দৃষ্টিলাভ করিতে তখনও বিলম্ব আছে—ট্র্যাজেডিরচনার উপযোগী চরিত্র-সৃষ্টি তখনও কবিকল্পনার আয়ত্ত হয় নাই। তাই পশুপতি-চরিত্র এত দুর্ব্বল, এবং মনোরমা রক্তমাংসের মানুষ না হইয়া কাব্যলোকের অধিবাসিনী রহস্যময়ী নারীদেবতা হইয়া আছে। শ্রী ও সীতারাম, মনোরমা ও পশুপতির প্রতিরূপ নিশ্চয়ই নহে, কিন্তু এই দুই যুগলের দাম্পত্য-মিলনের অন্তরায়—বাহিরের দৈব ও ভিতরের চরিত্রগত বৈষম্য—প্রায় এক; মনে হয়, তিনি যেন তাঁহার অপরিণত কল্পনার বীজটিকে পরিণত প্রতিভার রস-সিঞ্চনে নূতনরূপে পূর্ণ প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। পশুপতি নন্দার মত স্ত্রীই চায়—সে মনোরমার মধুর বালিকামূর্ত্তির ভজনা করে, তাহার দৃপ্ত মহিমময়ী মূর্ত্তি দেখিলে ভয় পায়। সীতারাম নন্দাকে চায় না, শ্রীকে পাইবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছে—"মাতার মত স্নেহ, কন্যার মত ভক্তি, দাসীর মত সেবা, সীতারাম সকলই নন্দার কাছে পাইতেছিলেন। কিন্তু সহধর্ম্মিণী কই?......বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ভাল, কিন্তু সমরে সিংহবাহিনী কই? তাই নন্দার ভালবাসায়, সীতারামের পদে

পদে শ্রীকে মনে পড়িত!" অবস্থার বশে একজনের স্বভাব-বিকৃতি, এবং অপ্রসর পটভূমিকার জন্য অপর চরিত্রের অস্ফুটতা না ঘটিলে, এ দুই চরিত্রের কল্পনামূলে খুব বেশি প্রভেদ নাই। এ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, একটা কথা এইখানেই বলিব—বাংলা সাহিত্যে নারীচরিত্র-কল্পনায় এমন অভ্রান্ত দৃষ্টি, এমন বৈচিত্র্য অথচ সুগভীর ঐক্যবোধ আর কোনও প্রতিভার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ইহার কারণ কি, এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেই তাহা অনুমান করা যাইবে।

সীতারাম-রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাও প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই বয়সে, এবং প্রতিভার পূর্ণ পরিণতি-কালে, তিনি প্রেম ও রূপোন্মাদের যে নূতন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহা যেমন অর্থপূর্ণ তেমনই কৌতুককর। "সীতারাম মনে মনে সেই মহিমময়ী সিংহবাহিনী মূর্ত্তি পূজা করিতে লাগিলেন"—ইহাই হইল সেই তত্ত্বকথার সূত্র। সীতারামের এই মানসিক অবস্থার কারণ প্রেম, না আর কিছু? বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, প্রেমের কথা পুস্তকেই পড়িয়া থাকি, সংসারে ভালবাসা, স্নেহ ভিন্ন প্রেম বলিয়া অপর কোন বস্তুর সাক্ষাৎলাভ ঘটে না। সেই স্নেহ রূপজ নয়—গুণজ, এবং তাহা জন্মিতে সময় লাগে—তাহা পুরাতনকেই আশ্রয় করে, নূতনে তাহা জন্মে না। কবির এই কথায় কেহ যেন মনে না করেন যে, শেষ বয়সে তিনি টলষ্টয়ের মত মোহমুক্ত হইয়াছেন, অথবা সাংসারিক অভিজ্ঞতার ফলে জীবনের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করিয়া দেখিতেছেন। এই 'সীতারামে'ই তাহার প্রমাণ আছে। যিনি প্রতাপ-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং শৈবলিনীর জন্য তাহার জীবন বিসর্জ্জন করাইয়াছেন, তিনি অবশ্যই প্রেম-নামক বস্তু সম্বন্ধে কোন কালেই অবিশ্বাসী হইতে পারেন না; এবং যেহেতু প্রতাপের সেই আসক্তি গুণজ নহে, অতএব তাহাকে স্নেহ ভালবাসা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও চলিবে না। বঙ্কিমচন্দ্র এখানেও এই তত্ত্বব্যাখ্যাকালে, নিজের জন্মগত সংস্কার ত্যাগ করিতে পারেন নাই—রূপজ মোহকেই একটি সূক্ষ্ম দার্শনিক নাম দিয়া শোধন করিয়া লইয়াছেন, ব্যাধির নাম-পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। কারণ, কিছু পরেই বলিতেছেন, স্নেহ ভালবাসা যেমন পুরাতনেরই প্রাপ্য, তেমনই নূতনের নূতন বলিয়াই একটা আদর আছে। পুরাতন পরীক্ষিত, নূতন অপরীক্ষিত—

> "যাহা পরীক্ষিত তাহা সীমাবদ্ধ; যাহা অপরীক্ষিত, কেবল অনুমিত, তাহার সীমা দেওয়া না দেওয়া মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাই নূতনের গুণ অনেক সময় অসীম বলিয়া বোধ হয়। তাই সে নূতনের জন্য বাসনা দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়ে। যদি ইহাকে প্রেম বল, তবে সংসারে প্রেম আছে। সে প্রেম বড় উন্মাদকর বটে। নূতনেরই তাহা প্রাপ্য। তাহার টানে পুরাতন অনেক সময় ভাসিয়া যায়। শ্রী সীতারামের পক্ষে নূতন শ্রীর প্রতি সেই উন্মাদকর প্রেম সীতারামের চিত্ত অধিকৃত করিল। তাহার স্রোতে, নন্দা রমা ভাসিয়া গেল।"

এই নূতন যে কি, তাহা কি আর বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন আছে? নগেন্দ্র, গোবিন্দলাল এই নূতনেরই সেবা করিয়াছিল—ইহারই স্রোতে ভ্রমর,

সূর্য্যমুখী ভাসিয়া গিয়াছিল। এই নূতনের কথা বলিতে বলিতে কবিরও মনের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল—নগেন্দ্র, গোবিন্দলাল, ভবানন্দ, প্রতাপ আর তেমন ভাবে বাঁচিয়া নাই বটে, তথাপি এই প্রৌঢ় পুরুষের কণ্ঠে তাহাদেরই সেই অধীর আর্ত্তনাদ রূপান্তরিত হইয়া যে অধ্যাত্ম-করুণ আকুতির আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা যেমন সত্য তেমনই মর্ম্মস্পর্শী। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-জীবনের শেষ উক্তি। এই নূতনকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন—

হায় নূতন! তুমিই কি সুন্দর? না, সেই পুরাতন সুন্দর? তবে, তুমি নূতন! তুমি অনন্তের অংশ। অনন্তের একটুখানি মাত্র আমরা জানি। সেই একটুখানি আমাদের কাছে পুরাতন; অনন্তের আর সব আমাদের কাছে নূতন! .....নূতন, তুমি অনন্তেরই অংশ। তাই তুমি এত উন্মাদকর। শ্রী আজ সীতারামের কাছে—অনন্তের অংশ।

হায়! তোমার আমার কি নূতন মিলিবে না? তোমার আমার কি শ্রী মিলিবে না? যেদিন সব পুরাতন ছাড়িয়া যাইব, সেইদিন সব নূতন পাইব, অনন্তের সম্মুখে মুখামুখী হইয়া দাঁড়াইব। নয়ন মুদিলে শ্রী মিলিবে। ততদিন এসো আমরা বুক বাঁধিয়া হরিনাম করি। হরিনামে অনন্ত মিলে।

ইহাই রূপপিপাসার রূপান্তর—ইন্দ্রিয়ার্থ কেমন করিয়া পরমার্থে পরিণত হয় তাহারই দৃষ্টান্ত। কিন্তু আমার প্রসঙ্গ এখনও শেষ হয় নাই, বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-হৃদয়ের আলেখ্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য 'চন্দ্রশেখর' ও 'আনন্দমঠ' হইতে কিছু উদ্ধৃত করিব। যে প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর্জীবন, তথা কবি-প্রতিভার বিকাশের মূলে রহিয়াছে, সেই সর্ব্বনাশিনী শক্তিকে তিনি কত রূপে কত ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—তাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া তাঁহার প্রাণ কত মন্ত্রই পাঠ করিয়াছে! 'বিষরক্ষ' হইতেই বঙ্কিমের প্রতিভার পূর্ণদীপ্তি লক্ষ্য করা যায়—এই দীপ্তি তাঁহার শেষ উপন্যাস সীতারাম পর্য্যন্ত সমভাবে উজ্জ্বল রহিয়াছে; বরং শেষ তিনখানি উপন্যাস—'আনন্দমঠ', দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামে'ই বঙ্কিমের কবিজীবনের পূর্ণ পরিণতি লক্ষ্য করা যায়—আর্টের কথা বলিতেছি না, 'completed personality'-র কথাই বলিতেছি। প্রতিভার পরিণত অবস্থায়, বঙ্কিমচন্দ্রের রূপ-তান্ত্রিক সাধনায়, দুইবার আসন টলিতে দেখিয়াছি। যে পুরুষ-প্রতিভা নারীকেই শক্তি সৌন্দর্য্য ও প্রেমের আদি প্রতিমারূপে পূজা করিয়াছে, এবং 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্'—বলিয়া পুরুষকেই সর্ববিধ সন্তাপের জন্য দায়ী করিয়াছে, সেই কবি তাঁহার দুইখানি উপন্যাসে নারীর প্রতি সহসা বিরূপ হইয়া উঠিয়াছেন। শৈবলিনী ও রোহণী-রূপে নারী তাঁহার হস্তে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে, তাহাতে কবিমানসের একটি অসুস্থ উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে, সুস্থ কবিদৃষ্টির পরিচয় তাহাতে নাই। সবচেয়ে কৌতুকের বিষয় এই যে, এই দুই নারী-চরিত্রই তাহাদের দেহ মনের উৎকর্ষ ও বলিষ্ঠতার জন্য পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে; তাহারা কেহই যে সাধারণ নারী নয়—তাহারা যে, more sinned against than sinning', সে ধারণার জন্য লেখক নিজেই দায়ী। অতএব এ যেন তাহাদের দোষ নয়, কবির নিজ হৃদয় যেন সহসা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, কবিপ্রেরণার উপরে ব্যক্তিমানসের পক্ষপাত জয়ী হইয়াছে—

নিজের হৃদয়কেই নির্ম্মম আঘাত করিবার জন্য তিনি যেন অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। যে-নারীকে তিনি পুরুষের শক্তিরূপিণী সহচরী, তাহার হৃদয়ের যত কিছু ঐশ্বর্য্যের প্রেরণারূপিণী, এবং মিথ্যা ও কাপুরুষতার শাস্তিদায়িনীরূপে বরণ করিয়াছিলেন, তাহাকেই এখানে শাস্ত্রকারদিগের মত পাপের মূল বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। ইহাঁর কারণ সন্ধান করিতে হইলে কাব্য হইতে চক্ষু তুলিয়া কবির প্রতি নিবদ্ধ করিতে হইবে। আমি পূর্বে বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যগুলি কেবল কবিকল্পনার ফুল-ফল নহে, ইহাদের মধ্য দিয়া প্রাণের অতিশয় বাস্তব উৎকণ্ঠাকেই ভিত্তি করিয়া একজন পুরুষ-ব্যক্তির চরিত-চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবনের যাত্রাপথ অতিবাহনের মত, এইগুলির ভিতর দিয়া কবি বঙ্কিম তাঁহার জীবনের গহন পথ অতিক্রম করিয়াছেন, সে পথে সংশয়-সঙ্কট আছে, বিপদ-বিভীষিকা আছে, উৎসাহ-অবসাদ আছে। 'চন্দ্রশেখর' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' কবিজীবনের সেই দ্বন্দ্ব-সংশয় আর্টের দাবীকে পূরা স্বীকার করে নাই; রসকল্পনার মুক্তপ্রবাহে আপনাকে ছাড়িয়া না দিয়া, কবিচিত্ত সেই প্রবাহেরই প্রতিমুখে আত্মশাসনের শিলাস্তূপ বসাইয়াছে। তথাপি প্রাণের কি আকুল আক্ষেপ! বালক প্রতাপ বালিকা শৈবলিনীকে ভালবাসিয়াছে।

বালকমাত্রেই কোন সময়ে না কোন সময়ে অনুভূত করিয়াছে যে, ঐ বালিকার মুখমণ্ডল অতি মধুর—উহার চক্ষে কোন বোধাতীত গুণ আছে। খেলা ছাড়িয়া কতবার তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিয়াছে—তাহার পথের ধারে, অন্তরালে দাঁড়াইয়া কতবার তাহাকে দেখিয়াছে। কখন বুঝিতে পারে নাই, অথচ ভালবাসিয়াছে। তাহার পর সেই মধুর মুখ—সেই সরল কটাক্ষ—কোথায় কালপ্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য পৃথিবী খুঁজিয়া দেখি—কেবল স্মৃতিমাত্র আছে। বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে।...

পরে শৈবলিনীর জ্ঞান জন্মিতে লাগিল। বুঝিল যে, প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই। বুঝিল, এজন্মে প্রতাপকেও পাইবার সম্ভাবনা নাই।

ইহাই প্রতাপ-শৈবলিনীর জীবননাট্যের নিয়তি-সূত্র। প্রতাপের কথায় কবি যেমন আত্মসংবরণ করিতে পারেন নাই, নিজেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন—'বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে,' তেমনঃ শৈবলিনী সম্বন্ধে চন্দ্রশেখর যাহা বলিতেছে, তাহাও কি কবির নিজ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নয়?—

তখন চন্দ্রশেখর অনেকরাত্রি হইয়াছে বুঝিয়া, পুঁথি বাঁধিলেন। সে সকল যথাস্থানে রক্ষা করিয়া, আলস্যবশতঃ দণ্ডায়মান হইলেন।...বাতায়নপথে সমাগত চন্দ্রকিরণ সুপ্ত সুন্দরী শৈবলিনীর মুখে নিপতিত হইয়াছে। ...চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর সুষুপ্তিসুস্থির মুখমণ্ডলের সুন্দর কান্তি দেখিয়া অশ্রুমোচন করিলেন। ভাবিলেন, "হায়! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি? এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত—শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি, সন্দেহ নাই! কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ?...আমি নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণ—সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমি কি করিব? এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমণীমুখপদ্ম কি জন্মের মত সারভূত করিব? ছি, ছি, তাহা পারিব না। তবে কি এই নিরপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে?

চন্দ্রশেখর বলিতেছে, "ছি, ছি, তাহা পারিব না।" কিন্তু পারিব না বলিলেই তো অব্যাহতি নাই। ইহার কয়েকদিন পরেই বিদেশ হইতে

গৃহে ফিরিয়া আসিতে দূর হইতে চন্দ্রশেখর নিজ গৃহ দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র তাঁহার মনে আহ্লাদ সঞ্চার হইল। চন্দ্রশেখর তত্ত্বজ্ঞ; তত্ত্বজিজ্ঞাসু, আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন,...ঐ গৃহমধ্যে আমার প্রেয়সী ভার্য্যা বাস করেন, এই জন্য আমার এ আহ্লাদ।...আমি ভগবদ্‌বাক্যে অশ্রদ্ধা করি না, কিন্তু আমি দারুণ মোহজালে জড়িত হইতেছি। এ মোহজাল কাটিতে ইচ্ছা করে না—যদি অনন্তকাল বাঁচি, তবে অনন্তকাল এই মোহে আচ্ছন্ন থাকিতে বাসনা করিব।

চন্দ্রশেখরের মত পুরুষেরও পরিণাম এই! বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থের নাম দিয়াছেন 'চন্দ্রশেখর', তাহার কারণ চন্দ্রশেখরকে তিনি আদর্শ চরিত্ররূপে কল্পনা করিয়াছিলেন; কিন্তু সে কল্পনা সফল হয় নাই—প্রাণের প্রচণ্ড স্রোতে শিলাস্তূপ ভাসিয়া গিয়াছে। চন্দ্রশেখর-চরিত্রের সাত্ত্বিক কঠোরতা তিনি মানবীয় হৃদয়বৃত্তির দ্বারা শোধন করিয়া যে আদর্শ সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—চন্দ্রশেখর শ্রদ্ধা অপেক্ষা কৃপার পাত্র হইয়াছেন। শৈবলিনী পাপীয়সী—অন্যপূর্ব্বা ও কুলত্যাগিনী; সেই পত্নীকে এরূপ শুদ্ধির দ্বারা পাপ-মুক্ত করিয়া সে যখন ঘরে তুলিয়া লইতেছে, তখন তাহাতে তাহার অপার করুণা ও স্নেহ অপেক্ষা দুর্ব্বলতাই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের সঙ্কল্প রক্ষা করিতে পারেন নাই, শেষ পর্য্যন্ত প্রতাপের পাশে এই চরিত্র অতিশয় ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। যেন কবিরই পরাজয় ঘটিয়াছে—যে-নারীকে তিনি শেষ পর্য্যন্ত অপরাধিনী করিয়া রাখিয়াছেন, প্রতাপের মত ইন্দ্রিয়জয়ী বীর তাহারই জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। কেন করিল? প্রতাপের জবানিতে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন,—সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী যাহারা তাহারা সে কথা বুঝিবে না। সে কারণ নিশ্চয়ই কেবল ইহাই নহে যে, "বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে।" এ সব কিছু নয়! কারণ সেই এক, সেই ব্যাধিই বঙ্কিম-প্রতিভার সঞ্জীবনী অমৃত-বল্লরী।

কিন্তু এই রূপমোহের, এই ইন্দ্রিয়-পারবশ্যের চূড়ান্ত ট্র্যাজেডি—'আনন্দমঠ'। যাঁহারা এই উপন্যাসকে একখানি উদ্দেশ্যমূলক স্বদেশপ্রেমের কাব্য বলিয়াই সংক্ষেপে ইহার বিচার শেষ করেন, তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-প্রতিভার সম্যক ধারণা করিতে পারেন নাই। এই উপন্যাসও 'সীতারামে'র মতই বঙ্কিম-চন্দ্রের পরিণত প্রতিভার অন্যতম নিদর্শন। কোনও একখানি উপন্যাসের বিস্তৃত আলোচনা এ প্রসঙ্গের বহির্ভূত, তথাপি যে সূত্র ধরিয়া আমি বঙ্কিমচন্দ্রের কবিচরিত ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহারই প্রয়োজনে এখানে দুইচারি কথা বলিব। সকল বড় কাব্যের লক্ষণই এই যে, তাহাতে জীবনের একটা জটিল ও গভীর অভিজ্ঞতা কোন একটি বিশিষ্ট ভাবকল্পনার ঐক্যসূত্রে সুসম্বদ্ধ আকার ধারণ করে। 'আনন্দমঠে' দেশপ্রেমের কল্পনাসূত্রে কবি বঙ্কিম তাঁহার আজীবন-সঞ্চিত গভীর ও জটিল অভিজ্ঞতাকেই একটি রসরূপ দান করিয়াছেন। দেশপ্রেমকেই পুরুষের একটি মহৎ ধর্ম্মরূপে স্থাপন করিয়া, তিনি সেই একই সমস্যাকে—বাস্তব ও আদর্শের বিরোধকে, দেহ আত্মার দ্বন্দ্বকে—আরও সরল স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইতে চাহিয়াছেন; যেন দেশ-প্রেমের

তাড়িত-শক্তি উৎপন্ন করিয়া, তাহার রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে, মানুষের দেহমনপ্রাণকে তরলিত ও মথিত করিয়া তিনি মনুষ্যত্বের মূল উপাদান পরীক্ষা করিয়াছেন। দেশপ্রেম-রূপ একটা ভাবাবেগমূলক ধর্ম্মের সংঘাতে, মানুষের সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক যত কিছু সংস্কারকে বিধ্বস্ত ও উৎক্ষিপ্ত করিয়া, তিনি তাহার শক্তি ও অশক্তির সীমা নিরীক্ষণ করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র কাব্যখানির ঘনীভূত একাগ্র কল্পনায়—যৌন-প্রবৃত্তি বা রূপমোহ, দাম্পত্য-প্রেম, সামাজিক ও পারিবারিক সংস্কার, সংসারত্যাগ বা সন্ন্যাসের আদর্শ, যুগধর্ম্ম ও সনাতন শাশ্বত পন্থা—এই সকলই একটি ভাব-সত্যের আশ্রয়ে সুসমাহিত হইতে পারিয়াছে। এই গ্রন্থের আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে একটি নৈশ-গম্ভীর অরণ্যচ্ছায়া পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহাতে যে একটি atmosphere বা মনোভূমির সৃষ্টি হইয়াছে. এবং সেজন্য চরিত্র ও ঘটনাগুলির মধ্যে যে ভাবগত সামঞ্জস্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাও শ্রেষ্ঠ কবিশক্তির নিদর্শন। এইজন্য, 'আনন্দমঠ' কেবল দেশপ্রেমের উদ্দেশ্যমূলক একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য নয়, উহা বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত লেখনীর একখানি উৎকৃষ্ট রস-রচনা। কিন্তু এ আলোচনা এখানে অবান্তর। আমি 'আনন্দমঠ' হইতে একটি স্থান উদ্ধৃত করিব—এই উপন্যাসের ভবানন্দ-চরিত্রে রূপমোহের যে ট্র্যাজেডি একেবারে আদিম—elemental—প্রচণ্ডতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার কথাই বলিব। প্রতাপের আত্মহত্যা ও ভবানন্দের আত্মহত্যা তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র পুরুষের জীবনের এই অগ্ন্যুদ্গম এখানে আরও কি ভীষণরূপে কল্পনা করিয়াছেন; ভবানন্দের জীবনে ইহার আকস্মিকতা, ইহার অনিবার্য্যতা এবং ইহার বিষ-বিসর্পের অমোঘতা যে ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, এমন আর কুত্রাপি হয় নাই। ভবানন্দ-চরিত্রই 'আনন্দমঠে'র সর্ব্বাপেক্ষা জীবন্ত চরিত্র—প্রাণের প্রাবল্যে, পৌরুষনিষ্ঠায়, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, বিদ্যাবত্তায়, মহত্ত্বে ও দুর্ব্বলতায়—বঙ্কিমচন্দ্র এই চরিত্রটিকে অতি যত্নের সহিত ভূষিত করিয়াছেন। সেই ব্রতধারী সত্যনিষ্ঠ নির্ভীক পুরুষ—প্রেম নয়, প্রেমকে দূরে রাখিবার মত বৈরাগ্য-সাধনা সে করিয়াছে—শেষে, প্রকৃতির প্রতিশোধের মতই, দারুণ রূপমোহের বশীভূত হইল। মোহগ্রস্ত হইয়াও সে জ্ঞান হারাইল না—তাহার বিবেক বা আত্মজ্ঞান অটুট হইয়া আছে। যেন কোন হিংস্র পশুর গ্রাসে নিরুপায়ভাবে সে তাহার দেহ সমর্পণ করিয়াছে, মনে মনে বলিতেছে, "যাহা ভবিতব্য, তাহা অবশ্য ঘটিবে।" অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত, কিন্তু মস্তিষ্কের বিকৃতি নাই, তাই এ ট্র্যাজেডি এত ভীষণ। কল্যাণীর সহিত কথোপকথনে তাহার যে নিদারুণ অবস্থা ফুটিয়া উঠিয়াছে—নাটকীয় চরিত্র-চিত্রণে এমন দক্ষতা, চরিত্রগত মূল তত্ত্বটিকে অবস্থা ও ঘটনার মুখে, এমন করিয়া বিদ্যুৎ-চমকের মত উদ্ভাসিত করিবার ক্ষমতা বাংলা সাহিত্যে ঐ একজনেরই ছিল। আমি সেই কথোপকথনের একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—

ভবানন্দ। তুমি আবার বিবাহ করিতে পার, তোমার পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে।

কল্যাণী। আমার কন্যা আনিয়া দাও।

ভব। দিব, তুমি আবার বিবাহ করিতে পার।

ক। তোমার সঙ্গে নাকি?

ভব। বিবাহ করিবে?

ক। তোমার সঙ্গে নাকি?

ভব। যদি তাই হয়?

ক। সন্তান-ধর্ম্ম কোথায় থাকিবে?

ভব। অতল জলে।

ক। কিসের জন্য সব অতল জলে ডুবাইবে?

ভব। তোমার জন্য। দেখ, মনুষ্য হউন, ঋষি হউন, সিদ্ধ হউন, দেবতা হউন, চিত্ত অবশ।... আমি জানিতাম না যে, সংসারে এ রূপরাশি আছে। এমন রূপরাশি আমি কখনও চক্ষে দেখিব জানিলে কখন সন্তান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতাম না। এ ধর্ম্ম এ আগুনে পুড়িয়া ছাই হয়। ধর্ম্ম পুড়িয়া গিয়াছে, প্রাণ আছে।...চারি বৎসর সহ্য করিয়াছি, আর পারিলাম না। তুমি আমার হইবে?

ক। তোমারই মুখে শুনিয়াছি যে, সন্তান-ধর্ম্মের এই এক নিয়ম যে, যে ইন্দ্রিয়পরবশ হয়, তার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু। এ কথা কি সত্য?

ভব। এ কথা সত্য।

ক। তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু?

ভব। আমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু।

ক। আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিলে, তুমি মরিবে?

ভব। নিশ্চিত মরিব।

ক। আর যদি মনস্কামনা সিদ্ধ না করি।

ভব। তথাপি মৃত্যু আমার প্রায়শ্চিত্ত; কেন না, আমার চিত্ত ইন্দ্রিয়ের বশ হইয়াছে।

ক। আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিব না। তুমি কবে মরিবে?

ভব। আগামী যুদ্ধে।...

ভবানন্দ বিদায় হইল, কল্যাণী পুঁথি পড়িতে লাগিল।

ভবানন্দ মরিল; এ চরিত্রের পক্ষে এ অবস্থায় মৃত্যু অনিবার্য্য, তাই সে মরিল। প্রতাপ বলিয়াছিল, "আমার ভালবাসার নাম...জীবন-বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা।" ভবানন্দ কি বলিবে? কবি নিজেই তাহার হইয়া বলিয়াছেন, "হায়! রমণীরূপ লাবণ্য! ইহসংসারে তোমাকেই ধিক্!"

কথিত আছে, এই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে একবার শ্রীরামকৃষ্ণের দেখা হইয়াছিল। পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এত বড় বিদ্বান্, বলুন দেখি, মানুষের প্রকৃত ধর্ম্ম কি?" উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র নাকি বলিয়াছিলেন, "আহারনিদ্রাভয়-মৈথুনঞ্চ"! বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্মের যে আদর্শ সন্ধান করিয়াছিলেন, সে আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ নয়—বিবেকানন্দের হইলেও হইতে পারিত। মানুষের মনুষ্যত্বই ছিল সে ধর্ম্মের ভিত্তি, সেই মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণ বিকাশই ছিল তাহার শেষ কথা—দেহবর্জ্জিত আধ্যাত্মিক আদর্শকে তিনি কখনও শ্রদ্ধা করিতে পারেন নাই। তাই মনে হয়, সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণকে তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে ইহাই জোর করিয়া বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, তাঁহার নিকট অত্যুচ্চ আদর্শবাদের কোন মূল্য নাই। ঐ বাক্যের মধ্যে আরও একটি ভাবের ইঙ্গিত রহিয়াছে—সে ভাব ধিক্কারের ভাব। শক্তি ও সৌন্দর্য্যের উপাসক, ক্ষুদ্রতা ও

কাপুরুষতার ঘোর শত্রু, জীবনরসরসিক এই মনীষী-কবি মানুষের মনুষ্যত্ব-মহিমা সম্বন্ধে যতই আশ্বস্ত হউন—সেই মনুষ্যত্বের তলদেশে যে পঙ্ক রহিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে একটা ধিক্কারের ভাব কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

৫

এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করিলাম, তথাপি শেষ করিবার পূর্ব্বে আরও দুইচারিটি কথা বলিবার আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-জীবনের যে কাহিনী আমি রচনা করিয়াছি, তাহা হইতে অনেকের মনে যে দুই একটি প্রশ্ন জাগিতে পারে, সর্ব্বশেষে তাহারই উল্লেখ ও কিঞ্চিত আলোচনা করিব। তাহার মধ্যে একটি এমন হইতে পারে যে, প্রেম বা রূপমোহ কবিকল্পনার অতিশয় সাধারণ উদ্দীপন-বস্তু, ইহাতে আর নূতনত্ব কি আছে? নূতনত্ব না থাকাই কবিকল্পনার গৌরব—যাহা সার্ব্বজনীন ও শাশ্বত তাহাই শ্রেষ্ঠ কাব্যের প্রেরণা হইয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সাধারণ ও সুলভ বস্তুকেই কোন্ নূতন অর্থে নূতন রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, আশা করি, এই আলোচনায় আমি তাহা কিয়ৎপরিমাণেও নির্দ্দেশ করিতে পারিয়াছি। দ্বিতীয় একটি প্রশ্ন এই। বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ করিয়া দাম্পত্য-প্রেমের কবি, এমনই একটা সঙ্গত ধারণা প্রচলিত আছে; আমার আলোচনায় সে দিকটি বাদ পড়িয়াছে। ইহার কারণ, আমি এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-জীবনের কবি-প্রবৃত্তির মূল সন্ধান করিয়াছি, তাঁহার মনোগত আদর্শ অপেক্ষা প্রাণগত উৎকণ্ঠার পরিচয় করিয়াছি। দাম্পত্য-প্রেম, স্বজাতি-প্রীতি, অদৃষ্টবাদ প্রভৃতি যে সকল ভাব ও চিন্তা বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যরচনার উপাদান-উপকরণ হইয়াছে, সেগুলির আলোচনা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের বহির্ভূত।

আর একটি প্রশ্ন এই যে, আমি যে প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বকে এই প্রসঙ্গে মুখ্যভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছি, এবং তাহা হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনবাদের যে আদর্শ উদ্ধার করিয়াছি, তাহাতে এক প্রকার দেহবাদেরই প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, আমি এ-যুগের সংস্কারবশে সে-যুগের বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্য-প্রেরণায় ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্বের ছায়া দেখিয়াছি। ইহার উত্তরে প্রথমত ইহাই বলিব যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মনে যেমন, তেমনই আমারও মনের কোণে, কোন তত্ত্বের বালাই নাই। যে-নিয়তি সমগ্র সৃষ্টি বা দেহ-জগতের নিয়তি, তাহার স্বরূপ-রূপের সাক্ষাৎকার সকল কবি, মনীষী ও মন্ত্রদ্রষ্টা পুরুষের চেতনা গহনে ঘটিবেই—চিরদিন ঘটিয়াছে। কবি, ঋষি, দার্শনিক ধর্ম্মপ্রণেতা—কে কি ভাবে তাহার সহিত বোঝাপড়া করে, সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, এই সাক্ষাৎকার তত্ত্বজ্ঞানের মত নয়; প্রথমে তাহাকে তত্ত্বরূপে অবগত হইয়া পরে তাহার প্রেরণায় সত্যকার কাব্যরচনা হয় না; ইহা যে কত সত্য, অতি-আধুনিক কাব্য-সাহিত্যই তাহার প্রমাণ। হিন্দু বা ভারতীয় চিন্তা ও সাধনার ধারায় প্রকৃতি-পুরুষের এই দ্বৈত-রহস্যকে অতি প্রাচীনকাল হইতেই কত সাধক অপরোক্ষ করিয়াছেন—তন্ত্র-

রূপে নয়, মন্ত্ররূপেই তাহা সাধনার সহায় হইয়াছে। তন্ত্রের শিবশক্তিবাদ এই রহস্যকে স্বীকার করিয়াছে। হিন্দু-চিন্তার দ্বারা প্রভাবান্বিত, নব্য-ইউরোপীয় দর্শনের অন্যতম নেতা দার্শনিকপ্রবর শোপেনহাউয়র যে অন্ধ নিয়তিকে সৃষ্টির আদিতত্ত্বরূপে ভাবনা করিয়াছেন তাহাও এই কাম-তন্ত্রের সেই মহাশক্তি—কামাখ্যা। আধুনিক কালের বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি শোপেন-হাউয়রের এই মন্ত্র-দৃষ্টিকেই যেন এক নূতন রসকল্পনায় মণ্ডিত করিয়াছেন। এ রহস্যের আদিও নাই, অন্তও নাই—ইহা যেমন পুরাতন, তেমনই নূতন। যাহারা তত্ত্ববিলাসী, যাহারা দেহ-আত্মার পরিবর্ত্তে মানস-আত্মার অভিলাষী—দেহাধিষ্ঠিত পরমপুরুষের পরিবর্ত্তে যাহারা একটা স্বতন্ত্র অহং-এর সাধনা করে, তাহারা আধ্যাত্মিকতার ধারও ধারে না, তাই সকল আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠার মূল যাহা তাহাকেই 'দেহবাদ' নাম দিয়া অন্যান্য 'বাদ'-এর পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া থাকে। আজিকার দিনে দেহের কোন মর্য্যাদা নাই, মনই দেহের স্থান অধিকার করিয়াছে, তাই দেহের পাপও আর পাপ নয়, দেহের প্রেমও প্রেম নয়। এজন্য, দেহঘটিত যাহা কিছু—যাহা নিতান্তই প্রাণের প্রবৃত্তি, তাহা আদিম মনোবৃত্তির লক্ষণ, অথবা অমার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক। তথাপি, বঙ্কিমচন্দ্রের কবিমানসে, দেহবাদ বলিতে সাধারণত যাহা বুঝায়, তাহা কখনও স্থান পায় নাই। তিনি একরূপ দেহবাদী ছিলেন বটে, কিন্তু সে দেহবাদ ইন্দ্রিয়-সর্ব্বস্ব নহে, তাহা হইলে ট্র্যাজেডিই তাঁহার কবিচিত্তের প্রধান প্রেরণা হইতে পারিত না। দেহকে বা দেহ-জীবনকে তিনি এত ছোট করিয়া দেখেন নাই। তিনি যে নিয়তির অনুধ্যান করিয়াছিলেন, তাহা সৃষ্টির সেই বিরাট রহস্য; সেই রহস্য ভেদ করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে কবি, মনীষী, নীতিবিদ্ ও ধর্ম্মপ্রণেতা। সম্প্রতি এক নবীনা বিদুষী একখানি কাব্যের সমালোচনা-প্রসঙ্গে পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং দেহবাদের উপর খড়্গহস্ত হইলেও সে সম্বন্ধে নানা তত্ত্বকথা নানা স্থান হইতে উদ্ধৃত করিবার সুযোগ ত্যাগ করেন নাই। তাঁহারই একটি উদ্ধৃত বচনের মধ্যে, আমি বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে আমার এই আলোচনার মূল মর্ম্মটির, প্রতিধ্বনি পাইয়াছি। বচনটি এই —"As soon as the spirit knows of nothing else but its instincts, the essential wisdom of amorous folly and great love will be revealed to it." ইহা যে কত বড় সত্য, বঙ্কিমচন্দ্রের কবিপ্রেরণাও যেমন তাহার সাক্ষী, তেমনই ইহা যে সর্ব্বকালের ও সর্ব্বদেশের মনীষিগণের চিত্তে সমভাবে স্ফুরিত হইয়া থাকে, এই উক্তিটির মধ্যে তাহারও প্রমাণ মিলিবে। এখানে যাহাকে 'instincts' বলা হইয়াছে তাহাই বিশুদ্ধ দেহধর্ম্ম—ইহারই প্রবুদ্ধ অবস্থায় মানুষ মহাপ্রেমরূপ মহাজ্ঞানের অধিকারী হয়। আমিও ইহার সহিত আর একটি বিদেশী কবির কবি-বচন যুক্ত করিব—এ বচন পূর্ব্বটির মত কোন জার্মান কবির নয়, একজন আধুনিক ইংরেজ কবির, তথাপি আমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। এই কবিও বলিতেছেন—

Here in the flesh, within the flesh, behind,
Swift in the blood and throbbing on the bone,
Beauty herself, the universal mind,
Eternal April wandering alone;
The God, the holy Ghost, the atoning Lord,
Here in the flesh, the never yet explored.

বঙ্কিমচন্দ্রের কবিজীবন সম্বন্ধে আমার আর অধিক কিছু বলিবার নাই।

আষাঢ়, ১৩৪৫

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-প্রসঙ্গ

১. রোমান্টিক ভাবধারা

চিন্তা ও অনুভূতির রাজ্যে চিরপরিচিতের সহিত আত্মীয়তা রক্ষা করা ; বহু-মানবের সমাজে প্রাচীন জ্ঞান-বিশ্বাসের নির্দ্দিষ্ট গভীরাঙ্কিত সহজ সরল পথে চলিয়া যাওয়া ;—নিয়ম-সংযমের অনুবর্ত্তী হওয়ার এই যে ভাব, তাহাই সাহিত্যে 'ক্লাসিক্যাল' নামে পরিচিত। অন্যদিকে, আপনার স্বাধীন অনুভূতি, বাসনা ও প্রেরণার সাহায্যে ব্যক্তিগতভাবে সত্যানুভূতির চেষ্টা ; বহু তর্ক-বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত চিরানুগত প্রথা বা সংস্কারের উপর আস্থা স্থাপন না করিয়া, প্রাণ যাহা চায় তাহাকেই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা ; সামাজিক সুখ, সুবিধা, প্রয়োজন ইত্যাদির বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া, মস্তিষ্ক নহে—হৃদয়ের আলোকে,—যাহাকে সত্যরূপে দর্শন ও প্রতীতি করিয়াছি, তাহাকেই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করা ;—ইহাই 'রোমান্টিক'-ভাব নামে পরিচিত।

রোমান্টিক কল্পনায় আকাঙ্ক্ষা যেমন অপরিমিত, তেমনই তাহাতে তৃপ্তি নাই। অসীম আকাঙ্ক্ষার অসীম অপরিতৃপ্তি—বুক-ভাঙ্গা বেদনা ও নৈরাশ্যের সুর, বিষাদ-ব্যাকুলতা, মহৎ-জীবনের ট্র্যাজেডি, আক্ষেপ ও অনুশোচনা—ইহাই রোমান্টিক সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সুর। মহৎ-হৃদয়, অত্যুচ্চ কল্পনা, ও অতৃপ্ত বাসনার যে অনিবার্য্য পরাজয়, ও তজ্জনিত হাহাকার—তাহাই রচনার প্রকৃতি-ভেদে, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আকারে, রোমান্টিক সাহিত্যে প্রকটিত হইয়াছে। নাট্যসাহিত্যে, শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডির নায়ক—ব্রুটাস, করিওলেনাস, হ্যামলেট ; গীতিকাব্যে, বিদ্যাপতির অমর-গীতি—"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল" ; এবং মহাকাব্যে—'প্যারাডাইজ লষ্ট'-এর Satan ও 'মেঘনাদবধে'র রাবণ ;—ইহারা সকলেই উৎকৃষ্ট রোমান্টিক কাব্যের নিদর্শন।

এইবার আমাদের নবযুগের সাহিত্যে এই রোমান্টিসিজ্‌মের গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিবার অবকাশ হইয়াছে। আধুনিক বাংলা সহিত্যের যে যুগ মহাকাব্যের যুগ—মাইকেল, হেম-নবীনের রচনায় সেই যুগের রোমান্টিসিজ্‌ম্ সম্বন্ধে কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে, তাহাতে স্বাধীন কল্পনার উচ্ছ্বাস, পুরাতন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক নূতন ভাবস্রোতের লীলা, পুরাণ ও ইতিহাস হইতে উপাদান-সংগ্রহ প্রভৃতি—নব স্ফূর্ত্ত কবিচিত্তের স্পন্দন লক্ষিত হয়। কিন্তু এক 'মেঘনাদবধ' ছাড়া আর কোনও কাব্যে সার্থক ষ্টাইল বা আর্টহিসাবে এই নবভাব পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই—একটা চাঞ্চল্য বা অস্থিরতা ভিন্ন সাহিত্যে আর কিছুরই পরিচয় দেয় নাই। মাইকেলের মহাকাব্য য়ুরোপীয় ক্লাসিক্যাল আদর্শে লিখিত হইলেও তাহার ছন্দ, ভাষা ও কাব্যনিহিত কবিহৃদয়ের প্রেরণা

লক্ষ্য করিলে, তাহাকে আমাদের সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক কাব্য বলা যাইতে পারে। কাব্যের আকৃতি বা রচনা-রীতিতে 'রোমান্টিসিজ্‌ম্' নাই সত্য, কিন্তু সমগ্রভাবে তাহার মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে যে স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য ও চরিত্রসৃষ্টির বিশেষত্ব লক্ষিত হয়—তাহাতে যে বিদ্রোহ পরিস্ফুট হইয়াছে—তাহা কোন ইংরেজ রোমান্টিক কবির সাহস ও স্বেচ্ছাবৃত্তির সহিত তুলনায় ন্যূন নহে। বস্তুতঃ এক অমিত্রাক্ষর ছন্দেই যে প্রবল বিদ্রোহ সূচিত হইয়াছে, এবং রাবণের চরিত্রে যে ভ্রুক্ষেপহীন 'Self-representation' বা কবির আত্মপ্রচার-বাসনার পরিচয় পাওয়া যায়—তাহাই তাহাকে আমাদের সাহিত্যে প্রথম ও প্রধান রোমান্টিক রচনার আসন দান করিয়াছে।

এই যুগেই, নব্যসাহিতের আর এক ভাগে—গীতিকাব্যে—যে রোমান্টিক ভাবধারার সূচনা হইয়াছিল, এখানে আমি সেই গূঢ়তর প্রবৃত্তির কথা বলিতেছি না। সে কল্পনা বহির্মুখী নয়—অন্তর্মুখী; তাহা মানব-জীবন ও বহির্জগৎ লইয়া নহে—একান্তভাবে আত্মপরায়ণ। এখানে আমি যে ভাবধারার কথা বলিতেছি, পরবর্ত্তীকালের বাংলা গীতি-কবিতার সুর তাহার বিপরীত; সেই সুরই শেষে মধু-বঙ্কিম-হেম-নবীনের রোমান্টিসিজ্‌ম্‌কে পরাস্ত করিয়া আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের সংঘাত-জনিত এই নবীন চেতনা সর্ব্বপ্রথমে আমাদের সাহিত্যে যেখানে পরিপূর্ণ গৌরবে, প্রোজ্জ্বল প্রভায় প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, তাহা পদ্য নয়—গদ্য, কাব্য নয়—উপন্যাস। এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রোমান্টিক লেখক—বঙ্কিমচন্দ্র; তাঁহার উপন্যাসগুলিই এ যুগের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কাব্য, রোমান্টিক কল্পনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। মাইকেল হৃদয়ে যাহা পাইয়াছিলেন কাব্যে তাহা ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই; তাঁহার রচনাগুলিতে আমরা অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় পাই মাত্র। তাঁহার হৃদয়ে যে দ্বন্দ্ব জাগিয়াছিল তিনি তাহাকে আয়ত্ত করিয়া সাহিত্যে সুপ্রকাশ করিতে পারেন নাই—নূতন চিন্তা-ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া এই দ্বন্দ্বের সমন্বয় চেষ্টা করেন নাই, স্বাভাবিক কবিত্বের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। কেবলমাত্র প্রতিভার যে শক্তি, তাহা তাঁহার মত আর কাহারও ছিল না,—কিন্তু বঙ্কিমের মনীষা উচ্চতর; তাই তাঁহার ভিতরে সেই দ্বন্দ্ব এক অপূর্ব্ব সাহিত্য-সৃষ্টিতে নিঃশেষ হইতে চাহিয়াছে। দ্বন্দ্ব থাকিবে, অথচ দ্বন্দ্বের অতীত হওয়া চাই—এই অতীত হওয়ার শক্তিই কল্পনার সংযমরূপে কবির প্রধান সহায়। বঙ্কিমের হৃদয় এই নব-ভাবে একেবারে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সেই ভাবাতিরেককে তিনি যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই—তাহাকে যেমন অনুভব করিয়াছিলেন, তেমনি দূরে ধরিয়া তাহাকে বিশেষরূপে চিনিতে চাহিয়াছেন। একদিকে ইংরেজী সাহিত্য তাঁহাকে যেমন মুগ্ধ করিয়াছিল, তেমনই অপরদিকে ইংরেজের ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান তাঁহার বিচার-বুদ্ধি জাগাইয়াছিল, তাহার আলোকে তিনি আপনার দেশের ইতিহাস ও দর্শন-বিজ্ঞানের অন্ধকার মণিগৃহে অতি-সন্তর্পণে ভক্তিকম্প্রপদে প্রবেশ

করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বিচারশীল বঙ্কিম দেশের অতীতকে কেবল ভাবের দ্বারাই গ্রহণ করিতে পারেন নাই; তাহার একটি ধ্যান-সম্মত মূর্ত্তি গড়িয়া দেশকে ভালবাসিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা, হিন্দুদর্শনের যে অর্থ, তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সেই বিচারশীলতার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া। মাইকেলের এসব উপসর্গ ছিল না; নবীনও ভক্তিধর্ম্মের প্রাবল্যে সকল দ্বন্দ্বের নিরসন করিয়াছিলেন; বঙ্কিম ইহার কোনটাই পারেন নাই। এতকথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বঙ্কিমের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বাতীত হইবার আকাঙ্ক্ষা —উভয়ই প্রবল ছিল; এই গুণে, তাঁহার সাহিত্য-সাধনা, সেই যুগের আকস্মিক ভাবোচ্ছ্বাসকেই আশ্রয় করিয়া নহে—আমাদের জীবনে যাহা নূতন সত্যরূপে চিরস্থায়ী হইতে আসিয়াছে, তাহাকেই বরণ করিয়া, এবং তৎসঙ্গে অতীত জাতীয়-সাধনার সংযোগ রক্ষা করিয়া—প্রকৃত নব্যসাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল।

কিন্তু দ্বন্দ্ব রহিয়া গিয়াছে, তাঁহার প্রাণ পরিতৃপ্ত হইতে পারে নাই, তাই তাঁহার কাব্যগুলি এত মনোহারী। সৌন্দর্য্যানুভূতি, পৌরুষাভিমান ও স্বদেশ-প্রীতি এই তিনের অপূর্ব্ব মিলন, এবং মানব-জীবনের গৌরব ও মাহাত্ম্যবোধ—এক অসাধারণ কবি-প্রতিভার বলে আমাদের সাহিত্যে যে অপরূপ ভাবজগৎ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা কখনও পুরাতন হইবে না। তাঁহার উপন্যাসগুলিতে মানব-হৃদয়ের প্রবলতম আকাঙ্ক্ষা ও তাহার নিষ্ফল পরিণামের যে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে তাহা সর্ব্বযুগের উন্নত মানব-হৃদয়ের ইতিহাস। তিনি মানব-ভাগ্যের নিষ্ঠুর নির্ম্মম বিধানের কোন সদর্থ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে চান নাই—সেখানে তাঁহার মজ্জাগত 'রোমান্টিসিজ্‌ম্' জয়ী হইয়াছে। মহৎ প্রাণের যে শ্রেষ্ঠ প্রেরণা ও প্রাণপণ প্রয়াস, তাহা ঐ নিষ্ফলতার গৌরবেই যেন সমধিক বরণীয় হইয়া উঠিয়াছে; নিয়তি তাহাকে নিহত করিয়াও আপনি পরাজিত হইয়াছে। সে জীবনের পরিণামদৃষ্টে অশ্রু স্তম্ভিত হইয়া যায়, মানব-জীবনের না হউক—মানব-হৃদয়ের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া জয়গর্ব্বে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠে। নিষ্ফলতা কোথায়? নিষ্ফলতায় কি আসে যায়? পাওয়াটাই বড় নহে, চাওয়াটাই বড়। পাওয়া কিছু যায় না, তাই বলিয়া চাওয়াটাকে ছোট করিব কেন? এই চাওয়া, এই যে ক্ষুধা—ইহাই মানুষের অমরত্বের নিদান; যে পরিমাণে জগৎ এই ক্ষুধার পরিতৃপ্তিসাধনের অনুপযোগী, সেই পরিমাণে মানুষ এই জগৎ হইতে বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত। মানব-প্রাণের পক্ষে জাগতিক বিধি-ব্যবস্থার এই সঙ্কীর্ণতা—এই 'শেকস্‌পীরিয় ট্র্যাজেডি'র প্রধান লক্ষণ পূর্ণ প্রকটিত হইয়াছে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কাব্য 'চন্দ্রশেখরে'। প্রতাপ তখন অগাধ জলে সাঁতার দিতেছে; যে অমৃত-লালসা তাহার মরজীবনে অমরতা আনিয়াছে, সেই অমৃত ধরণীর পাত্রে তীব্র হলাহলে পরিণত হইয়াছে, তাই সে তাহাকে নিঃশেষে বর্জ্জন করিবে—শৈবলিনীকে অতি ভীষণ শপথ করাইবে। এমনই সময়ে ঊর্দ্ধ আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রতাপ

বলিয়া উঠিল—কি পুণ্য করিলে ঐ উপরকার নীলসমুদ্রে অবলীলায় সাঁতার দেওয়া যায়? নিম্নে কি সংগ্রাম! উপরে কি শান্তি! তরঙ্গবিক্ষুব্ধ জাহ্নবী-জীবনে প্রতাপ নিরতিশয় পরিশ্রান্ত, কিন্তু তাহার আকাঙ্ক্ষা তেমনি বলবতী—সে কিছুতেই হার মানিবে না। অন্তরের ঐ বাসনা এমনি মহৎ, এমনি উচ্চ যে, এই দুর্ভাগ্য-পীড়িত আঘাত-জর্জ্জর নিমজ্জমান মানব-সন্তান আমাদের চক্ষে আদৌ কৃপার পাত্র হইয়া উঠে নাই, পরন্তু ভক্তি ও সম্ভ্রমে আমাদের হৃদয় আপ্লুত করিয়া দেয়। প্রতাপ যখন প্রাণবিসর্জ্জন করিতে পুনরায় যুদ্ধে চলিয়াছে তখন রামানন্দ স্বামীর প্রশ্নে সেই যে উত্তর করিল—'মরিতে যাইতেছি', সে কথার অর্থ আর কিছুই নয়, শেক্স্পীয়রের ক্লিওপেট্রা আত্মহত্যার পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিল তাহাই —'I have immortal longings in me'। আমি এই উপন্যাসকে বঙ্কিমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কাব্য বলিয়াছি এই জন্য যে, ইহার মধ্যে তাঁহার রোমান্টিক হৃদয়ের ভাবৈশ্বর্য্য যেমন পরিপূর্ণ নিখুঁত আকারে প্রকাশ পাইয়াছে, তেমন আর কোনটাতেই হয় নাই। কেন, তাহা বলিতেছি। রোমান্টিক কবিগণ যে সত্য-সুন্দরের পূজারী তাহার মধ্যে সমাজ-সম্মত নীতিবাদের দোহাই নাই; পাপ করিলে তাহার দণ্ড, বা পুণ্যকার্য্যের পুরস্কার যে হওয়াই চাই, তাহা না হইলে কাব্যের কোনও গুরুতর দোষ ঘটে—এমন কোন ন্যায়-ধর্ম্মের প্ররোচনা তাঁহাদের কাব্যসৃষ্টির মূলে বিদ্যমান নাই। এ-জাতীয় কাব্যের যদি কোনও নৈতিক মূল্য থাকে, তাহা আরও উচ্চাঙ্গের, এবং তাহা রসিক-জনের নিকটেই আছে। ওথেলো এমন কোন পাপ করে নাই যাহার জন্য এত বড় ভয়াবহ পরিণাম ঘটিতে পারে; হ্যামলেটও কোন পাপ করে নাই, বরং পাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল; কর্ডেলিয়ার অপেক্ষা মধুরতর প্রকৃতি আর কি হইতে পারে? তবে এমন সর্ব্বনাশ কেন হইল? তবে কি ঐ-সকল নাটক আমাদের নীতিজ্ঞানকে খর্ব্ব করে? পূর্ব্বে বলিয়াছি, জয়-পরাজয়, দণ্ড-পুরস্কার নহে—জীবন-সংগ্রামের ভীষণতার মধ্যে নায়ক-নায়িকার চরিত্রের যে মহত্ত্ব বা শক্তির সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, এ সকল কাব্যে তাহাই আমাদিগকে গভীর ভাবে আশ্বস্ত করে। হৃদয় মহৎ, আকাঙ্ক্ষা মহৎ, যাহা চাই তাহা পাইবার জন্য সর্ব্বস্ব-পণ—বিরাট, দুর্নিবার কামনাশক্তির সেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত লীলায় এই মৃত্তিকার কারাগার চূর্ণ হইয়া যায়! সেই ধ্বংসেরই মধ্যে যে রমণীয়-গম্ভীর আলোক বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, তাহা এই 'লোক-চরচা'র পাপ-পুণ্যবোধের ক্ষুদ্র সমস্যা পূরণ করে না, তাহা হৃদয়কে ঊর্দ্ধতর লোকে লইয়া যায়, এবং এক পরমসুন্দর অনুভাব-রসে আপ্লুত করিয়া কৃতকৃতার্থ করিয়া দেয়। তাই রোমান্টিক সাহিত্যকলা এরূপ নীতিবাদকে অগ্রাহ্য করে; কোন ধর্ম্ম বা পরলোকের আশ্বাস তাহাতে নাই। হৃদয়ের মহত্ত্বই এক-মাত্র ধর্ম্ম,—সে ধর্ম্মের পরিণামচিন্তার প্রয়োজন নাই; মনুষ্যজীবনে নীতি যদি কোথাও থাকে, তবে হৃদয়ের সেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগেই তাহা আছে। ধর্ম্ম-বিশ্বাস—পরলোকের আশ্বাস—মানুষের স্বভাবধর্ম্মকে খর্ব্ব করে; বরং মানব-ভাগ্যের দুর্জ্ঞেয়তা, পরজীবনের রহস্য ও তজ্জনিত নিরাশ্বাস হৃদয়কে আশ্রয়হীন

করিয়া যে নব নব ভাবলোকের সৃষ্টি করে, তাহার অসীম বৈচিত্র্য ও অনন্ত সৌন্দর্য্যই রোমান্টিক সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। এই যে দুজ্ঞের্য়তা, ও তজ্জনিত নিরাশ্বাসের অনির্ব্বচনীয় ভাবসৌন্দর্য্য, ইহাই 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে পূর্ণপ্রকটিত হইয়াছে। প্রতাপের যে পরিণাম তাহা কোন অর্থে পরাজয় নহে; ভবানন্দ, গোবিন্দলাল, সীতারাম, নগেন্দ্রনাথের মত, প্রতাপ কোনও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে নাই, সে তাহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। এতবড় অন্তর-সংগ্রাম আর কোন বাংলা কাব্যে চিত্রিত হয় নাই; সেই সংগ্রামে এতখানি শক্তির পরিচয় —যে শক্তি এমন অবস্থায় এমন করিয়া আত্মবিসর্জ্জন করে, প্রেমের এমন 'রূপান্তর' —আর কোথাও কাব্যসৃষ্টিতে এমন সার্থক হয় নাই। আর একটি কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের নামকরণ ওরূপ হইল কেন? চন্দ্রশেখরের চরিত্র যেমনই হোক্, এ গ্রন্থের নায়ক অবশ্যই প্রতাপ। আমার একটি সন্দেহ আছে,—চন্দ্রশেখর, প্রতাপ ও শৈবলিনী, এই তিনটি চরিত্রের ইঙ্গিত বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় Tennyson-এর 'Idylls of the King'-কাব্য হইতে পাইয়াছিলেন; কারণ এই তিনটির সহিত উক্ত কাব্যের Arthur, Lancelot ও Guinevere-এর সাদৃশ্য বেশ স্পষ্ট বলিয়া মনে হয়। শৈবলিনী যখন প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরের চিত্ত স্থির করিতেছে, তখন Guinevere-এর ঠিক ঐ অবস্থা স্মরণ হয়। তবে কি বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখরকেই নায়ক করিতে চাহিয়াছিলেন? তাহা ত' হইবার নয়। Tennyson-এর 'mid-Victorian morality' যে আর্থার-চরিত্র গড়িয়াছে, বঙ্কিমের খাঁটি রোমান্টিক প্রতিভা সে আদর্শে আকৃষ্ট হয় নাই। বঙ্কিমের Lancelot-এর কাছে বঙ্কিমের Arthur একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে; বস্তুতঃ চন্দ্রশেখর-চরিত্রে মহত্ত্বের একটা আভাসমাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা একেবারেই ফোটে নাই; এইজন্য বঙ্কিমের কাব্য ও Tennyson-এর কাব্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। সর্ব্বশেষে আর একটি কথা না বলিলে একটু গোল থাকিয়া যাইবে। বঙ্কিমের কোন কোন উপন্যাসে ধর্ম্ম ও পরলোকের যে ইঙ্গিত আছে, তাহা সেই সান্ত্বনার নিষ্ফলতারই পরিচয় দিবার জন্য নিপুণ শিল্পীর উদ্ভাবনা। এ সম্বন্ধে বিচার করিবার কিছুই নাই। গোবিন্দলাল যখন সন্ন্যাসী হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'আমি ভ্রমরাধিক ভ্রমর পাইয়াছি', অথবা, কবি যখন নিজেই প্রতাপের উদ্দেশ্যে বলিলেন, 'যাও প্রতাপ সেই অমরধামে',—তখন আমাদের প্রাণ আরও অধীর হইয়া উঠে, সে সান্ত্বনা কিছুতেই গ্রহণ করে না; পাঠকের চিত্তে এইরূপ বিদ্রোহ-উদ্দীপনাই কবির অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের যুগকে কেহ কেহ 'Hindu Revival' বা 'হিন্দুর নব-জাগরণের যুগ' বলিয়া থাকেন; সাহিত্যের দিক দিয়া, এরূপ বলিলে হানি নাই, যদি ইহাকে—ইংরেজী কাব্যের রোমান্টিসিজ্‌মকে Mediaevalism বলার মত ধরিয়া লওয়া হয়। জাতীয়-সাধনার প্রতি—দেশের অতীত-ইতিহাসের প্রতি কবিত্বময় অনুরাগ বঙ্কিমের যুগে আমরা সাহিত্যক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ দেখিতে পাই,

জীবনে বা সমাজ-ব্যাপারে যদি কোন তরঙ্গ উঠিয়া থাকে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। এইরূপ অনুরাগকে জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া —অতিশয় সঙ্কীর্ণ রক্ষণশীলতা বলিয়', যাঁহারা ধিক্‌কৃত করিতে চান, তাঁহাদের বিচার-বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। বঙ্কিমের যুগ অতি প্রবল ও গভীর ভাবুকতার যুগ, অন্তর্গূঢ় দ্বন্দ্ব ও বিপ্লবের যুগ ; তাহা যাহাকে আশ্রয় করিয়া যুঝিতে চাহিয়াছিল—তাহা দেশের অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা। হৃদয় চিন্তাশক্তিকে অভিভূত করিয়াছিল—এই হৃদয়-বল না থাকিলে, দেশের প্রতি স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত অনুরাগ না জন্মিলে, আজ আমরা কোথায় দাঁড়াইতাম কে বলিতে পারে। তখন বেড়া দিবার, বাঁধ বাঁধিবার আবশ্যক হইয়াছিল, নতুবা সব যায়। উচ্চ-চিন্তা বা উদারতার অভাব আর যাহার মধ্যে থাক্, যুগনায়ক বঙ্কিমের মধ্যে ছিল না। যেটুকু সঙ্কীর্ণতা ছিল তাহা ধর্ম্মের গোঁড়ামি নহে—জাতীয় সম্মানবোধ, পূর্ব্ব পিতৃগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা,—অতি উচ্চহৃদয়ের উচ্চতম বৃত্তি, অতি পবিত্র সেণ্টিমেণ্ট, অতি নির্দ্দোষ মোহ। ইহাই তাঁহার রোমাণ্টিসিজ্‌মের মূল ; তিনি তথাকথিত ধার্ম্মিকতা জাগাইয়া তুলিতে চান নাই। তাঁহার ধর্ম্মনৈতিক প্রবন্ধগুলিও খাঁটি হিন্দু চিন্তাপ্রসূত নয় ; তাহার মধ্যে সংস্কারকের ভাব, এমন কি বিপ্লবের বীজ আছে—রক্ষণশীলতা, সঙ্কীর্ণতা নাই। ইংলণ্ডের Oxford Movement-এর নায়ক Cardinal Newman-এর মত, অথবা জার্ম্মানীর নব্য-সাহিত্যের অন্যতম নেতা Schlegel-ভ্রাতৃদ্বয়ের মত, তিনিও আচারে বিশ্বাসে রক্ষণশীল ছিলেন না।

উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাহিত্য হইতে খাঁটি রোমাণ্টিক প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই, বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে নবযুগের নূতন-মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি ও উদ্গাতা কবি হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি, যে অর্থে—Hindu Revival-এর নায়ক, তাহা কোন অংশে সংকীর্ণ নহে ; তাহার দ্বারা—যেমন উৎকৃষ্ট সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল, তেমনই জাতির প্রাণমূলে নবজীবনসঞ্চার হইয়াছে। অতএব, রোমাণ্টিসিজ্‌ম্' বলিতে যে ভাবধারা বুঝায়—সাহিত্যের চিরন্তন রূপ-বিচারে তাহার মূল্য যেমনই হৌক—ভাবের দিক দিয়া, অর্থাৎ বিশিষ্ট 'কবি-প্রেরণা-হিসাবে' সাহিত্যে তাহার ফলাফল অস্বীকার করা যায় না ; এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তাহার ফল নিতান্ত অল্প হয় নাই।

২. ট্র্যাজেডি-কল্পনা

পাশ্চাত্ত্যসমাজে নাটকের আকারে এক নূতন কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই কাব্যের নাম 'ট্র্যাজেডি'। ইহা দুঃখেরই নাটকীয় রসরূপ। গানে আমরা দুঃখকে অনুভব করি মাত্র, নাটকে তাহাকে দেখি ; এই যে প্রভেদ ইহা একটা বড় প্রভেদ। অনুভূতিতে কোন প্রশ্ন নাই, একটা ভাবাবস্থা আছে ; গানে একটা অতি ক্ষুদ্র ঘটনা, একটা সামান্য পরিস্থিতি, কিংবা মন বা প্রাণের একটা বিক্ষোভকে আশ্রয় করিয়া ঐ ভাবাবস্থার সৃষ্টি করিতে পারিলেই

হইল ; সে যেন জীবন-সমুদ্রের কূলে বসিয়া বাঁশী-বাজানো, ঝটিকাক্ষুব্ধ তরঙ্গ-কল্লোল দূর হইতে একটা সুরের মত ভাসিয়া আসে—বাঁশী সেই সুরেই ভরিয়া উঠে। কিন্তু নাটকে আমরা সেই ঝটিকাগর্জ্জন ও তরঙ্গভঙ্গের অতিশয় নিকটে, এমন কি, মধ্যে গিয়া দাঁড়াই, সেখানে দুঃখের যে মূর্ত্তি দেখি তাহা ভাবমূর্ত্তি নয়, প্রত্যক্ষ বাস্তব-রূপ। তাহাতে শুধুই সুর নয়, একটা প্রবল ধাক্কা আছে ; কেবল রসাস্বাদ নয়—আক্ষেপ আছে, প্রশ্ন-কাতরতাও আছে। জীবনের ঐ দুঃখ-রূপটাকে যে-নাট্যকলায় পাশ্চাত্ত্য কবিগণ একটা নূতন অর্থে নূতন ভঙ্গিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই ট্র্যাজেডিই সে সাহিত্যের একটি অনর্ঘ ও অপরূপ সৃষ্টি। সেই দুঃখ সেই যন্ত্রণা সহ্য করিবার যে শক্তি তাহাই মানুষের পৌরুষ ; তাই নাটকে উপন্যাসে ঐ দুঃখ মানুষের চক্ষে কেবল অশ্রুর ধারাই বহাইবে না—তাহার সকল হীনতা ও দীনতাকে তিরস্কৃত করিয়া, চিত্তে একটি কঠোর তৃপ্তি ও প্রশান্তির উদ্রেক করিবে। এই রসই ট্র্যাজেডির রস।

এ রস আমাদের ভারতীয় বা হিন্দু সাহিত্যের রস নয়, আমরা জীবনেও এই রসকে প্রশ্রয় দিই না। তাহার কারণ, ইহা একরূপ দুঃখেরই পূজা। মানুষের মাহাত্ম্য-বোধের জন্য দুঃখকেই একান্ত করিয়া দেখিতে হইবে ; জীবন ও জগতের কোন গভীরতর অর্থ—সুখ-দুঃখ, জীবন-মৃত্যুর সমন্বয়মূলক কোন সত্যের পিপাসা ইহাতে নাই। ভারতবর্ষের মানুষ দুঃখকে, মৃত্যুকে বা ঐকান্তিক বিনাশকে কিছুতেই সত্য বলিয়া স্বীকার করে নাই। সে প্রথম হইতেই আনন্দকে—অমৃতকেই একমাত্র তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছে ; তাই কপিল বুদ্ধও হার মানিয়াছেন। ট্র্যাজেডি-নামক ওই কাব্যকুসুমের মূল ভারতীয় চিত্তভূমিতে নাই ; দুঃখকে সে অস্বীকার করে না—কোন মানুষই তাহা পারে না ; কিন্তু আত্মার অজেয় বীর্য্য সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যু বা ধ্বংসই যে সর্ব্বগ্রাস করিবে, এখানকার মানুষ তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না বলিয়া ঐরূপ ট্র্যাজেডি তাহার নিকটে অমূলক ; কাব্যে-নাটকেও সে মৃত্যুর মহাগহ্বর পূর্ণ করিয়া দেয়, অমূলক ও অর্থ-হীন বলিয়াই সে এইরূপ কাব্যরসকে পরিহার করিয়াছে।

আমাদের নব্যসাহিত্যে কেবল একজন মাত্র ঐ রসতত্ত্ব ও তাহার কলা-কৌশলকে যেমন আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এমন আর কেহ পারেন নাই—বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে ঐ য়ুরোপীয় ট্র্যাজেডির রসপ্রেরণা এক নূতন রূপে ও নূতন ভঙ্গিতে ধরা দিয়াছে, ঐ গদ্য কথাকাব্যগুলিতেই আমরা রোমাণ্টিক ট্র্যাজেডির প্রায় সেই শেকস্‌পীরিয় কাব্যরস কিয়ৎ পরিমাণে আস্বাদন করিয়া থাকি। কিন্তু যেহেতু ঐরূপ ট্র্যাজেডি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার অনুকূল নয়, এবং যেহেতু নবত্বের বিস্ময়ই আমাদের রসবোধের একমাত্র মাপকাঠি, এবং যেহেতু বাঙলা সাহিত্য এ পর্য্যন্ত পণ্ডিতের অনুকম্পা ও মূর্খের বিলাসব্যসনের অতিশয় সুখকর স্থান হইয়া আছে, সেইজন্য—বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ কাব্যগুলির নবত্বলোপ হওয়ায়, তাহারা পণ্ডিত ও মূর্খ উভয়গোত্রীয় পাঠকের পাঠশালা

হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক সংজ্ঞা-অনুযায়ী উপন্যাস রচনা করেন নাই, অতএব সেদিক দিয়া উহাদের কোন পরিচয়ই যথার্থ হইতে পারে না; তিনি যাহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মূল্য-নিরূপণ করিতে হইলে উৎকৃষ্ট রোমাণ্টিক ট্র্যাজেডির আদর্শেই তাহা করিতে হইবে, এবং তাহাতেও তাঁহার নিজস্ব প্রেরণা ও কল্পনার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এখানে সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। আমি আমাদের সাহিত্যে ট্র্যাজেডির অস্তিত্ব ও প্রসারের কথাই বলিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র ঐ য়ুরোপীয় কাব্যরসকে অধিগত করিয়া তাঁহার উপন্যাসগুলিতেই সেই রস একরূপ নাটকীয় ভঙ্গিতে পরিবেষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও মধ্যপথে ভারতীয় বা হিন্দু সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সেই য়ুরোপীয় আদর্শ রক্ষা করিতে পারেন নাই, বা চাহেন নাই। য়ুরোপীয় আদর্শেই তিনি তাঁহার ট্র্যাজেডির অঙ্গবিন্যাস করিয়াছেন সত্য; তিনিও দৈব বা অদৃষ্ট, villain বা দুর্বৃত্তের দুরভিসন্ধি, আত্মঘাতী প্রবৃত্তি বা দুর্দ্দমনীয় বাসনা প্রভৃতির কারণে পুরুষের নিদারুণ পরিণাম চিত্রিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেইরূপ ট্র্যাজেডি-প্রীতিও ক্রমে সংযত হইয়া আসিয়াছে; মানুষের নিজ আত্মারই মহিমাবোধ—সব হারাইয়াও একটা উচ্চতর অধিকার বা মহত্তর সম্পদের আশ্বাস—প্রকৃতির সেই ছলনাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিতে পারা—ইহাই তাঁহার ট্র্যাজেডির গূঢ়তর প্রেরণা হইয়াছে। 'বিষবৃক্ষ' পর্য্যন্ত তিনি য়ুরোপীয় আদর্শই গ্রহণ করিয়াছিলেন; 'কৃষ্ণকান্তের উইল' হইতে তাঁহার কল্পনা ভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়াছে, যদিও 'সীতারাম' ও 'রাজসিংহে' সেই য়ুরোপীয় ট্র্যাজেডিই এক নূতন ছন্দে তাঁহার কল্পনাকে পুনরায় আশ্রয় করিয়াছে। কারণ, 'সীতারামে' সেই অতি ভীষণ অদৃষ্টের লীলা—প্রেমময়ী সাধ্বী স্ত্রীর মূর্ত্তিতেই তাহার সেই যে নিষ্ঠুরতা ও সর্ব্বনাশ-সাধন, এবং 'রাজসিংহে'ও পুরুষবীর মোবারককে প্রবৃত্তির ক্রীড়নক করিয়া তাহার জীবনেও দৈবের সেই অট্টহাস—কো অধ্যাত্মনীতি বা ন্যায়নীতি দ্বারা সেই ট্র্যাজেডির অন্ধকার ভেদ করা যায় না। 'সীতারাম'-রচনাকালে বঙ্কিমকে কি পাইয়া বসিয়াছিল জানি না; বোধ হয়, পুরুষ-ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিকশক্তি এবং প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বা অন্ধপ্রবৃত্তি এই দুইয়ের কোনটাকে তুচ্ছ করিতে না পারিয়া—অথচ আধ্যাত্মিকতার প্রতি পক্ষপাতের বশে, তিনি এই কাব্যে যেন নিজের কাছেই নিজে হার মানিয়াছেন; আর কোন কাব্যে তিনি ধ্বংসের এমন বিরাট অগ্ন্যুৎসব সৃষ্টি করেন নাই। কে জানে, হয়ত এইকালে কবির ব্যক্তি-জীবনেও একটা দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, তাই সর্ব্বধ্বংসের এইরূপ কল্পনা বড়ই আনন্দদায়ক হইয়াছিল।

তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রের ট্র্যাজেডিগুলিতে সাধারণতঃ সেই খাঁটি য়ুরোপীয় প্রেরণার সংশোধনই লক্ষ্য করা যায়। তিনি মানুষের মহত্ত্বকে ধর্ম্মবিশ্বাসের মতই বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু সে মহত্ত্ব তাহার নিজেরই নয়—একটা পরমা-শক্তির অংশ বলিয়াই সে মহৎ; সেই শক্তির শাসন তাহার নিজেরই আত্ম-শাসন; সেই শাসনকে

অগ্রাহ্য করার যে শাস্তি তাহা যতই শোকাবহ হোক, সেই শাস্তির দ্বারাই মানুষ তাহার যথার্থ মর্য্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আর একটা কথাও আছে। মানুষ ছোট নয় সত্য, তাহার মহত্ত্বের সীমা নাই ইহাও সত্য ; কিন্তু তাহার দেহ দুর্ব্বল, ইহাও সত্য। এই দুর্ব্বল দেহের দুর্ব্বল হৃদয়ের যত কিছু মোহ—জীবন ও জগতের রঙ্গশালায় শত বর্ণে শত শিখায় স্ফুরিত হইতেছে ; যাহা মূলে মিথ্যা তাহাই অপূর্ব্ব চিত্রে চিত্রিত হইয়া জীবনের যবনিকাখানিকে কি বিচিত্র, কি সুন্দর করিয়া তুলে ! কবি বঙ্কিম এই মিথ্যাকেও মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহাকেই সর্ব্বোপরি স্থান দেন নাই। সত্যই যদি শিব হয়, তবে ঐ মিথ্যাও শিবমোহিনী, শিবকে সম্মুখে রাখিয়াই তিনি ঐ শিবমোহিনীর রূপসুধা আকণ্ঠ পান করিয়াছেন। পাশ্চত্ত্য ট্র্যাজেডিতে এই প্রকৃতির যে উপাসনা আছে তাহা অন্যরূপ, তাহার সম্মুখে শিব নাই—বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ প্রকৃতি মোহিনী হইলেও বরদাত্রী। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুকোমল ছায়াদ্বারে তাহার যে রূপ-রাশি পুরুষকে পরশ-বিভোল করে, তাহার রসও যদি আস্বাদন না করিলাম, তবে একটা অত্যাবশ্যক চিত্ত-কর্ষণ হইতেই বঞ্চিত হইলাম। ঐ সৌন্দর্য্যের জ্বালাও সেই সত্যের সোপান ; কেবল আগুন নয়, আহুতির কথাও মনে রাখিতে হইবে, ঐ আহুতির পর যে হবিঃশেষ-ভোজন তাহাই ত' দেবতার সহিত যজমানের একত্ববিধান করে।

৩. নাটক না হইবার কারণ

নাটকের কথা বলিতেছিলাম। নাটক ও উপন্যাস এক নয় ; তথাপি শেক্সপীয়ারের পদ্য-নাটকের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যকাব্যের—তাঁহার উপন্যাসগুলির তুলনা করা যাক। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য-ট্র্যাজেডিগুলি যেমন নাটকও নয়, তেমনই পদ্য-কাব্যও নয় ; অথচ শেক্সপীয়ারের নাটকীয় ট্র্যাজেডির অনেক লক্ষণ তাহাদের প্রেরণার মূলে রহিয়াছে ; এবং গদ্যে হইলেও সেই কবিত্ব তাহাতে প্রচুর। কিন্তু তথাপি সেগুলি নাটকের আকার পায় নাই এইজন্য যে, তাহারা কেবল দৃশ্য নহে, পাঠ্যও বটে—ঘটনাবস্তু হইতে কবি আপনাকে একেবারে সরাইয়া লইতে রাজী নহেন,—কেবল দেখিলেই চলিবে না, তাঁহার কথাও শুনিতে হইবে ; এইজন্য নির্ম্মাণকৌশলেও ইহা গদ্য-কাব্য, নাটক নহে। ইহারও কারণ, কবির দৃষ্টি এখানে কেবল রসদৃষ্টিই নহে, সেই রসদৃষ্টির সঙ্গে একটা সচেতন ব্যাখ্যা-প্রবৃত্তি আছে। অতএব, যেজন্য তাহা নাটক হইতে পারে নাই, সেইজন্য তাহা গদ্যও হইয়াছে। নাটকও গদ্য হইতে পারে ; বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্য নাটকীয় গুণসম্পন্ন হইয়াও নাটক হয় নাই কেন তাহা বলিয়াছি ; আবার ভাব-প্রধান হইয়াও তাহারা গদ্যছন্দ আশ্রয় করিয়াছে কেন, তাহাও বলিতেছি। এই কাব্যগুলিতে কবির রসদৃষ্টি বস্তুর ভাবরূপকে যেমন প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তেমনই, সেই ভাবরূপের উপরে আপনার অতিজাগ্রত মানস-চেতনার শাসন কখনও ত্যাগ করে নাই। যে আধ্যাত্মিক বৃত্তিবিশেষকে আমাদের শাস্ত্রে বিবেক বলে, বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-

প্রবৃত্তিকে সেই বিবেক ভিতর হইতে বন্ধাবন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, এ যেন প্রকৃতির সঙ্গে রস-সঙ্গ করিয়াও পুরুষ আপনাকে অসঙ্গ রাখিতে চায়; সেই সঙ্গ-সুখের মধ্যেই যে মুক্তি, তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারে না। কবি-মানসের এই অতি-জাগ্রত চেতনা জগৎ ও জীবনের রসরূপকেই একান্ত হইতে দেয় নাই—রূপরসের যে আত্যন্তিক আবেশ বাণীকে ছন্দোময় করিয়া তোলে, তাহাকে বশে রাখার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যগুলি পদ্য-নাটক না হইয়া গদ্য-ট্র্যাজেডি হইয়াছে। শেক্সপীয়ার ও বঙ্কিম উভয়ের কাব্যের বিষয়বস্তু এক, এবং কবিপ্রেরণাও মূলে সগোত্র বলিয়া মনে হয়, তথাপি একজনের কবিদৃষ্টি অবিমিশ্র বলিয়া—জগৎ ও জীবনের বস্তুগত সত্তাকে রসরূপে আত্মসাৎ করিবার শক্তি দ্বিধাহীন বলিয়া—তাহা কাব্যমন্ত্র-সাধনায় পূর্ণসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; অপরের দৃষ্টি সেইরূপ দ্বিধাহীন নয়—বস্তু ও ভাবের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে, একে অন্যের উপর প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছে, এবং শেষ পর্য্যন্ত একেরই জয় হইয়াছে। অথচ এই কাব্যগুলির উপাদান ও প্রেরণা এমনই যে, গদ্য-উপন্যাস হইলেও তাহারা বারবার শেক্সপীয়ার-কেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

বঙ্কিম-প্রতিভার একটি বৈশিষ্ট্য

আজ আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করিতেছি—স্মৃতি-উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার প্রতি বাঙালী জাতির শ্রদ্ধা নূতন করিয়া উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিতেছি। বঙ্কিমের প্রতিভা ও বঙ্কিমের কীর্ত্তি, জাতির জীবনে তাঁহার দান ও ইতিহাসে তাঁহার স্থান—আমরা এ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া নিরূপণ করি নাই, বিস্মৃতির কারণ তাহাই। কিন্তু আজ আমরা এই স্মৃতিপূজার অনুষ্ঠান করিয়াছি, ইহা কি কেবল তাঁহাকে স্মরণ করিবার জন্য? কেবল স্মরণ করিয়া লাভ কি? বঙ্কিমচন্দ্রের মত পুরুষকে কেবল স্মরণ করিলেই পরমার্থ লাভ হইবে না—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় স্থাপন করিতে হইবে, এবং এক্ষেত্রে সে পরিচয় জাতির আত্ম-পরিচয়েরই মত। কারণ তাঁহার মত পুরুষ একটা জাতি ও যুগের প্রতীক—সে পুরুষের মধ্যে বাঙালী আপনারই প্রতিভার দীপ্ত রূপ দেখিতে পাইবে; যুগসন্ধির সেই মহাসঙ্কটকালে এই পুরুষের মধ্যেই সে একদিন নিজের পূর্ণশক্তি কেন্দ্রীভূত হইতে দেখিয়াছিল, তাহার নিজেরই স্তিমিতচেতনা এই প্রতিভার দিব্যচ্ছটায় স্ফুরিত হইয়া তাহার যাত্রাপথ আলোকিত করিয়াছিল। বঙ্কিম-চন্দ্রের যে-মূর্তি সকল নশ্বরতা হইতে মুক্ত হইয়া দীপ্যমান রহিয়াছে, তাহা যেন এই জাতির জীবনজলাশয়ের গভীর তল হইতে উত্থিত একটি প্রস্ফুট প্রাণ-শতদল। অতএব কেবল নাম-স্মরণ নয়, সেই মূর্ত্তির পূর্ণ ধ্যান করিয়া আমাদিগকে পুনরায় আত্মসাক্ষাৎকার করিতে হইবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী জাতির ইতিহাসে যে যুগান্তর অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল, সে যুগান্তরের প্রাণান্ত বিক্ষোভকে নবজীবনধারায় নূতন সৃষ্টির পথে প্রবাহিত করিবার জন্য যে প্রতিভার ও মনীষার স্ফুরণ আমরা ঐ যুগে নানাভাবে হইতে দেখিয়াছি বঙ্কিমচন্দ্রে তাহাই সার্থক হইয়াছিল। আজ বাঙালী সে যুগের সেই বিক্ষোভ আর প্রত্যক্ষ করিতেছে না বটে, কিন্তু তাহার আধুনিক মনোজীবনের অন্তস্তলে সেদিনের সেই বন্যা হইতে যে পলিমৃত্তিকার স্তর সঞ্চিত হইয়া আছে, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রেরই অসাধ্যসাধনের ফল। এখনও—বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে—আমরা যে কয়টি প্রধান ভাবচিন্তা লইয়া আন্দোলন-আলোচনা করিয়া থাকি তাহারও মূলে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদের নূতন মনোভাব ও নবসংস্কৃতির প্রধান প্রবর্ত্তক। ইহা বুঝিতে হইলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের বাংলার ইতিহাস সম্যক আলোচনা করিতে হইবে, এবং তদানীন্তন কালের সঙ্গে বঙ্কিমের কীর্ত্তির তুলনা করিতে হইবে। বিধাতার আশীর্ব্বাদস্বরূপ আমরা সেই এক ব্যক্তিকে পাইয়াছিলাম, পাইয়াও হেলায় হারাইতে বসিয়াছি। বঙ্কিমের প্রভাব যে পরিমাণে মন্দীভূত হইয়াছে, ঠিক সেই পরিমাণেই আমরা এই ভীষণ যুগ-সংকটে সকল দিকেই দিক্‌ভ্রান্ত হইতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সেই প্রতিভার একটা দিক—একটা বিশিষ্ট লক্ষণ সম্বন্ধে, আমি

যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বলিতে যে মনীষা, ভাবুকতা ও কবিশক্তির কথা আমাদের সর্ব্বাগ্রে স্মরণ হয়, সে সম্বন্ধে আমি এখানে কিছু বলিব না ; কিন্তু সেই প্রতিভার সঙ্গে যে আর একটি বস্তু ছিল, যাহার বলে তিনি কেবল বাঙালীর মনের উৎকর্ষসাধনই করেন নাই—তাহার মনের সংস্কার ও প্রাণের প্রবৃত্তিকেও নূতন পথে চালিত করিয়াছিলেন, তাহার কথাই বলিব ; কারণ কেবল ভাবুকতা বা সাহিত্যিক প্রতিভার দ্বারা একটা জাতির জীবনের গতিমুখ পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নহে। তাহা যে সম্ভব হইয়াছিল, তাহার কারণ সেই প্রতিভার সঙ্গে ছিল একটি বজ্রবিদ্যুন্ময় ব্যক্তি-সত্তা, তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের মত সুদৃঢ় ও বিরাট পুরুষ-মহিমা। তাঁহার দৃষ্টি ছিল যেমন গভীর তেমনই অপলক, সঙ্কল্পও তেমনই অবিচলিত। এই কথাটি ভাল করিয়া না বুঝিলে বঙ্কিম-প্রতিভার প্রকৃত মহত্ত্ব, তাহার ভাস্বর দ্যুতির বারো আনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র কেবল সাহিত্য সৃষ্টি করেন নাই—সূক্ষ্ম মনো-বিলাসের বা কালচারের আয়োজন প্রচুর করিয়া তোলেন নাই ; তিনি এই জাতির বক্ষে বল ও প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছিলেন ; ভাব ও চিন্তার প্রচণ্ড শক্তি-বলে তাহার জীবনের জীর্ণ ভিত্তি সংস্কার করিয়া নূতন সৌধের পত্তন করিয়াছিলেন। ইহার জন্য, তাঁহার প্রতিভার যে বৈশিষ্ট্য তাহাই এ যুগের অপর সকল সাহিত্যিক প্রতিভা হইতে তাঁহাকে একটি অতিশয় পৃথক আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ইহা বুঝিতে না পারিলে বঙ্কিমকে বুঝিবার সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইবে।

অতএব বঙ্কিম-প্রতিভাই শুধু নয়, বঙ্কিম-চরিত্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না ; ইহাকে আমি প্রতিভার পৌরুষ বলিব—কবি-প্রতিভার সঙ্গে সেই পৌরুষের মিলন আমাদের দেশে কচিৎ ঘটিয়াছে। কবি, সাহিত্যিক, ভাবুক বা মনীষী আমাদের দেশে আরও অনেকের আবির্ভাব হইয়াছে ; কিন্তু সেই সঙ্গে এমন পুরুষোচিত ঐকান্তিকতা, অটল আত্মমর্য্যাদাবোধ, কবিধর্ম্মের মধ্যেও মনুষ্যধর্মের এমন অবিচলিত প্রেরণা, এ জাতির ইতিহাসে অতিশয় দুর্লভ। কোনও চিন্তা বা কোনও ভাবই তাঁহার নিকটে খেলার সামগ্রী ছিল না—তিনি সাহিত্যিক ভাববিলাসী ছিলেন না। তিনি যাহা ভাবিতেন তাহার সহিত সেই ভাবনায় সিদ্ধিলাভের চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে সদা জাগরূক ছিল। যে সকল চিন্তা অলস শক্তিহীন পুরুষের ভাববিলাস মাত্র, অথবা যাহা ব্যক্তির একক সাধনা বা আত্মোৎকর্ষের সহায়—তাহাকে তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রশ্রয় দেন নাই ; কারণ, তাহা অতিশয় স্বার্থপরতার লক্ষণ, এবং স্বার্থপরতা ও কাপুরুষতার মধ্যে তিনি কোনও ভেদ মানিতেন না। এই জন্যই, কবি বঙ্কিম, ভাবুক বঙ্কিম, মনীষী বঙ্কিম, তাঁহার সমগ্র সাহিত্যিক সাধনায় এমন একটি পুরুষ-মূর্ত্তিরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছেন—যাহাকে তাঁহার প্রতিভা হইতে পৃথক করিয়া লওয়া দুঃসাধ্য। এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতেও কাব্যকল্পনার সূত্রধাররূপে তাঁহাকে সর্ব্বদা সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে দেখি ; কল্পনা যত উৎকৃষ্ট

হউক, কবির পশ্চাতে একটি পুরুষের সত্তাকে কখনও ভুলিয়া থাকিতে পারি না। এই জন্যই, যাঁহারা নিছক আর্টপন্থী তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে অনেক ত্রুটি আবিষ্কার করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই আর্ট-ঘটিত ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁহার গদ্য-কাব্যগুলিতে পরিপূর্ণ রসসৃষ্টি হইয়াছে, রসিক মাত্রেই যখন ইহা স্বীকার করেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যগুলির জন্য আর্টের একটি স্বতন্ত্র আদর্শকেই স্বীকার করিতে হয়; অর্থাৎ কবি-চরিত্র ও কবি-প্রেরণা এই দুইয়ের একটি আশ্চর্য্য সমন্বয় যে সম্ভব, সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না।

বঙ্কিম-প্রতিভার এই যে লক্ষণ ইহারই কারণে বঙ্কিমের প্রতিভা কখনও অতিচারী হইতে পারে নাই—তিনি যত বড় উচ্চভাবের ভাবুক হউন, কঠিন মৃত্তিকার শাসন কখনও অগ্রাহ্য করেন নাই। সকল তত্ত্বকে তিনিও নর-নারীর চরিত্রে প্রত্যক্ষ জীবন্তরূপে ক্রিয়াশীল করিয়া দেখাইয়াছেন; যাহা চিন্তালব্ধ সত্য, যাহা একটা যুক্তি বা সিদ্ধান্ত মাত্র, তাহাকে নরনারীর হৃদয়-শোণিতে চিত্রিত করিয়া আমাদের নেত্রগোচর করিয়াছেন। এ শক্তি কেবল কল্পনাশক্তিই নয়—ইহার মূলে আছে অসীম বিশ্বাসের শক্তি। ভাবে যাহাকে পাইতেছি, বস্তুতেও তাহাই আছে। প্রাণ ও মনের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই, বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে কোন সংশয়ের ব্যবধান নাই। এই স্থির দ্বিধাহীন দৃষ্টির মূলে যে আত্মপ্রত্যয় আছে, তাহাই সর্ব্ববিধ পৌরুষের নিদান; কিন্তু কবি-শক্তির সহিত পুরুষ-শক্তির এমন মিলন আমাদের সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত ঐ একবারই ঘটিয়াছে। একদিকে যেমন ভাবের প্রাবল্য ও কল্পনার অসীম স্ফূর্ত্তি, অপরদিকে তেমনই লোক-ব্যবহার ও মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে সদাজাগ্রত চেতনা; সৃষ্টির নিগূঢ় নিয়ম এবং ইতিহাসের সাক্ষ্য-প্রমাণ এই দুইয়ের প্রতি যেমন শ্রদ্ধা, তেমনই, সহজ ও সুস্থ মনের যে বিধিদত্ত সম্পদ, সেই বিবেক বা বিচারবুদ্ধিকে কখনও পরাস্ত হইতে না দেওয়া—এই সকল গুণ সেই প্রতিভার যে বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করিয়াছে, এই প্রসঙ্গে আমি তাহাও স্মরণ করাইতে চাই।

কিন্তু বঙ্কিম-প্রতিভার এই পৌরুষের আলোচনায় সে যুগের বাঙালী-সমাজকে বিস্মৃত হইলে চলিবে না। সে যুগের ইতিহাস এখনও সম্যক আলোচিত ও লিপিবদ্ধ হয় নাই—তাই বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রতিভার অভ্যুদয় একটু বেশি আকস্মিক ও বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর সেই নবজাগরণের মূলে যে একটি প্রধান কারণ ছিল তাহা আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই; তখনও বাঙালী জাতি যে এত নির্জীব হইয়া পড়ে নাই, তাহার দেহ-মনের স্বাস্থ্য যে অটুট ছিল সে কথা আমরা ভাবিয়া দেখি না। সে যুগের বাঙালী-সমাজের রক্ষণশীলতাকে আমরা আজ অতিশয় কৃপার চক্ষে দেখি, এবং সেজন্য আমাদের পিতৃ-পিতামহগণের পরিচয় দিতে আজ আমরা লজ্জাবোধ করি বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও চিন্তা করি না যে, সেই অতি রক্ষণশীল কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলির ঔরসেই এই সকল বীর্য্যবান প্রতিভাবান পুরুষের জন্ম হইয়াছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর অতিশয় গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া-

ছিলেন; যাঁহারা সে যুগে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন এবং সে বিষয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই সেই অবজ্ঞাত পূর্ব্বপুরুষের বীর্য্য তাঁহাদের বক্ষে বাহুতে অনুভব করিয়াছিলেন। অতএব এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সে যুগের সেই উদ্দীপ্তির জন্য বিদেশ হইতে অগ্নি-চয়ন করিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার উৎকৃষ্ট ইন্ধন তখনও এ জাতির দেহ-মনে দুষ্প্রাপ্য হয় নাই; এবং সেই কারণে এখন যাহাকে অতিশয় বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়, তাহা সত্যই ততটা বিস্ময়কর নহে। সেকালের বাঙালীর দেহের আকৃতিও আজিকার মত খর্ব্ব ছিল না, তখনও বাঙালীর race-type অক্ষুণ্ণ ছিল, এমন অবনতি প্রাপ্ত হয় নাই।

তথাপি বঙ্কিম-বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দের মত পুরুষের আবির্ভাব এ জাতির মধ্যে একটু বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। বাঙালী-জাতির সাধারণ প্রকৃতির পক্ষে পৌরুষের এইরূপ অভিব্যক্তি আমাদের চক্ষে যেন একটু অসাধারণ; আজিকার বাঙালীকে দেখিয়া তাহাই মনে হয়; পূর্ব্বের ইতিহাস না জানা থাকাও একটা কারণ। বাঙালী-চরিত্রের যে ধরণের পৌরুষ আমরা এই তিন মহাপুরুষের মধ্যে লক্ষ্য করি, তাহা হয়ত কোন কালেই দুর্লভ ছিল না; উপযুক্ত ক্ষেত্র এবং অনুকূল অবস্থার অভাবে ইতিহাসে তাহা চিহ্নিত হইতে পারে নাই। ব্রিটিশ-যুগে বাঙালী-জাতির যে অভাবনীয় অভ্যুদয় ঘটিয়াছে তাহার কারণ ঐতিহাসিকেরা নির্দ্ধারণ করিবেন, কিন্তু এই যুগে আমরা যে তিনটি আদর্শ-পুরুষের সাক্ষাৎ পাই তাহাতে বিস্মিত না হইয়া পারি না। বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দের পৌরুষ, তাঁহাদের কর্ম্মময় জীবনে, দুর্জ্জয় সংকল্প ও অসাধারণ ত্যাগের ভিতর দিয়া আমাদের প্রত্যক্ষ-গোচর হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পৌরুষ ততটা সহজগোচর নহে; তাহার কারণ, সে পৌরুষ কোনও সামাজিক কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রকাশ পায় নাই, সাহিত্য-কর্ম্মের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকায় তাহা আমাদের দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও সুলিখিত জীবনবৃত্তান্ত নাই, থাকিলে, বাহিরের জীবনেও তাঁহার দৃপ্ত পুরুষ-চরিত্রের বহু চাক্ষুষ প্রমাণ আমরা পাইতাম। তথাপি আমি ইতিপূর্ব্বে তাঁহার যে সাহিত্যিক পৌরুষের কথা বিবৃত করিয়াছি তাহাতে আশা করি সকলেই একমত হইবেন। সেই সাহিত্য-সাধনার মধ্যেই আমরা যে পুরুষ-বীরের পরিচয় পাই—তাহা বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। সেখানেও দেখিতে পাই, একটি মূল লক্ষ্যের অভিমুখে, অতিশয় অবিচলিত পদক্ষেপে, আপনার মনঃপ্রাণের সমগ্র শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া একজন পুরুষ-বীর, এই জাতির আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তিপন্থা নির্ম্মাণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে যত কিছু বাধা—অশিক্ষিতের অবিশ্বাস, শিক্ষিতের অশ্রদ্ধা, বিধর্ম্মীর আক্রোশ, প্রেমহীনের পরিহাস—এই সকলই অগ্রাহ্য করিয়া কেবল আপনার অন্তরের অগ্নি ও তাহারই আলোকশিখাকে সম্বল করিয়া, এই নির্ভীক পুরুষ যে অসীম বিশ্বাসে সেই অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন—তাঁহার সেই বিশ্বাসই আর সকলকে বিশ্বাসী করিয়া তুলিয়াছিল; সেই দুর্জ্জয় আত্মপ্রত্যয়ের

বলেই তিনি একটা জাতির মনোরাজ্যে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। বঙ্কিম-সাহিত্য যিনি আদ্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন তাঁহার পক্ষে এই ধারণা অনিবার্য্য; এমন কি তাঁহার মনীষা ও কবিশক্তি অপেক্ষা তাঁহার ব্যক্তি-চরিত্রের এই পৌরুষ সকলকে অধিকতর আকৃষ্ট করিবে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারাশি হইতে উদাহরণ দিয়া ইহা প্রমাণ করিতে হইবে না। তথাপি আমি ইহার প্রমাণস্বরূপ দুইটি মাত্র তথ্যের উল্লেখ এখানে করিব। প্রথমটিই অধিকতর প্রণিধানযোগ্য; তাহা এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে কোথাও একটি বৃথাবাক্য নাই। তাঁহার ভাষা যেমন স্পষ্ট, তেমনই পরিমিত; যেমন বাহুল্যবর্জ্জিত, তেমনই অর্থপূর্ণ। যেখানে বাগ্‌বাহুল্যের বা বিষয়-বিস্তারের প্রলোভন দুর্দ্দমনীয়—সেই উপন্যাস-রচনাতেও—তাঁহার সংযম বিস্ময়কর; সেখানেও একটি পংক্তি নাই যাহা অতিরিক্ত বা অকারণ। এইজন্যই তাঁহার উপন্যাসের কলেবর এত ক্ষুদ্র। এই যে বাক্‌সংযম—ইহার মত পুরুষোচিত ধর্ম্ম আর নাই; আবার উপন্যাসের মত কাব্যরচনায় এতখানি আত্মশাসন শক্তির পরাকাষ্ঠা বলিলেও হয়। এই যে সংযমের কথা বলিলাম ইহা শুধুই আর্টের সংযম নয়; রচনাকে মনোহারী করিবার জন্য যে সকল কৌশলের প্রয়োজন হয় ইহা তাহার অন্তর্গত একটি কৌশলমাত্র নয়। কারণ, যাহা নিরর্থক—এমন কি, মিথ্যা, যাহার মূলে আত্মপ্রত্যয়ঘটিত প্রেরণা নাই, তাহাকে সুবিন্যস্ত কথার সাহায্যে একপ্রকার রসরূপে পরিণত করা অসম্ভব নয়; বলা বাহুল্য সে সাহিত্যও বড়দরের সাহিত্য নয়। কিন্তু আমি এখানে রসতত্ত্বের জটিল তর্কজালে প্রবেশ করিব না; বঙ্কিমচন্দ্রের কোথাও বৃথাবাক্য নাই, এই কথাটির মধ্যে যে অতি সরল সহজ অর্থ আছে, সেই অর্থই যথেষ্ট, এবং তাহা যে লেখকের কোন্ গুণের পরিচয় দেয় আমি তাহাই সকলকে ভাবিয়া দেখিতে বলি।

বঙ্কিম-চরিত্রের এই লক্ষণ আর একটি ঘটনায় প্রকাশ পাইয়াছে—যিনি এত বিষয়ে এত লিখিয়াছেন তিনি নিজের সম্বন্ধে একেবারে নীরব। বঙ্কিমচন্দ্র একালের মানুষ, একালের কবি ও মনীষিগণ সাধারণতঃ অতিশয় আত্মসচেতন হইয়া থাকেন; এজন্য, আত্মচরিত কিংবা Journal বা আত্মচিন্তার দিন-লিপি রচনা, অথবা বন্ধুবান্ধবকে পত্রচ্ছলে আত্মকথা নিবেদন—ইহার কোন না কোনটি এ যুগের প্রায় সকলেই করিয়া থাকেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইহার কোনটাই করেন নাই। অতিশয় ব্যক্তিগত ভাব ও ভাবনা, আশা ও নিরাশা, সাংসারিক ও সামাজিক কারণে মানসিক অশান্তি, অন্তরের দ্বন্দ্ব-সংশয়—তাঁহার মত পুরুষের জীবনে কত গভীর ও বিচিত্র ছিল তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি, কিন্তু কুত্রাপি বন্ধুজনের নিকটেও তিনি নিজের সেই একান্ত ব্যক্তিগত কাহিনী ব্যক্ত করেন নাই। মনে হয় সেখানে তিনি অতিশয় নিঃসঙ্গই থাকিতে চাহিয়াছিলেন; অথবা যে বিরাটকে তিনি অহরহ আপনার আত্মার সমক্ষে রাখিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় নিজের ব্যক্তি-জীবনের যাবতীয় ব্যাপার অতিশয় ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে করিতেন। আত্মকথা-প্রচারের মধ্যে যে সূক্ষ্ম আত্মম্ভরিতা আছে তাহাকে তিনি

অতিশয় হীন বলিয়াই বর্জ্জন করিয়াছিলেন। সাধারণ মানুষ স্ত্রীলোকের ন্যায় দর্পণে আপনার মুখশোভা দেখিতে ভালবাসে, কত ভঙ্গিতে মুখ-প্রসাধন করিয়া তাহার প্রতিবিম্বকে সুন্দর করিয়া তুলিতে চেষ্টা পায়। এইরূপ আত্মপ্রীতি যে-দুর্ব্বলতার পরিচায়ক বঙ্কিমচন্দ্রের তাহা ছিল না। বঙ্কিম আপনার কথা যেখানে বলিবার, সেখানে সুচারুরূপেই বলিয়াছেন,—তাঁহার সমগ্র রচনাবলীই তাঁহার সেই আত্মকথা, এবং সে কথা তাঁহার আত্মার কথা, ব্যক্তি-জীবনের কথা নয়। যে উচ্চ আদর্শনিষ্ঠাকে ভারতীয় ভাষায় ব্রহ্মনিষ্ঠা বলে, এবং যাহা পুরুষের শ্রেষ্ঠ পৌরুষের লক্ষণ—ইহাতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। তথাপি, নিজের সম্বন্ধে এই যে কঠিন মৌনাবলম্বন, ইহার আর একটি কারণ আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি—একটা দারুণ নিঃসঙ্গতা-বোধ; তাঁহার হৃদ্‌গত উৎকণ্ঠা সমর্পণ করিবার মত কোন দোসর যেন তাঁহার মেলে নাই। কিন্তু তাহার জন্য কোন কাতরোক্তি বা অভিযোগ নাই, অন্তরের নির্জ্জন নিশীথে সে পুরুষ নিজের স্বপ্ন নিজেই দেখে, নিজ হৃদয়-ভার সে আর কাহাকেও অর্পণ করিতে চায় না। এই অভিমান যেমন আত্মার একরূপ আভিজাত্যের লক্ষণ, তেমনই এমনভাবে আত্ম-সংবরণ করিবার শক্তিও অতিশয় শক্তিমান পুরুষের পক্ষেই সম্ভব।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাগত পৌরুষের সম্বন্ধে আমি যাহা বলিলাম তাহাতে নূতন কিছুই নাই—বঙ্কিম-সাহিত্যের সঙ্গে এতটুকু পরিচয় যাঁহার আছে তিনিও তাহাতে বঙ্কিম সম্বন্ধে কোন নূতন জ্ঞান লাভ করিবেন না। তথাপি আমি বঙ্কিম-প্রতিভার সেই সর্ব্বজনবিদিত দিকটির প্রতি আজিকার দিনে বিশেষ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি; তার কারণ, বর্ত্তমান যুগের বাংলা-সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি দেখিয়া মনে হয়, বঙ্কিম-সাহিত্যের রসবিচার অপেক্ষা সেই সাহিত্যের প্রেরণামূলে যে মনুষ্যত্ব, পৌরুষ ও ধর্ম্মজ্ঞান ছিল, তাহাই ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন অধিক হইয়াছে। আজিকার বাংলা-সাহিত্যে প্রতিভার বন্যা আসিয়াছে, সে-বন্যায় বঙ্কিম বহুপূর্ব্বেই ভাসিয়া গিয়াছেন; কিন্তু প্রতিভার সহিত পৌরুষ যুক্ত না হইলে যাহা হয়, এক্ষণে আমাদের দেশে তাহাই হইতেছে—ক্ষণজীবী ওষধিলতার মত কবিতা ও গল্পে মাঠ বাট আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু বৎসরান্তে তাহাদের চিহ্নও থাকে না, আর একদল গুল্ম ও লতার জঙ্গলে চলিবার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই পৌরুষ ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাব আজ সকল দেশেই অনুভূত হইতেছে। চারিত্রিক স্বাস্থ্যহানির ফলে স্নায়বিক উত্তেজনাই প্রতিভাবিকাশের একমাত্র উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এজন্য সাহিত্যেও আর সত্যকার সৃষ্টিশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। এ যুগের মানুষের মত বা মনের স্থিরতা নাই—ক্রমাগত একের পর এক বিদ্রোহ ঘোষণা চলিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই বীর মনীষিগণের কীর্ত্তিকে অপসারিত বা অপদস্থ করিবার অভিপ্রায়ে একালের বালখিল্য প্রতিভা যে-সকল মতবাদের আশ্রয় লইয়া থাকে—যে ধরণের বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তাহার মূলে কোনও চিন্তাগত সত্যনিষ্ঠা নাই, অতিশয় হাল্‌কা মনোবৃত্তির সৌখীন বিলাসমাত্র আছে।

মতগুলিও সত্যকার মত নয়, খেয়ালমাত্র ; সেই খেয়াল কেবলই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কোনটাই দুদিনের বেশী টিকিতে পারে না। দেখিয়া শুনিয়া মানুষ হতভম্ব হইয়া যায়, ভাবে—আবার না জানি কোন্ নূতন মতের আবির্ভাব হইবে, সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে আবার কোন্ খেয়াল-খুশী আধিপত্য লাভ করিবে। গত শতাব্দীর সর্ব্ববিধ সাধনার মূলে যে নীতিনিষ্ঠা ছিল, একালে তাহাকে পরিহার করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতা ও নীতিহীনতার জয়ঘোষণা হইতেছে। সেকালে অন্যান্য ভাব-চিন্তার মত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও, শক্তিশালী প্রতিভাবান পুরুষের প্রতি জনসাধারণ একটি সুগভীর শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিত ; তাহারা জানিত, এমন ব্যক্তির সাধনা মিথ্যা হইতে পারে না, সে সাধনায় কালক্রমে সিদ্ধিলাভ ঘটিবেই। একালে সাধনা বলিয়া কিছুই নাই,—কিছুই কালসাপেক্ষ নহে, সকলই আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত—এবং অপ্রত্যাশিত বলিয়াই চমকপ্রদ। এখন কোনও ভাব বা চিন্তার মূলে লেখকের কোন দায়িত্ববোধ নাই—বিশ্বাসের দৃঢ়তা নাই ; সকলেই স্ব স্ব প্রধান। প্রেরণা এক না হইলেও, সাহিত্য বা শিল্পকলার সাধনায় যে এক একটি গোষ্ঠী আপনা হইতে গড়িয়া উঠে—এক একটি পদ্ধতির সৃষ্টি হয়, একালে তাহাও আর সম্ভব নয়। এখন প্রত্যেকেই আপনাকে জাহির করিতে চায়—যে সব চেয়ে বেশী চীৎকার করিতে পারে সেই তত বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে লেখক ব্যাকরণ ও অভিধানের মুণ্ডপাত যত বেশী করে, যাহার রচনায় ভাষার প্রাথমিক নিয়মগুলিও তিরস্কৃত হইয়া থাকে, সেই তত অধিক হাততালি অর্জ্জন করে। কিন্তু এই সৌভাগ্যও তাহাকে বেশীদিন ভোগ করিতে হয় না, কারণ তাহার ঠিক পশ্চাতেই আর একজন আসিয়া উপস্থিত হয়—এক হাততালি না থামিতেই আর এক হাততালি সুরু হয় ; কারণ এই পরবর্ত্তীর চীৎকার আরও গগনভেদী, তাহার রচনা আরও অদ্ভুত, আরও চমকপ্রদ। বঙ্কিম-যুগের প্রভাব যেদিন লোপ পাইয়াছে সেইদিন হইতেই আমাদের সাহিত্যে এই ধর্ম্মহীন নীতি ও নিষ্ঠাহীন স্বেচ্ছাচার উত্তরোত্তর প্রবল হইয়াছে। তথাপি এই বর্ণনাটি আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে মোটামুটি প্রযোজ্য হইলেও পূরাপূরি প্রযোজ্য নহে ; কারণ, সে সাহিত্য আধুনিকতার বায়ুগ্রস্ত হইলেও এতই দুর্ব্বল ও ক্ষীণজীবী যে, তাহার সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা একটু বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইবে। আমাদের সাহিত্যে যাঁহারা অনাচার করিতেছেন, তাঁহারা কেহই উল্লেখযোগ্য কুখ্যাতিরও অধিকারী নহেন ; তাঁহাদের সেই অনাচারও অনুকরণমূলক। তথাপি সেই অনুকরণের মধ্যে যে প্রবৃত্তি রহিয়াছে এবং তাহার ফলে আমাদের এই ক্ষুদ্র সাহিত্যিক জলাশয়ে যে পঙ্কিল আবর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মূল উৎস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভের প্রয়োজন আছে ; তাই আমি আধুনিক ইংরেজী সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্বন্ধে একজন ইংরেজ সমালোচকের উক্তি উপরে বাংলায় উদ্ধৃত করিয়াছি। তথাপি, পাছে কেহ সন্দেহ করেন যে, আমি অনুবাদে কিছু রং ফলাইয়াছি, এবং যেহেতু বাংলা কথা অপেক্ষা ইংরেজী কথার মাহাত্ম্য অধিক, অতএব মূল ইংরেজীও অতঃপর

উদ্ধৃত করিতেছি। এবিষয়ে আমার এতখানি আগ্রহের কারণ, আমি বঙ্কিম-চন্দ্রের যুগ ও বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রসঙ্গে এই আধুনিকতার স্বরূপ বিশেষ করিয়া উদ্ঘাটন করিতে চাই। এই আধুনিকতার সম্বন্ধে উক্ত ইংরাজ সমালোচক লিখিয়াছেন—

Literature, painting and sculpture have indeed been affected by not one but several revolutions since the men who made the nineteenth century notable in these spheres, passed to the Great Beyond. True, that in many respects they were merely tinsel revolutions, establishing no great principles in the stead of those they displaced—or, rather ignored ; revolutions based on passing whims, which quickly gave place to others equally ephemeral, the sum-effect of which has been to leave the world wondering as to what the next 'ism' will be to dominate for the time-being, in the domain of Art. Instability of belief has succeeded the orthodoxy which characterised the mid-nineteenth century art doctrine. The mid-Victorian Age was marked by the solidity of its popular belief in its leaders in literature and art ; the certainty that what they did was right ; that work expected of them would in due course be presented. But we have changed all this. The feature of the "Georgian" era is its unexpectedness. There is no stabilised "school", instead there are individuals, each anxious for notice, and the one who screams the loudest secures the most attention. The author who pays the least regard to the rules of syntax and composition, the painter who disregards most the niceties of drawing and the harmonies of colour—he is king for the moment, and receives the fashionable plaudits. Their reign is of brief duration, for their successor is on their heels with an even louder scream, and even more bizarre effect, ere the echo of the acclamation has died away. (*Introduction to the Life and Work of Sir John Everett Millais in the 'Modern Painters of the World' series*).

উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে লেখক যাহা বলিয়াছেন আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সম্বন্ধে তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আধুনিক যুগের যে চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, আমাদের আধুনিক সাহিত্যে এই পাপ কোথা হইতে প্রবেশ করিয়াছে—রোগের বীজ সেই একই, তবে দেহ তেমন সবল নহে বলিয়া বিষের

ক্রিয়াও তেমন প্রচণ্ড হইতে পারে নাই ; এ পর্য্যন্ত কতকগুলি ব্রণ-স্ফোটক মাত্র দেখা দিয়াছে।

এই যে অবস্থা, ইহাই প্রত্যক্ষ করিয়া আজ বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করিতে হইবে, বাংলার উনবিংশ শতাব্দী ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা এই দুইয়ের সঠিক ধারণা দ্বারা প্রবুদ্ধ হইতে হইবে ; কেবল সাহিত্যিক রসতত্ত্বের সৌখীন আলোচনা করিলে চলিবে না। বঙ্কিম-প্রতিভার যে পৌরুষ একদিন মহাকালের জটাজালবাসিনী ভাবগঙ্গার উন্মাদ তরঙ্গস্রোতকে এই বাংলার সমভূমিতে তটশালিনী ভাগীরথীরূপে প্রবাহিত করিয়াছিল, আজ সেই পৌরুষের ধ্যান করিয়া আমাদিগকে আর এক মহাসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় করিতে হইবে।*

* ঢাকা-বঙ্কিম-শতবার্ষিকী সভায় পঠিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতি-প্রেম*

আজ বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাঙালী বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি-পূজার উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে। উৎসবমাত্রেই ভাবোদ্রেক করে,-বিশেষতঃ যাহা বহুজনকৃত্য তাহার মূলে ভাবোদ্দীপনা চাই। এইরূপ উৎসবের আবশ্যকতা আছে—ইহার অভাব ঘটিলে জাতির মানসিক স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা জাগে। আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতে মহাপুরুষের স্মৃতিতর্পণ করিবার একটি প্রথা আছে—পঞ্জিকায় আবির্ভাব ও তিরোভাবের তিথি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, সেই তিথিতে স্থানবিশেষে মেলাও বসিয়া থাকে। একালে এই পদ্ধতির পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী; তাহা ছাড়া, মহাপুরুষের সংজ্ঞা আরও ব্যাপক হইয়াছে, এজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের মত মহাপুরুষের স্মৃতিতর্পণ প্রাচীন প্রথা অনুসারে হওয়া সম্ভব নয়—যদিও এইরূপ উৎসবে ভাবোদ্দীপনার প্রয়োজন তেমনই আছে।

কিন্তু বঙ্কিমকে স্মরণ করিতে হইলে কেবল ভাবোদ্দীপনাই একমাত্র উদ্দেশ্য হইলে চলিবে না, উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে—স্মরণ ও কীর্ত্তনের মত—মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন আছে। যে মহাপুরুষকে আমরা আজ এই উৎসবে স্মরণ করিতেছি—তিনি এ জাতির জন্য এমন কি করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ তেমন ভাবে করেন নাই, তাঁহার জীবনের ব্রত ও তাঁহার উদ্যাপন-কাহিনী, তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভা—এ সকল অতি ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। আর ভাবিয়া দেখিতে হইবে—যে-যুগে আমরা বাস করিতেছি সেই যুগে আমরা বঙ্কিম-প্রদর্শিত সেই আদর্শ হইতে কতখানি ভ্রষ্ট হইয়াছি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙালী-জাতির যে প্রতিভা, ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞান এই মহাপুরুষের মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছিল তাহার তুলনায় আজিকার বাঙালী কি শক্তি ও বুদ্ধির পরিচয় দিতেছে? কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র কেবল একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তিমাত্র নহেন—তিনি সে যুগের সমগ্র বাঙালী-জাতির প্রতিনিধি। বঙ্কিম যাহা ভাবিতেন, সমগ্র শিক্ষিত বাঙালী-সমাজ তাহাই ভাবিত, বঙ্কিমচন্দ্র যে দিকে যেমন প্রবর্ত্তনা দিতেন, সকলের প্রাণমন সেই দিকে প্রবর্ত্তিত হইত। এজন্য, সেকালে এমন একটি প্রবচনের সৃষ্টি হইয়াছিল যে, যাহার মূলে বঙ্কিম নাই, তাহা বাংলা দেশে চলিবে না। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিতে পারিলে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাকে বুঝিতে পারিব—একটি মানুষের পরিচয় হইতে একটা যুগ ও জাতির পরিচয় পাইব; এবং সে যুগের মত যুগ বাঙালী-জাতির ইদানীন্তন ইতিহাসে আর নাই। বাঙালীর মনীষা ও প্রতিভার যে খ্যাতি আজও ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হয় নাই—শিক্ষায়, সাহিত্যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, ধর্ম্ম ও সমাজনীতির চিন্তায়, এককালে বাঙালী সারা ভারতের

* মুন্সীগঞ্জ বঙ্কিম-শতবার্ষিক উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ

যে নেতৃত্ব করিয়াছিল—সে এই যুগেরই অভাবনীয় জাতীয় জাগৃতির ফলে; এবং সেই জাগৃতির মূলে যত ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের সাধনা সঞ্চিত হইয়াছিল, বঙ্কিমের প্রতিভাই তাহাদের সকল অপেক্ষা সঞ্জীবনী-গুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। আজ সেই কথাই, সকল সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া, মুক্ত মনে ও মুক্ত প্রাণে উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

আজিকার সভায় আমি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনব্যাপী সাধনার প্রধান লক্ষ্য ও তাঁহার প্রতিভার মূল প্রেরণার সম্বন্ধে কিছু বলিব। বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষা ও সাহিত্যিক প্রতিভার বিষয়ে আলোচনার নানা দিক আছে, সে আলোচনা অতি সংক্ষিপ্ত ভাবেও একটি বক্তৃতার মধ্যে করা সম্ভব নহে—তাই আমি বঙ্কিমচন্দ্রের সকল চিন্তা, ভাবনা ও কল্পনার যে একমাত্র উৎস তাঁহার স্বজাতি-প্রেম, তাহার সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বঙ্কিমচন্দ্র-সম্বন্ধে একটি কথা আজ সর্ব্বত্র শোনা যাইতেছে, সে কথা এই যে—তিনি ছিলেন জাতীয়তা-মন্ত্রের ঋষি, তাঁহারই সাধনার ফলে আমরা চিরদিনের জন্য একটি নূতন প্রাণমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়াছি। এই কথাটিই বঙ্কিম-স্মৃতি-উৎসবে অতি সহজ ভাবোদ্দীপনার পক্ষে বড় কাজে লাগিয়াছে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব, অতিশয় অজ্ঞান ও মুগ্ধ ভাবাবেগ ছাড়া এই কথাটির অর্থ আমরা আর বুঝি না, বুঝিবার চেষ্টাও করি না। বঙ্কিমচন্দ্রের জাতিপ্রেম ও আধুনিক রাজনৈতিক ন্যাশানালিজ্‌ম এক নহে; এক যে নহে, তাহার প্রমাণ 'বন্দেমাতরম্' গানটিকে লইয়া আমরা বড় মুশকিলে পড়িয়াছি। আমরা আজ যে পন্থা ও আদর্শকে অতিশয় সত্য ও সমীচীন মনে করিয়া আশ্রয় করিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তা-ধর্ম্ম ও তাহার সাধনমন্ত্র তাহা হইতে এত ভিন্ন যে, সেই আদর্শ ও সেই পন্থাকে ধরিয়া থাকিতে হইলে 'বন্দেমাতরম্' গানকে বর্জ্জন করাই সঙ্গত। 'বন্দেমাতরম্'-গান একটা 'স্লোগান' মাত্র নয়, উহা এমন একটা অবুঝ ভাবোদ্দীপনার কৌশল-পূর্ণ চীৎকারমাত্র নয় যে, যে-কোনও ধর্ম্মের যে-কোনও অনুষ্ঠানে উহাকে ব্যবহার করা চলিবে। ঐ গান এখন মাত্র একটি সেন্টিমেন্টের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে—উহার গূঢ় অর্থ বুঝিবার প্রয়োজনও আর নাই। যে পন্থা ও পদ্ধতিতে, যে উদ্দেশ্য ও অভিমান লইয়া, আমরা এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইয়াছি—বঙ্কিমচন্দ্রের জাতি-প্রেম বা জাতীয়তাধর্ম্ম তাহার অনুকূল নহে। কেন নহে, তাহা বুঝিতে হইলে কেবল ঐ গানটি লইয়াই ভাবোন্মত্ত হইলে চলিবে না—উহার মূলে ঋষি-বঙ্কিমের যে মন্ত্রদৃষ্টি ছিল তাহাই শ্রদ্ধার সহিত ধারণা ও ভাবনা করিতে হইবে। তাহা হইলে, আজ যে কেন ঐ গানের সুরে আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের সুর মিলিতেছে না—ফাঁকি যে কোথায়, তাহা ধরা পড়িবে। এ আলোচনায় অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আমি সাধারণভাবে দুই চারি কথা বলিব।

এ কথা এখন ঐতিহাসিক সত্য যে, ভারতের নব-জাগরণের স্বপ্ন বাঙালীই প্রথম দেখিয়াছে, এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তবের ক্ষেত্রে সত্য করিয়া তুলিবার

উপায়চিন্তা বাঙালীই সর্ব্বপ্রথমে করিয়াছে। এই যে স্বপ্ন—ইহা যে-ভাব-কল্পনা ও ধ্যানচিন্তার ফল, তাহা বাঙালীর প্রতিভাতেই সম্ভব হইয়াছিল, বাংলার জলবায়ুতেই তাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল। বিষ্ণুর নাভিপদ্মনালে যেমন সৃষ্টিশতদল ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তেমনই বাঙালী-জাতির দেহ-মন-প্রাণের অন্তস্তল হইতে নব-ভারতের পরিকল্পনা বাক্-ব্রহ্মরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল। রামমোহনের মনীষা যাহাকে একটা বুদ্ধিসম্মত আদর্শরূপে প্রথমে অনুভব করিয়াছিল, এবং বিবেকানন্দ যাহাকে অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শে শোধন করিয়া জাতির জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকেই, রামমোহনের বাস্তব ও বিবেকানন্দের আদর্শ—এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তীরূপে স্থাপনা করিয়াছিলেন। এক-দিকে জাতির অতীত ঐতিহ্য ও অপরদিকে তাহার বর্ত্তমানের যুগধর্ম্ম—এই দুইয়ের সমন্বয়ে তিনি একটি অতিশয় প্রাণদ, অথচ আধ্যাত্মিক পিপাসার উপযোগী, জীবনযাত্রার আদর্শ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি ও মনীষী—এই জাতিরই প্রাণমন ও দেহগত সংস্কার, এবং সাধারণ মানবধর্ম্ম, এই সকলকে তাঁহার দিব্যদৃষ্টি দ্বারা একই ভাব-সত্যের অঙ্গীভূত করিয়া, আগত ও অনাগত যুগের উপযোগী একটা সাধনপন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; ইহাতে প্রতিভার যাহা প্রধান লক্ষণ তাহাই রহিয়াছে—যাহাকে সৃষ্টিকর্ম্ম বলে, ইহা সেইরূপ একটি সৃষ্টিকর্ম্ম। বাস্তব ও আদর্শ, যুগ ও সনাতন, মানবধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম, universal ও particular—যত কিছু দ্বন্দ্ব সবগুলিকে সমন্বয় করিবার যাদুশক্তি ইহাতে রহিয়াছে। ইহাকেই সৃষ্টিকর্ম্ম বলে—এই সৃষ্টিশক্তিই উৎকৃষ্ট প্রতিভার নিদর্শন, এবং বর্ত্তমান ভারতে সে প্রতিভার পরিচয় কেবলমাত্র বাঙালীই দিয়াছে। কেবলমাত্র বিদ্যা বা মেধা, বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির দ্বারা—এমন কি অত্যুচ্চ অধ্যাত্মশক্তির দ্বারাও—এইরূপ সৃষ্টিকর্ম্ম যে সম্ভব নয়, তাহা আজিকার রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিলে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। ভাবের ক্ষেত্রে যদি পূর্ণদৃষ্টির অভাব ঘটে, তবে কর্ম্মের ক্ষেত্রেও সাফল্যলাভ ঘটে না; আজিকার আন্দোলন যে কারণে যতখানি সাফল্যলাভ করিয়া থাকুক—ইহার মধ্যে বিরোধ ও ধ্বংসের বীজ নিহিত আছে। আজ যখন আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে জাতীয়তা-মন্ত্রের ঋষি বলিয়া সুলভ ভাবোচ্ছাসে মাতিয়া উঠি, তখন মনের মধ্যে এমন সন্দেহও হয় না যে, আজিকার জাতীয়তার আদর্শ সম্পূর্ণ অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে, ইহাতে জাতীয়তা অপেক্ষা রাষ্ট্রনীতি, স্বধর্ম্ম অপেক্ষা পরধর্ম্মের প্রেরণা প্রবল হইয়াছে। আমাদের জাতি ও কালের বিশিষ্ট সাধনা, বা স্বধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিয়া—মানুষ হিসাবে আত্মার ক্ষুধাকেও অস্বীকার করিয়া, কেবলমাত্র অন্নব্রহ্মের উপাসনামূলক একরূপ সাম্যবাদের উপরে নেশন-প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলিয়াছে। নেশন ও সাম্যবাদ এই দুয়ের মূলনীতি যে এক নহে—হইতে পারে না, এক করিতে গেলে এক মহাবিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হয়—ধর্ম্মের নামে মহা অধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, তাহার প্রমাণ আজিকার ইউরোপীয় রাষ্ট্রবিভ্রাটে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

মানুষের বুক চাপিয়া ও মুখ বন্ধ করিয়া এই রাষ্ট্রধর্ম্ম বজায় রাখিতে হয়। ভারতীয় মুক্তিসংগ্রামেও এই নীতির সূচনা এখনই দেখা যাইতেছে। সমন্বয়-চেষ্টার ক্রটি হইতেছে না বটে; এক দিকে উৎকট আধ্যাত্মিকতা এবং অপর দিকে অতিশয় আধিভৌতিক বাস্তববাদ—এই দুই বিসম্বাদী আদর্শের মধ্যে আপোষ করিবার যে চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে বুদ্ধিহীনেরা যেমন ভক্তি-গদগদ হইয়া উঠিয়াছে, দূরদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তেমনই হতাশ হইয়া পড়িতেছেন। বাঙালীর প্রতিভা যে জাতীয়তা-মন্ত্রের উদ্ভাবনা করিয়া নব্য-বাংলা তথা নব্য-ভারতের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, আজিকার তথাকথিত জাতীয়তার জয়-রথ সে পথ হইতে বহুদূরে প্রস্থান করিয়াছে—তাহার পতকায় যে-বাণী উত্তরোত্তর সুস্পষ্ট অক্ষরে প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই জাতীয়তা-বাদের চিহ্নমাত্র নাই। অতএব 'বন্দেমাতরম্'-গানকে বর্জ্জন করার সঙ্গত হেতু ইহার আছে—ইহার জন্য এই অতিশয় বুদ্ধিমান কূটনীতিজ্ঞ নেতৃবৃন্দকে দুর্ব্বলতা বা কাপুরুষতার অপরাধে অপরাধী করা চলে না। 'বন্দেমাতরম্'-গানের মর্ম্ম যে তাঁহারা বুঝেন না তাহা নহে, কিন্তু সে মন্ত্র তাঁহাদের পক্ষে এখন অচল। বাঙালীর প্রতিভায়—ভাবকল্পনার দিব্য আবেশে, একদিন যারা ধরা দিয়াছিল তাহার কার্য্য-কাল ফুরাইয়াছে; যাহা এককালে কেবলমাত্র একটা আবেগসৃষ্টির উপায়রূপে বড় কাজ দিয়াছিল—মন্ত্রহিসাবে কখনও গ্রহণযোগ্য হয় নাই, আজ তাহাকে আবশ্যক-বোধে পরিত্যাগ করিতে বাধা কি? আজিকার সংগ্রামে বাঙালীর নেতৃত্ব নাই, এমন কি সহযোগিতাও নাই—কারণ আজ যাঁহারা নেতা তাঁহাদের দৃষ্টিই অন্যরূপ। বাঙালী ব্যবসায়বুদ্ধিহীন—পণ্যশালার প্রাকৃত অভিজ্ঞতা তাহাদের নাই; তাই সদ্য-লাভ ও সদ্য-ক্ষতির খতিয়ানে যাহারা সব-কিছু যাচাই করিয়া লইতে অভ্যস্ত, তাহারা এই ভাবপ্রবণ বিষয় বুদ্ধিহীন জাতির জাতীয়তা-মন্ত্র নিশ্চিন্ত মনে বর্জ্জন করিয়াছে। তাহাদের দিক দিয়া ঠিকই করিয়াছে, কিন্তু বাঙালী তাহা মানিবে না, অথচ সেই নেতৃবৃন্দের আশ্রয় ত্যাগ করিবার মত শক্তি, বুদ্ধি, সাহস কোনটাই তাহার আজ নাই। এই অদ্ভুত-আচরণের কারণ আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি—'বন্দেমাতরম্'-গানের সুর তাহারা ভোলে নাই বটে, কিন্তু তাহার মর্ম্ম অনেক দিন ভুলিয়াছে; আমার মনে হয়, যেদিন হইতে সেই আন্দোলন সুরু হইয়াছে, সেই দিন হইতেই ভুলিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্র কখনও কোন রাষ্ট্রনীতির ভাবনা করেন নাই, তাহা সত্য। জাতির রাজনৈতিক মুক্তি-সংগ্রামে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, এবং একের পর এক যত সমস্যা উপস্থিত হইবে সেগুলিকে কি উপায়ে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, সে চিন্তাও তিনি করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান ভাবনা ছিল—এই জাতিকে আত্মপ্রবুদ্ধ করিয়া তাহার পৌরুষ ও মনুষ্যত্ব-সাধনার উপায় সন্ধান। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইহার সহজ ও স্বাভাবিক উপায় দুইটি—আত্মপরিচয়ের জন্য ইতিহাস-উদ্ধার এবং আত্মমর্য্যাদাবোধের জন্য স্বকীয় সংস্কৃতির গৌরব-প্রতিষ্ঠা। যে-ব্যক্তির আত্মমর্য্যাদাবোধ নাই, তেমনই যে-জাতির জাতীয়-

গৌরববোধ নাই—তাহার নৈতিক অধঃপতন অনিবার্য্য। এই অতিশয় সরল ও সহজ সত্যকে বঙ্কিমচন্দ্র, দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং ইহারই অনুসরণে তিনি এই ভীরু আত্মপ্রত্যয়হীন জাতিকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য, তাহার সম্মুখে তাহার ইতিহাস ও অতীত কীর্ত্তি, তাহার অতি প্রাচীন ভাব-চিন্তার আভিজাত্য, নবযুগের নূতন আদর্শে সুসংস্কৃত করিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন—এবং এ বিষয়ে তাঁহার বিশিষ্ট প্রতিভার বলে তিনি সমধিক সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু-সংস্কৃতি ও সভ্যতাকেই ভারতীয় জাতীয়তার ভিত্তি করিয়াছিলেন—ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। হিন্দু বলিয়াই নহে—যে কোনও ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ভুক্ত হউক—যদি কোনও ভারতবাসীর সত্যকার জাতীয়তাবোধ জাগে, অর্থাৎ তিনি যদি এই দেশকে আপনার দেশ এবং জাতিকে আপনার জাতি বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে পারেন, তবে তাঁহার পক্ষে ভারতীয় ঐতিহ্য ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে নিজস্ব বলিয়া মনে করিতে বাধিবে না। সকল প্রেমের ধর্ম্মই এই; জাতিপ্রেমও একটা খুব বড় প্রেম, যাহার সেই প্রেম জাগে তাহার আর আত্মপর-ভেদ থাকে না। হিন্দুর সংস্কৃতি ও হিন্দুর সাধনাই ভারতের নিজস্ব সাধনা; ভারতের ইতিহাসকে অখণ্ডভাবে ধরিলে, তাহা কোনও পৃথক্ জাতি-বিশেষের ইতিহাস নয়। এই দেশেরই জলমাটি ও আলো-হাওয়ার গুণে, মানুষের দেহ-মন ও আত্মা যে একটি বিশিষ্ট নিয়তির অধীন হয়, সেই সাধারণ নিয়তি অতি প্রাচীনকাল হইতেই এ দেশের ইতিহাসের যে ধারা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে—ধর্ম্ম, সমাজ ও রক্তগত পার্থক্য সত্ত্বেও, সকল ভারতবাসী সেই ধারাকে পুষ্ট করিয়া চলিয়াছে; সজ্ঞানে অস্বীকার করিলেও অজ্ঞানে তাহাই করিতেছে; না করিলে তাহার স্বভাব-ধর্ম্মই বিকৃত হইবে, তাহার জীবন কোনও বড় সার্থকতায় মণ্ডিত হইবে না। তবু যদি কেহ আপনাকে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিবার প্রাণপণ প্রয়াস করে, তাহাতে আপত্তি করিবার কিছুই নাই, সে প্রয়াসকে অগ্রাহ্য করিলেও চলিবে না। কিন্তু এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই ব্যক্তি বা সেই সমাজ ভারতবাসী হইলেও ভারতীয় জাতীয়তাবোধ তাহার নাই। বঙ্কিমচন্দ্রও 'ধার্ম্মিক' হিন্দু ছিলেন না, তিনি স্মৃতি-সংহিতার হিন্দুধর্ম্মকে বড় করিয়া দেখেন নাই। তাঁহার জাতিপ্রেমের প্রধান প্রেরণা ছিল হিন্দু-চিন্তার ধারা, ভারতীয় সাধনার ভাবগত আদর্শ। যদি তাহাই না হইত, তবে তাঁহার এই নবধর্ম্ম এবং শাস্ত্রবিহিত আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম্ম, এই দুইয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকিত না, এবং সেইজন্য তাহা নিরর্থক হইত। দুই একটি অতি স্থূল দৃষ্টান্ত দিব। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দুর্গোৎসব' কোনও স্মৃতিগ্রন্থোক্ত দুর্গাপূজা নহে—তিনি সেই দুর্গাপ্রতিমাকে যে-ভাবের প্রতীক করিয়া যে-মন্ত্রে তাহার ধ্যান করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনও আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মলোভাতুর হিন্দু আশ্বস্ত হইবে না। 'কৃষ্ণচরিত্র' নামক গ্রন্থে তিনি কৃষ্ণের চরিত্র যে যুক্তি ও গবেষণার সাহায্যে যে-রূপে খাড়া করিয়াছেন, তাহা কোনও বৈষ্ণব ভক্ত-সাধকের পক্ষে শুধুই অগ্রাহ্য নয়—ধর্ম্ম-হানিকর। 'বন্দে-মাতরম্'-গানে হিন্দুর ধর্ম্মঘটিত সংস্কারে আঘাত লাগিবারই কথা—সে গানের

ভাষা মাত্র হিন্দু, হিন্দুয়ানির লেশমাত্র তাহাতে নাই। দেশকে দেবতা কল্পনা করিয়া তাহাকেই একমাত্র আরাধ্য দেবতা বলিয়া ঘোষণা করা হিন্দুসংস্কার-বিরুদ্ধ; কেবল তাহাই নয়, শক্তি-উপাসক হিন্দুর ইষ্টদেবতার নাম তাহাতে আরোপ করা, এবং অন্য কোনও ঐ-নামের দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার করা ভক্তসাধকের পক্ষে যে কতখানি ক্লেশকর—তাহার ধর্ম্মবিশ্বাসে সে যে কত বড় আঘাত, তাহা আমাদের মত হিন্দু বুঝিতে না পারিলেও, যাহারা 'ধার্ম্মিক' হিন্দু তাহারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারে। তথাপি 'বন্দেমাতরম্'-গানের ভাষা হিন্দু, তাহার ভাব ও আদর্শ হিন্দু—কিন্তু কোন্ অর্থে? তাহা বুঝিতে পারিলে বঙ্কিমচন্দ্রের এই জাতিপ্রেমমূলক নবধর্ম্ম যে সাম্প্রদায়িক নহে, পরন্তু খাঁটি ভারতীয় অর্থে হিন্দু, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ থাকিবে না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই হিন্দুত্ব যদি দোষের হয়, তবে ভারতবাসীর ভারতীয় হওয়াও দোষের, অথচ ইহার চেয়ে সত্য ও স্বাভাবিক জাতীয়তার মন্ত্র তাহার পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না; ইহার বিরুদ্ধ যাহা, তাহাই অসত্য ও অস্বাভাবিক্। নব-জাতীয়তার ধর্ম্ম-প্রণয়নকালে বঙ্কিমচন্দ্র যে দৃষ্টি ও সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ এই যে, তাঁহার এই ধর্ম্ম অতিশয় বাস্তব ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, অথচ ইহা মানব-ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করে নাই। সকল দেশের সকল জাতিই এমনই করিয়া আত্মপ্রবুদ্ধ হয়। সকল ভারতবাসীকে সমাজ-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে এই জাতিপ্রেমের মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে, না করিলে রাষ্ট্রশাসনের জন্য দেহ-প্রাণ-আত্মাবর্জ্জিত একটা নিয়ম-যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে—রক্তমাংসের আকৃতিময়, সজীব ও সুস্থ জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা হইবে না; এবং যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন এ জাতির দুর্গতি ঘুচিবে না।

এই জাতি-প্রেমকে, বঙ্কিমচন্দ্র—শুধুই আবেগ নয়, একটা সুদৃঢ় ও সর্ব্বতোভদ্র চিন্তাভিত্তির উপরে স্থাপনা করিয়াছিলেন—তিনি ইহাকে মানুষেয় আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুর পুরাণ, শাস্ত্র, দর্শন নূতন করিয়া পড়িয়াছিলেন, এবং য়ুরোপীয় চিন্তার যুক্তি-পাথরে ঘষিয়া তাহার উজ্জ্বলতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেই ভাব-চিন্তার উপাদানে তিনি মনুষ্যত্বের যে আদর্শ গড়িয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে দেশ-প্রেমকে একটা বড় স্থান দিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নাই। এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই দেশপ্রেম পলিটিক্স্-প্রসূত নয় —পলিটিক্সেরও আগে যাহার প্রয়োজন, যাহা পলিটিক্সের চেয়ে বড়, তিনি তাহারই ধ্যান করিয়াছিলেন। মানুষের মানুষ হওয়াটাই আগে, তারপর সকল দাবি-দাওয়ার কথা; অতএব সেই মূল প্রয়োজন-সাধনের জন্যই তিনি সারাজীবন চিন্তিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র রাজনীতিবিদ্ না হইলেও য়ুরোপের ইতিহাস তিনি পড়িয়াছিলেন—তিনি ইংরেজ-জাতির শাসনতন্ত্রের ইতিহাস, এবং সেই ইতিহাসে স্বাধীনতালাভের সুদীর্ঘ প্রয়াস-কাহিনী নিশ্চয় অবগত ছিলেন। তাহা হইতে তাঁহার মত দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষী ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে, পৌরুষ ও চরিত্রশক্তি ব্যতীত কোনও জাতি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না;

সেই পৌরুষ ও চরিত্রশক্তি ব্যক্তিগত না হইয়া জাতিগত হওয়া চাই, এবং তাহার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন—দেশ ও জাতির প্রতি সুগভীর মমতা। পারলৌকিকতা নয়, দেবদেবীর অর্চ্চনা বা আচারগত নিয়মনিষ্ঠাই নয়—দেহ-মন ও প্রাণের স্বাস্থ্য, এবং প্রেম বা ত্যাগই সেই ধর্ম্মের প্রধান সাধন। পারমার্থিক কল্যাণ অপেক্ষা জগৎসংসারের কল্যাণ, মানুষের কল্যাণ—সে ধর্ম্মের একমাত্র অভিপ্রায়, তাহাতেই নরজন্মের সার্থকতা। জাতিপ্রেমকেই সেই ধর্ম্মসাধনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সহায় বলিয়া তিনি যে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার দিব্যদৃষ্টির প্রমাণ পাওয়া যায়। এ যুগের মানুষের দুই প্রবৃত্তি তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন—প্রাচীন ধর্ম্মে বিশ্বাসের একান্ত অভাব; যাহারা শিক্ষিত তাহারা অতিশয় স্বার্থপরায়ণ ও নাস্তিক; যাহারা অশিক্ষিত তাহাদের ধর্ম্মানুরাগ কুসংস্কার-প্রসূত, ধর্ম্মের সে জীবন্ত অনুভূতি কাহারও মধ্যে নাই। দ্বিতীয়ত, সমাজের একটি অংশ ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকে বটে, কিন্তু সে ধর্ম্মানুরাগ স্বার্থপ্রণোদিত, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে তাহারা স্বার্থরক্ষার জন্যই ধর্ম্মানুরাগী হয়। একালে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মই মানুষের বিবেকবুদ্ধি নষ্ট করিয়া থাকে, অপ্রত্যক্ষ ও অনিশ্চিত পরলোকের ভাবনায় মানুষ ইহলোকের কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন—ধর্ম্মকেই উদ্ধার করিতে হইবে, এবং ইহজীবনের মধ্যেই তাহাকে সত্য করিয়া তুলিতে হইবে—বুকের রক্তের সহিত তাহার যোগস্থাপন করিতে হইবে, এবং তাহা করিতে হইলে সেই পুরাতন মন্ত্রকে নূতন করিয়া লইতে হইবে; নহিলে এ যুগের মানুষ আকৃষ্ট বা আশ্বস্ত হইবে না। প্রেম ও ত্যাগের একটি প্রবল সহজ প্রেরণা জাগাইবার পক্ষে, প্রবৃত্তিকেই নিবৃত্তির পথে চালনা করিবার পক্ষে, যে আদর্শ এ যুগে বিশেষ কার্য্যকরী হইবার সম্ভাবনা—মানব-মনের সেই আধুনিকতার আভাস তিনি য়ুরোপ হইতেই পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জাতি-প্রেম রাজনৈতিক ন্যাশনালিজ্‌ম নয়, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সংঘবদ্ধভাবে বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে নূতন একটি রিপুকে জাগাইয়া তুলিতে হয়—বঙ্কিমচন্দ্রের জাতি-প্রেম সেইরূপ রিপুঘটিত ব্যাপার নয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র অতি উচ্চ আদর্শবাদী হইলেও, তাঁহার সেই আদর্শের ভিত্তি ছিল বাস্তব। দেশ ও জাতিকে ভালবাসিতে হইলে, সে ভালবাসায় সত্যকার আবেগ চাই, প্রেম ও ভক্তির তীব্র অনুভূতি চাই; অতএব সে ভালবাসার একটা বাস্তব আধার বা বিগ্রহ চাই—সে প্রেমেরও পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র চাই; কারণ যে সকল উপাদানে মানুষ গঠিত, তাহার মধ্যে মৃত্তিকার অংশ অল্প নহে; এই মাটিকে তুচ্ছ না করিয়া, তাহাকেই কর্ষণ করিয়া সোনার ফসল উৎপন্ন করিতে হইবে। ইহাকেই বলে সৃষ্টি-প্রতিভা—স্রষ্টার প্রধান গুণ উপাদান সম্বন্ধে অভ্রান্ত অভিজ্ঞতা। বাস্তবের সহিত আদর্শের এই সমন্বয়ের নামই সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ যত উচ্চ হউক, তিনি জাতি-প্রেমের যে নবধর্ম্ম প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে বাস্তব তাহার নিজস্ব স্থান সগৌরবে অধিকার করিয়া আছে। জাতিহিসাবে পৃথক্ গৌরববোধ—স্বকীয় সংস্কৃতির

আভিজাত্য সম্বন্ধে সদাজাগ্রত অভিমান—ইহাই ছিল তাঁহার নবধর্ম্মের ভিত্তিস্থিত খিলান; কিন্তু সেই ভিত্তির উপরে তিনি যে চূড়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা জাতি ও দেশের অনেক উর্দ্ধে মানুষের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষকেই তুলিয়া ধরিয়াছে—সর্ব্বমানবের যে মনুষ্যত্ব, তাহাকেই প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছে।

অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের জাতিপ্রেমমূলক ধর্ম্মের মূল বা অঙ্কুরকে দেখিবার কালে তাহার ঊর্দ্ধতম শাখার পুষ্পশোভা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। 'অনুশীলন' 'ধর্ম্মতত্ত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থে, এবং অন্যান্য নানা প্রবন্ধে ও প্রসঙ্গে, তিনি তাঁহার সেই মনোগত আদর্শের অতি সুস্পষ্ট সন্ধান দিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসগুলিতে তিনি বাস্তব হইতে সেই আদর্শে আরোহণ করিবার সঙ্কটময় সোপানগুলিকে নানারূপে দেখাইয়াছেন। এই উপন্যাসগুলিতে জাতি-প্রেমের যে কাঁচা আবেগ বা বাস্তব প্রেরণা অনেক স্থলে প্রকটিত হইয়াছে, তাহা প্রধানত কাব্যের প্রয়োজনে। 'মৃণালিনী'-তে যাহার আরম্ভ, 'আনন্দমঠে' তাহার পূর্ণ-উৎসার এবং 'সীতারামে' তাহার শেষ কলধ্বনি রহিয়াছে। এই সকল উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যে জাতি-প্রেমের কল্পনা করিয়াছেন তাঁহার মূলে একটা সেন্টিমেন্ট আছে—সে সেন্টিমেন্ট হিন্দুর হিন্দুত্বগৌরব। আমি পূর্ব্বে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার প্রতি যে শ্রদ্ধার কথা বলিয়াছি—দেশপ্রেমিক ভারতবাসী মাত্রেরই পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি—বঙ্কিমচন্দ্রের জাতি-প্রেমের মূল প্রেরণা তাহাই বটে; কিন্তু এই সকল উপন্যাসে দেশপ্রেমের যে সেন্টিমেন্ট উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সেইরূপ সূক্ষ্ম নহে; কেন এমন হইয়াছে তাহাও বলিয়াছি। নাটকে-উপন্যাসে, passion ও emotion-কেই আর্টের উপাদানরূপে ব্যবহার করিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র যে চরিত্রগুলি চিত্রিত করিয়াছেন, সেগুলির পক্ষে যে বাস্তব আবেগ স্বাভাবিক, তাহারই রং অতিশয় গাঢ় করিয়া তাহাতে ঢালিয়াছেন। কিন্তু এজন্য ইহাদের কাব্য-রস যতই উজ্জ্বল হউক, সেগুলি বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই—বাঙালী-জাতির একটা বৃহৎ অংশের পক্ষে সেই রসউপভোগে যে বাধা ঘটিয়াছে, তাহার মত দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই। এ সমস্যার সমাধান সহজ নহে, হিন্দু বাঙালীর পক্ষে সে বিষয়ে কিছু বলা সঙ্গত বা শোভন নহে। তথাপি, আমার মনে হয়, এ সমস্যার সমাধান শেষ পর্য্যন্ত নির্ভর করিবে সুগভীর জাতিপ্রেম বা একজাতিত্ব-বোধের উপরে। এ জাতির জীবনে এ পর্য্যন্ত সেই সমস্যার সমাধান হয় নাই; সেই সমস্যার সমাধান যদি কখনও হয়, তবে এই যে বাধার কথা বলিয়াছি, উহা আর তেমন গুরুতর বলিয়া মনে হইবে না। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যে ধরণের আবেগ প্রকাশ পাইয়াছে, সেই আবেগের উপকরণকে বড় না করিয়া, তাহার হেতু বা মূল-প্রেরণার উপরে লক্ষ্য রাখিলে, রসাস্বাদনের পক্ষে বাধা কিছু কম হইতে পারে। খাঁটি সাহিত্যরস-বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের দোষগুণ অবশ্য অন্য দিক দিয়া নিরূপণ করিতে হইবে; কোনও জাতির সাহিত্যে, উপন্যাসে বা নাটকে, সেই জাতির জাতিগত সংস্কার, জাতীয় গর্ব্ববোধ, তাহার স্বধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ নানা আকারে নানা ভঙ্গিতে প্রকাশ পাইয়া থাকে—তাই বলিয়া সে

সাহিত্য উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট নয়, কবিকল্পনা যদি তাহাকেই অবলম্বন করিয়া একটা কিছু সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়—তবে কাব্যবিচারে তাহাই গণনীয়, অন্য সকল প্রশ্নই অবান্তর। খ্রীষ্টান বা মুসলমান কোনও বড় কবি যদি তাঁহার কাব্যে কোনও মুসলমান বা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতার পরিচয় দেন, তবে তৎসত্ত্বেও সেই কাব্য কাব্যগুণে উৎকৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু আমি এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের জাতিপ্রেম বা জাতীয়তার আদর্শের কথা বলিতেছি—সেই আদর্শ জাতির জীবনে কতটা শক্তি সঞ্চার করিতে পারে তাহার আলোচনা করিতেছি। তাই, এ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকেও সেই দিক্ দিয়া দেখিবার প্রয়োজন স্বীকার করি নাই। এ বিষয়ে আমার শেষ বক্তব্য এই যে, সেই উপন্যাসগুলি হইতে যদি ইহাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মনে যে ভারতীয় জাতির ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা একান্তভাবে হিন্দু, এবং সেই কারণে তাঁহার দৃষ্টি স্বচ্ছ বা অভ্রান্ত ছিল না, তাহা হইলে তাঁহার সেই ভ্রান্তি বা দৃষ্টিহীনতার বস্তুগত প্রমাণ এখনও সুলভ হয় নাই—ভারতীয় বলিয়াই যে জাতীয়তায় অভিমান, তাহা যে হিন্দুরই একচেটিয়া নহে, যেদিন ইহার নিঃসংশয় প্রমাণ আমাদের জাতির জীবনের সকল ক্ষেত্রে পাওয়া যাইবে, তখনই বঙ্কিমচন্দ্রের অপরাধ আর মার্জ্জনার যোগ্য থাকিবে না।

কিন্তু সেই জাতীয়তাবোধ বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ অনুযায়ী হওয়া চাই—নতুবা বঙ্কিমচন্দ্রকে দায়ী করা যাইবে না। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র যে জাতি-প্রেমের উদ্বোধন করিয়াছিলেন, তাহা রাজনৈতিক স্বার্থসাধনের জন্য, একরূপ চুক্তিমূলক একতাবোধ নহে, বরং এই রাজনৈতিক মনোভাবই তাঁহার সেই জাতীয়তা-ধর্ম্মের ঘোরতর শত্রু। আজিকার রাজনৈতিক আন্দোলন যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে অর্থনৈতিক সমাজতন্ত্রবাদ আছে ; একটা বৃহৎ সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য পরস্পরের মধ্যে যে বন্ধনের প্রয়োজন, সেই ধনসাম্যমূলক স্বার্থের বন্ধন ছাড়া আর কোন বন্ধন তাহার অভিপ্রেত নয় ; তাহাতে মানুষের মন ও দেহ ছাড়া আর কিছুরই মর্য্যাদা নাই—হৃদয়বৃত্তির স্থান তাহাতে নাই, আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠাকে প্রশ্রয় দেওয়া তাহার নীতিবিরুদ্ধ। অতএব ইহা আর জাতীয়তা-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় ; মানুষের মনুষ্যত্বের যে সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ—যে পূর্ণ-আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় ধরা দিয়াছিল, তাহা আজিকার দিনে অতিশয় অবাস্তব এবং নির্ব্বুদ্ধি-প্রসূত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে—মানুষের আত্মার উপরে তাহার মন-বুদ্ধি জয়ী হইয়াছে, মানবজাতির কল্যাণ সম্বন্ধে ধারণাই অন্যরূপ হইয়াছে। অতএব আজিকার এই আদর্শে কেবল সঙ্ঘবন্ধন স্বীকার করিলেই সেই জাতীয়তা-বোধ বা জাতি-প্রেমের পরিচয় দেওয়া হইবে না। ভারতীয় সাধনা ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিয়া—তাহার বিশিষ্ট প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া—অন্যপ্রকার ধার্ম্মিকতার সংস্কারকে যতদূর সম্ভব শাসনে রাখিয়া, সকল ভারতবাসী যদি আপনাকে ভারতীয় বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্ববোধ করে, তবেই বঙ্কিমচন্দ্রের জাতি-প্রেম আমাদের জীবনে সত্য ও সার্থক হইয়া উঠিবে ; তখন 'বন্দেমাতরম্'-গানে হিন্দু

তাহার অন্তরের অন্তরে হিন্দুয়ানির গর্ব্বই অনুভব করিবে না, এবং যাহারা অহিন্দু তাহারাও তাহাতে ভারতীয় জাতীয়তা-ধর্ম্মের প্রেরণাই অনুভব করিবে—তাহাদের ধর্ম্মসংস্কারবিরোধী কোনও ভাবের আঘাতে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে না। কিন্তু যুগের হাওয়া সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী, তাই সে ভরসা ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রকে জাতীয়তা-মন্ত্রের ঋষি বলিয়া আমরা এখনও যে কলরব করি, এবং 'বন্দেমাতরম্'-গানের অমর্য্যাদায় আমরা যে ক্ষোভ প্রকাশ করি, তাহা একালে আমাদের পক্ষে কতখানি সঙ্গত ও শোভন তাহা ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে, সেই জন্য আমি বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিক স্মৃতিপূজা-উপলক্ষ্যে সেই বিষয়েই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম।

আষাঢ় ১৩৪৬

বঙ্কিম-সাহিত্যের রস-বিচার

বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগের লোক সে যুগ গত হইয়াছে, সে সাহিত্যও এখন অচল —যুগের সঙ্গে সাহিত্যও কালের কুক্ষিগত হইয়াছে, এ বিষয়ে আধুনিক-সাহিত্যের সম্রাট হইতে ক্ষুদ্রতম ভৌমিক পর্যন্ত কাহারও মতভেদ নাই। যেহেতু ঊনবিংশ শতাব্দী বিংশ শতাব্দীর অগ্রবর্ত্তী নয়,—পূর্ব্ববর্ত্তী, সেই হেতু সে যুগের সকল কীর্ত্তিই এক্ষণে গলিত ফলের মত মাটি হইয়া গিয়াছে—ইহাই প্রগতিবাদের অবশ্য-স্বীকার্য্য সিদ্ধান্ত। আমার মনে হয়, এইরূপ মনোভাবের ফলেই বাংলা দেশের আধুনিক পণ্ডিতগণ, পুরাতনের উপরে আধুনিকের, এবং আধুনিকের উপরে অতি আধুনিকের স্থান নির্দ্দেশ করিতে এত ব্যগ্র; এবং ইহারই ফলে ইতি-মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের উপরেও পর্দ্দা টানিয়া দিবার ভাব দেখা যাইতেছে। এ-হেন কালে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কোনও আলোচনা অতিশয় অসাময়িক বলিয়াই মনে হয়, অনেক কৈফিয়ৎ দিয়াও মুখরক্ষা করা কঠিন। তথাপি আমি বঙ্কিম-সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে মনস্থ করিয়াছি; বঙ্কিমসাহিত্যকে কোন্ দিক দিয়া বিচার করিলে, আধুনিক রুচি ও রসবোধ ক্ষুণ্ণ হইলেও সাহিত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা নাই, আমি তাহাই ভাবিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব।

ক্রমোন্নতিই যে সৃষ্টির একমাত্র নিয়ম, কাল যতই অগ্রসর হইতেছে মানুষও যে ততই উন্নত হইতেছে—না হইয়া পারে না, এইরূপ একটা বৈজ্ঞানিক মনোভাব আজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কোনও চিন্তা, কোনও ভাব—এমন কি, কোনও কারুসৃষ্টির কালনিরপেক্ষ মূল্য নাই—কালস্রোতের ঘূর্ণাবর্ত্ত যেমন স্থিরকেন্দ্রিক নয়, তেমনই মানুষের অন্তরেও কোন-কিছুর ধ্রুবচ্ছায়া প্রতিফলিত হইতে পারে না—এই তত্ত্ব এ যুগের মানুষকে সর্ব্ববিষয়ে অবিশ্বাসী করিয়াছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই অনিত্যের উপাসনা চলিয়াছে; সেখানেও সকল সৃষ্টিই ক্ষণিক, পূর্ব্বক্ষণকে পরক্ষণ স্বীকার করে না, এবং প্রগতিবাদের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, যাহা পরবর্ত্তী তাহা অগ্রবর্ত্তী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহা প্রমাণ করিতেই হয়।

কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি আর যে ক্ষেত্রেই যথার্থ হউক, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না, দিলে সত্যভ্রষ্ট হইতে হয়। সাহিত্যের জগৎ ও যথাপ্রাপ্ত জগৎ এক নয়; একটি—দেশে ও কালে বিবর্ত্তিত হইতেছে, অপরটি দেশকালকে আশ্রয় করিয়াও যে পরিমাণে তাহা হইতে মুক্ত, সেই পরিমাণেই তাহা উৎকৃষ্ট সাহিত্য-পদবীতে আরোহণ করে। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড—শেক্স্পীয়ার, কালীদাস, গেটে—বিশ্বসাহিত্যের এই সকল প্রকাশ দেশকাল-সম্পর্কিত হইলেও ক্রমবিকাশ বা প্রগতিবাদের প্রমাণ নহে—জাগতিক কার্য্য-কারণতত্ত্ব বা বৈজ্ঞানিক মতবাদ এই ঘটনাগুলি সম্যক ব্যাখ্যা করিতে

পারিবে না। যাঁহারা সাহিত্যের ইতিহাস-রচনার প্রয়োজনে সাহিত্যিক রূপ-বিবর্ত্তনের একটা কালক্রম, অথবা কবি-কল্পনার নানা ভঙ্গির একটা ঋতুপর্য্যায় আবিষ্কার করিয়া, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করেন তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের কেরাণী মাত্র—তাঁহারা সাহিত্য-পণ্ডিত হইতে পারেন, সাহিত্য-রসিক নহেন ; কারণ সাহিত্যের যাহা সার অংশ তাহার ইতিহাস নাই, কাল-প্রবাহে যে ক্ষণগুলি পরস্পরকে দ্রুত অনুধাবন করিয়া চলিয়াছে, এবং যাহাদের মধ্যে একটা পৌর্ব্বাপর্য্য বা ক্রমশৃঙ্খলা আছে, সেইরূপ কোনও ক্ষণ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের জন্মক্ষণ নহে ; সে সাহিত্যের জন্ম হয় মাহেন্দ্রক্ষণে এবং যিনি তাহার স্রষ্টা তিনিও ক্ষণজন্মা।

অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ যে-অর্থে বিগত হইয়াছে, বঙ্কিম-সাহিত্য সে-অর্থে বিগত হয় নাই ; বরং আজিকার বাংলা-সাহিত্যের যে অবস্থা—রবীন্দ্রনাথের মত ঐরাবতও যে অবস্থায় স্রোতোমুখে নিরুপায়ভাবে ভাসিয়া চলিয়াছেন—সেই অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্রকে সেকাল হইতে একালে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, এই মৃতকল্প সাহিত্যের বলাধান হইতে পারিত ; কিন্তু সে সম্ভাবনা ক্রমেই সুদূরপরাহত হইয়া পড়িতেছে। আমি যে ক্ষণজন্মা পুরুষের কথা বলিয়াছি, বাংলা সাহিত্যে সেইরূপ ক্ষণজন্মা পুরুষ যে কয়জন জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, একথা আজিও জাত-সাহিত্যিক ছাড়া সকল শিক্ষিত ও ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন বাঙালীই স্বীকার করিবে।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, খুব বড় যে সাহিত্য, তাহা কালস্রোতের ঊর্দ্ধে বিরাজ করে ; সেই সঙ্গে ইহাও সত্য যে, সকল সাহিত্যই দেশকাল ও জাতির বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় আত্মপ্রকাশ করে। কবিমানসের যে উপলব্ধি, তাহা এমনই পূর্ণ ও প্রত্যক্ষ যে, দেশ-কাল-জাতির বিশিষ্ট লক্ষণ তাহারা বাধা না হইয়া, তাহাকে রূপ দিবারই সহায়তা করে। সেই রূপের যে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য তাহা বাহিরের এই উপাদানের জন্যই ঘটে—এবং কবির অন্তরস্থ প্রেরণা এতই উজ্জ্বল যে, ভাব ও এই রূপের মধ্যে কোনও বিরোধ ঘটে না। এইরূপ পূর্ণদৃষ্টি-সম্পন্ন প্রতিভার যাহা কিছু রচনা, সকলের মধ্যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এমন একটি সুসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় যে, মনে হয়, এই ব্যক্তি যেন কোন্ পরমক্ষণে বিদ্যুদ্দীপ্তির মত একটা কিছুকে সমগ্রভাবে লাভ করিয়াছে—তারপর তাহার সেই উপলব্ধির যত কিছু বিচিত্র বাণীসৃষ্টি তাহা সেই কেন্দ্রগত জ্যোতির্বিন্দুকে আশ্রয় করিয়াই মণ্ডলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা-সাহিত্যে এইরূপ স্বপ্রতিষ্ঠ ও সম্যকদ্রষ্টা কবি-মনীষী এ পর্য্যন্ত একটিরই আবির্ভাব ঘটিয়াছে—সে প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় আমরা এখনও পাই নাই ; সে পরিচয় একবার রীতিমত আরম্ভ হইলে কখনও শেষ হইবে না—বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগের প্রবর্ত্তক, সে যুগ বাঙালী-জাতির ভবিষ্যতের বীজরূপে এখনও কালগর্ভে নিহিত আছে।

আজ বিংশশতাব্দীর এই যুগে বাংলা-সাহিত্যে বঙ্কিমের পরিচয় কি? বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার প্রথম ঔপন্যাসিক, সেকালের সেই অপরিপুষ্ট সাহিত্যের

অতিশয় সংকীর্ণক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসে যৎকিঞ্চিৎ রসদৃষ্টির পরিচয় আছে ; স'র ওয়াল্‌টার স্কটের উপন্যাসাবলীর মতই সেগুলি অল্পবয়স্ক পাঠকপাঠিকার মনোরঞ্জন করিতে পারে,—হয়তো তাহাও পারে না ; কারণ, আজকালকার অল্পবয়স্ক পাঠকপাঠিকারাই সাহিত্যরসে অধিকতর প্রবীণ। একালের যে তিন জন মহাপ্রতিভাশালী লেখকের মতামত সাহিত্যিক মাত্রেই শিরোধার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নানা সময়ের নানা উক্তি এইরূপ ধারণাই সমর্থন করে। ইঁহাদের মধ্যে একজন, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পূর্ব্ব-সূরিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথকে ও পরবর্ত্তীরূপে আপনাকে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এ সমাজে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে কিছু বলিতে যাওয়া নিতান্তই পক্ষসমর্থনের মত হয় ; বর্ত্তমান লেখকের পক্ষে সেরূপ কাজ আদৌ রুচিকর নহে। একালের রুচি ও রসবোধের যে বিকাশ, এবং সাহিত্য সমালোচনার যে পদ্ধতি দেখা যাইতেছে—বড় বড় পণ্ডিতগণ যে ভাবে এই রুচির জয় ঘোষণা করিতেছেন, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্র কেন, যে কোনও শক্তিমান লেখকের সম্বন্ধে সাহিত্য-নীতিসংগত আলোচনা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কীর্ত্তি যে তাঁহার উপন্যাস, তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় যে তাহাতেই আছে—অর্থাৎ এই উপন্যাসগুলির মূল্যেই তাঁহার কবি-প্রতিভার মূল্য নির্ণয় করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি, ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র কেবল উপন্যাস-লেখকই নহেন। স্কট, জর্জ এলিয়ট, ডিকেন্স, থ্যাকারে মেরিডিথ, হার্ডির সঙ্গে তুলনা করিয়া, অথবা আধুনিক বাংলা উপন্যাসের নবতম আদর্শ ও নব্যতম ভঙ্গিমার মাপ-কাঠিতে যাচাই করিয়া লইলেই ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের পরিচয় সম্পূর্ণ হইবে না। ঐতিহাসিক উপন্যাস, নভেল, রোমান্স প্রভৃতির আকৃতি-প্রকৃতি এবং ঐ জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতির সূত্র ধরিয়া, কতকগুলি বাঁধা ফরমূলার সাহায্যে, বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যকাব্যগুলিকে কেবল পুঁথি-পড়া করিয়া বিদায় করিলেই চলিবে না। কারণ, ইহাই আধুনিক সমালোচনাশাস্ত্রের নীতি যে, উৎকৃষ্ট মৌলিক সৃষ্টির জাতিবিচার চলে না ; তাহার যে জাতি সে তাহারই, আর কাহারও সহিত তাহার জাতি-সম্পর্ক নাই ; তাহাকে বিচার করিতে হইবে তাহারই আদর্শে। অতএব, বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লিখিয়াছেন, সেই হেতু তিনি ঔপন্যাসিক, তাঁহার গ্রন্থগুলিতে উপন্যাস-রসরসিক পাঠকের রুচি ও কলাকুতূহলী চিত্ত কতখানি তৃপ্তি পায়, ইহাই দেখিতে হইবে, তাহার অতিরিক্ত কোনও কথাই অবান্তর এমন পণ করিয়া বসিলে, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সকল আলোচনাই নিষ্ফল হইবে। উপন্যাস তো সকলেই লেখে, আজকাল রামা-শ্যামাও উপন্যাস লিখিতেছে এবং প্রায় সকলেই, অন্তত বঙ্কিমের চেয়ে বড় আর্টিষ্ট। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ হইতে কলেজের অধ্যাপক পর্য্যন্ত সকলেরই এই মত। সাহিত্যিক প্রগতিবাদীরা যে সকল প্রতিভার আগমনী-গান করিতেছেন, এবং তাহার ফলে সাহিত্যের যে স্টাইল, ও উপন্যাসের যে আদর্শ জয়যুক্ত হইতেছে, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রকে ঔপন্যাসিক নামে অভিহিত

করিতে কুণ্ঠাবোধ হওয়াই স্বাভাবিক। আধুনিক সমালোচনার এই প্রবৃত্তি দেখিয়াই আমাকে এ বিষয়ে সাবধান হইতে হইয়াছে।

আমি জানি, এ কথা অনেকের মনঃপূত হইবে না, এজন্য আমার বক্তব্য আর একটু ব্যাখ্যা করিয়া বলা প্রয়োজন। বঙ্কিম-প্রতিভার সাহিত্যিক বিচারই আমারও অভিপ্রায়, সে বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান এতটুকু নামিয়া যাইবে না; আমিও কবি-বঙ্কিমের কথাই বলিতে চাই। বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিকই বটেন, কিন্তু তাঁহার সেই উপন্যাসের প্রেরণা অতিশয় স্বতন্ত্র; সেই প্রেরণার দিক দিয়া না দেখিয়া—কেবলমাত্র একটা বিশিষ্ট সাহিত্য-কলার দিক দিয়া দেখিলে, তাহার রসাস্বাদনেও যেমন বাধা ঘটিবে, তেমনই একজন বিশিষ্ট কবি-ব্যক্তির ব্যক্তি-মানসের সহিত পরিচয় করা যাইবে না।

ইংরাজীতে একটি কথা আছে—'Style is the man'—কথাটা একজন বিখ্যাত ফরাসী লেখকের সৃষ্টি, এই কথাটিই আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনায় সর্ব্বপ্রথম যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মত বঙ্কিম-সাহিত্য সম্বন্ধেও এই উক্তি সত্য—এবং অতিশয় যথার্থভাবে সত্য। প্রত্যেক সাহিত্য একটি বিশিষ্ট সাহিত্য, তাহার বাণী তাহারই। এই বাণী-কথাটিও বাংলায় একটু বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিলে ভাল হয়। প্রথমত—ভাষা অর্থেই বাণী নয়; আবার অধুনা-প্রচলিত অর্থে বাণী বলিতে যাহা বুঝায় তাহাও নয়; অর্থাৎ, কোনও মত, উপদেশ বা মূল্যবান উক্তি নয়। ভাব যখন ভাষায় রূপপরিগ্রহ করে, তখনই তাহাকে বাণী নাম দিব। ভাবের এই যে বাঙ্ময় রূপ বা বাণী—ইহা সম্ভব হয় যখন সেই ভাব ব্যক্তিবিশেষের ভাব—অতিশয় মৌলিক ও স্বতন্ত্র; এই বাণী ব্যক্তিরই আত্মপ্রকাশ—ইহারই নাম স্টাইল। এক ব্যক্তির যে বাণী, তাহার বিস্তার ও বৈচিত্র্য যেমনই হউক, তাহা সর্ব্বত্র এক—তাহার সমগ্র রচনাই একই ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ। এক ভাষার সাহিত্যে এইরূপ বহু বাণী থাকে—প্রত্যেকটি এক একটি স্বতন্ত্র স্টাইল, এক একটি ব্যক্তি। সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যদি পূর্ণ বিকশিত হইয়া থাকে, তাহার সমস্ত ভাব চিন্তা কল্পনা যদি সেই একটা ব্যক্তিকেন্দ্রে সুসমাহিত হইয়া থাকে, তবে তাহার সকল রচনায় এক স্টাইল পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে, তাহার সেই মানস-পদ্মের দলবিস্তারে কেন্দ্রটি হারাইয়া যাইবে না; পুষ্প যতই নব নব দলে বিকশিত হউক, তাহা সেই বৃন্তটিরই চতুষ্পার্শে মণ্ডলায়িত হইয়া উঠিবে। এইজন্য উৎকৃষ্ট প্রতিভার যাবতীয় বাণী—সেই একই ব্যক্তির—একই ভাবের প্রকাশ, এবং তদ্‌রচিত সমগ্র সাহিত্যকে একটি স্টাইল বলিতে হইবে।

এই অর্থে যে স্টাইল, তেমন স্টাইল বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের তুল্য আর কুত্রাপি নাই। অন্যান্য ছোট-বড় লেখকের লেখায় যে ধরণের ব্যক্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, তাহা অনেক সময়ে একটা বহির্গত বস্তু; তাহার পরিধিও যেমন সংকীর্ণ, তেমনই তাহাকে একটি বিশিষ্ট টেক্‌নিক্‌ভঙ্গি বলা যাইতে পারে। যে ব্যক্তিত্বের কথা আমি উপরে বলিয়াছি, সেই ব্যক্তিত্বের মূল গ্রন্থি খুব বড় লেখকের সাহিত্য-

স্ব .তও বার বার ছিঁড়িতে ও নূতন করিয়া জোড়া লাগিতে দেখা গিয়াছে—লেখক যেন তাঁহার জীবনে কখনও আত্মস্থ হইতে পারেন নাই। যাঁহারা সাহিত্য-কলা-বিলাসী, তাঁহাদের এই personality অতিশয় দুর্ব্বল, নানা রং, রূপ ও আলোর নিত্য নব আকর্ষণে তাঁহাদের আত্মা বিক্ষিপ্ত ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। ভাবের পরিধি যদি সংকীর্ণ হয় তাহা হইলে এক প্রকার ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয় বটে, কিন্তু ভাবের লীলা যদি অফুরন্ত হয় তাহা হইলে তাহার মূল গ্রন্থি যেমন শিথিল হইয়া যায়, তেমনই সে প্রতিভা আপন ব্যক্তিত্বকে বার বার খণ্ডিত করে। বঙ্কিম-সাহিত্যের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটি ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ভাবের বিচিত্র ও পূর্ণতম বিকাশ সুস্পষ্ট হইয়া আছে; তাঁহার সর্ব্ববিধ রচনার মধ্যে সেই এক ব্যক্তি, এক স্টাইল জাজ্জ্বল্যমান—বঙ্কিম-নামক ব্যক্তি-কেন্দ্রে একটি ভাবজগৎ সকল দিকে পূর্ণমণ্ডলায়িত হইয়া রহিয়াছে। এই ব্যক্তিগত অথচ সমগ্র দৃষ্টিই তাঁহার প্রতিভার অনন্যসাধারণ লক্ষণ; ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, এবং 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ও 'সাম্যে'র বঙ্কিমচন্দ্র এক ব্যক্তি। জীবনকে খণ্ডিত করিয়া তাহার অংশবিশেষে সাহিত্যিক কলা-কুতূহলতৃপ্তি সে প্রতিভার প্রবৃত্তি নহে। এইজন্যই আমি স্টাইল কথাটা লইয়া এতক্ষণ যে আলোচনা করিলাম, তাহা এই প্রসঙ্গে অবান্তর নহে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভা যে কোন্ শ্রেণীর তাহা বুঝিতে হইলে আর একটা কথাও এই স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমরা আজকাল যাহাকে আর্ট বলি—যে সাহিত্য-নীতির দোহাই দিয়া থাকি এবং যাহার অনুশাসনে, এক দিকে যেমন রোমান্টিকের উপরে রিয়ালিষ্টিকের জয়ঘোষণা করি, এবং অপর দিকে সাহিত্য হইতে সর্ব্ববিধ আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠাকে বহিষ্কার করিতে চাই, সেই আর্ট প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যকে [illegible]র্ব্ব করে—সাহিত্যে মানব-চৈতন্যের পূর্ণ অভিব্যক্তির বাধা হইয়া দাঁড়ায়। জীবনই সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য, সেই জীবনের কোনও রূপ যখন বাণী হইয়া উঠে ত[illegible]নই তাহা সাহিত্য হয়, প্রথমে ইহাই হওয়া চাই। পরে আমরা যখন সেই বাণীরূপের কৌশল পৃথকভাবে লক্ষ্য করিতে পারি, তখন আর্ট সম্বন্ধে সজ্ঞান হই—আর্ট আগে, পরে সাহিত্য নয়। জীবনকে যে দেখে নাই, সে সাহিত্যে সেই জীবনের প্রকাশকে বুঝিবে কেমন করিয়া? স্টাইলেরই বা সে কি বুঝিবে? কতকগুলি সুপরিচিত সহজবেদ্য emotion-কে কলা-কৌশলে বাণীরূপ দিবার শক্তিই শ্রেষ্ঠ প্রতিভার লক্ষণ নয়; জীবনের একটা খণ্ডকে লইয়া যে সাহিত্য রচিত হয়, তাহা good art হইতে পারে—great art নয়; এবং জীবন বলিতে যতদূর সম্ভব একটা সমগ্র ভাব বা সমগ্র দৃষ্টির কথাই মনে রাখিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মত করিয়া, তাঁহারই দৃষ্টিদ্বারা, এই জীবনের একটা সমগ্র রূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, এবং সে কল্পনা বাস্তবের সহিতই বোঝাপড়া করিতে চাহিয়াছিল। জীবনের খণ্ড-সমস্যা নয়—আজকাল যাহাকে সমস্যা বলা হয় সেই সমস্যা নয়—তাঁহার ভাব-কল্পনার পরিধিতে যে সমগ্র বাস্তব বৃহৎরূপে প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া

একটি সুসমঞ্জস রূপে পুনঃসৃষ্টি করিয়াছিলেন—তাঁহার সমগ্র সাহিত্য ইহারই প্রকাশ। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও সজ্ঞান আর্ট-সাধনা ছিল না ; জীবনকে উপেক্ষা করিয়া কেবল তাহার খণ্ডরূপের রসোদ্ঘাটনই তাঁহাব সাহিত্যিক ধর্ম্ম ছিল না। জীবন ও জগতের যে রূপ তিনি আত্মগোচর করিয়াছিলেন, তাহাই বীজরূপে তাঁহার কল্পনায় অঙ্কুরিত হইয়া সপল্লব শাখাকাণ্ডে একটি বৃহৎ সুঠাম বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়াছিল ; এই বৃক্ষের মূল কুত্রাপি মৃত্তিকার আশ্রয় ত্যাগ করে নাই, ইহার শীর্ষদেশ ঊর্দ্ধমুখী হইলেও কখনও শূন্য ব্যোমকে আকাঙ্ক্ষা করে নাই। তিনি সেই জীবনকে যে কাব্যগুলিতে প্রতিফলিত করিয়াছেন, তাহারা romanticও নয়, realisticও নয়—পুরুষের প্রবুদ্ধ চেতনায় বাস্তবের যে সর্ব্বাঙ্গশোভন রূপ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব, তাহারই একটি ব্যক্তিস্বতন্ত্র ভঙ্গি সেগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র জীবনকে অতিশয় বাস্তবরূপেই দেখিয়াছিলেন—রস-ব্রহ্মের সাঙ্কেতিক প্রকাশরূপে নয়, নীতিনিয়মহীন জড়বাস্তবরূপেও নয়। তাঁহার জগৎ যেমন প্রত্যক্ষ, তেমন জীবন্ত। সে জগৎ সুন্দর বলিয়াই তাহার মূলে একটা নীতি বা ধর্ম্ম আছে, কারণ নীতিই সকল সৌন্দর্য্য, সকল মহিমা ও সুষমার নিদান। এই নীতির ঊর্দ্ধে আর কিছুকে স্থাপন করিবার প্রয়োজনও নাই—সেই নীতির পূর্ণ লীলার বিগ্রহ যে মানুষ, তাহাকে অতিক্রম করিয়া কোনও অলৌকিক সত্তা বা পরলোকের ভাবনাকে তিনি প্রশ্রয় দেন নাই। এই যে মনোভাব ইহা নিশ্চয় বিশুদ্ধ দর্শন বা বিজ্ঞানের মনোভাব নহে ; আবার যে সুসঙ্গত ভাব-চিন্তার দ্বারা তিনি এই মনোভাবকে শোধন করিয়া লইয়াছিলেন তাহাও কবিজনোচিত রসাবেশের লক্ষণ নয়। ইহার কি নাম দিব ?—কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানবিদ্, ঐতিহাসিক, তিনি খাঁটি কোনটাই নহেন ; বরং ইহাই বলিতে হয় যে, এখানে এমন একটি দৃষ্টির সৃষ্টি হইয়াছে যাহাতে মানব-মানসের বিভিন্ন বৃত্তি একযোগে কাজ করিতেছে—বাস্তব ও আদর্শের সমন্বয় সাধন হইয়াছে। জীবনের যে বাস্তবরূপ মানুষকে চিরদিন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে, সেই বিরাট দুর্জ্জেয় দুঃসহ বাস্তবের সম্মুখীন হইবার সাহস বা শক্তি যাহাদের নাই, তাহারাই বঙ্কিমচন্দ্রকে অবাস্তব ভাববিলাসী বলিয়া নাসা কুঞ্চিত করে, এবং বাস্তবের নামে অবাস্তবেরই সাহিত্য রচনা করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির বিরুদ্ধে আধুনিক রসিকমণ্ডলীর অভিযোগ এই যে, তাহাতে প্রবল নীতিনিষ্ঠা ও যুক্তিবিরুদ্ধ কল্পনা—এমন কি, অলৌকিক ও অপ্রাকৃতও স্থান পাইয়াছে। এই অভিযোগের কোনটি তথ্যহিসাবে মিথ্যা নয়, এবং তত্ত্ব-বিচারের দ্বারা তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিলেও কোনও ফললাভ হইবে না। কারণ সাহিত্যের বিরুদ্ধে যে আপত্তি, তাহা প্রধানতঃ তত্ত্বঘটিত নয়, রুচিঘটিত ; রসের কথাটা অনেক সময়ই অবান্তর—রসের ধার খুব কম লোকেই ধারে। রুচি ও রসজ্ঞান এই দুইটি প্রায় একসঙ্গে অবস্থান করে না—রস-জ্ঞান-শাসিত রুচি ও রসজ্ঞানবর্জ্জিত রুচি, এ দুইয়ের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। জীবনকে দেখিবার ভঙ্গি সাধারণ রসিকের একরূপ, আর্টতান্ত্রিক সাহিত্যবিলাসীদের একরূপ, এবং ভাবুক মনস্বী অথচ রসরসিক পুরুষের আর একরূপ। বঙ্কিমচন্দ্র যে রসিক ছিলেন,

একথা বোধ হয় আজিকার অধ্যাপকেরাও স্বীকার করিবেন ; এবং ভাবকে ভাষায় রূপ দিবার শক্তি যে তাঁহার ছিল, এ কথা ছাত্রসভায় স্বীকার না করিলেও, মনে মনে বোধ হয় স্বীকার করেন। বাকি দাঁড়াইতেছে এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের একটা অর্থ করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি তথাকথিত আর্ট লইয়াই তৃপ্ত ছিলেন না। ইহাতে যদি কোনও অভিযোগের কারণ থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে তাহা যে রুচিঘটিত তাহাতে সন্দেহ নাই ; কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের সেই জীবন-বাদ তাঁহার কাব্যে রূপপরিগ্রহ করিয়াছে, তিনি যে কত বড় কবি তাহা স্বীকার করিবার মত রসজ্ঞানী রসিকের অভাব পূর্ব্বেও যেমন হয় নাই, পরেও হইবে না ; কোন বড় কবির পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, সাক্ষাৎভাবে আমি তাহার প্রতিবাদ করিলাম না। কারণ সে প্রতিবাদ নিষ্ফল। রসবোধ যুক্তির চেয়ে বড়, সেখানে যুক্তির প্রয়োজনই হয় না ; কিন্তু রুচি যদি মানুষের প্রবৃত্তির মত—রিপুর মত—অন্ধ ও প্রবল হইয়া উঠে, এবং সেই সঙ্গে মহামূর্খতা-কেই পরম পাণ্ডিত্য বলিয়া গর্ব্ব করিবার মত একটি সমাজের সৃষ্টি হয়, তবে তাহার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি কোন তর্ক চলে না ; আরও কারণ এই যে আজিকার দিনে এইরূপ পাণ্ডিত্যই অতিশয় সুলভ হইয়াছে। আমি পূর্ব্বে শুধুই রসিকতা নয়, রস-জ্ঞানেরও উল্লেখ করিয়াছি, এখানে সে সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব। নিছক কাব্যরসের আস্বাদনে আমাদের যে বৃত্তি চরিতার্থ হয়, তাহার সঙ্গে জীবন বা জগৎসমস্যার কোনও সম্পর্ক নাই। আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম—যিনি জীবন-সত্যকে উৎকৃষ্ট কবিকল্পনার সহিত যুক্ত করিয়া-ছিলেন ; জীবনের সহিত সেই বোঝাপড়ার ভার তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র বা মোক্ষশাস্ত্রের উপরে বরাত দিয়া তাহাকে কাব্য-সাহিত্য হইতে দূরে রাখেন নাই। কিন্তু কবিমানসের এই যে জীবন-জিজ্ঞাসা, ইহাও রূপরসপ্রধান—ইহারও মূলে আছে অপরোক্ষ অনুভূতি, অতএব ইহা উৎকৃষ্ট কবিকল্পনার পরিপন্থী নহে। ইহাকে রসিকতা না বলিয়া রসজ্ঞান বলিয়াছি এই জন্য যে, এইরূপ প্রেরণায় ব্রহ্মাস্বাদের পিপাসা নাই, ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে এই জগৎ-সৃষ্টিই সর্ব্বদা সমক্ষে বিদ্যমান থাকে এবং তাহারই রহস্যভেদ-জনিত আস্বাদ কবিচিত্তে আনন্দ দান করে—শুধুই আনন্দ নয়, সেই আনন্দের সম্বন্ধেও সজ্ঞানতা থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা জগৎ ও জীবনকে অতিক্রম করিতে চাহে নাই, তিনি জীবনের বাহিরে আর কিছুকে স্বীকার করেন নাই, তাঁহার আধ্যাত্মিকতাও সম্পূর্ণ আধিভৌতিক, এজন্য খাঁটি হিন্দুর দিক দিয়া তিনি নাস্তিক ছিলেন। আবার এই জীবনের বাস্তবগভীর সমস্যাকে, রসবাদী আর্টিষ্টের মত—পাশ্চাত্ত্য সংশয়বাদীর মত—অগ্রাহ্য করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার মত প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না ; তাই আর এক অর্থে তিনি ঘোরতর আস্তিক ; এই আস্তিকতার জন্যই তিনি সাহিত্যে নীতি-পরায়ণতার অপরাধে অপরাধী। জীবনের প্রতি যাহাদের সত্যকার শ্রদ্ধা নাই, তাহারাই বাস্তববাদের নামে বঙ্কিমের বিরুদ্ধে কলরব করিয়া থাকে।

রসের বিচারে কোনরূপ ফিলজফি বা মতবাদের পৃথক মূল্য নাই তাহা জানি, কিন্তু ইহাও সত্য যে, উৎকৃষ্ট কবি-প্রেরণার যে বাণী, তাহাতে জীবন বা ভাগবতী সৃষ্টির সম্বন্ধে একটা বিশেষ উপলব্ধি ফুটিয়া উঠে—এই উপলব্ধির নানা রূপ আছে। শেক্স্পীয়ারের নৈর্ব্যক্তিক কল্পনায় মানুষের ভাগ্য ও জগৎবিধানের সুস্পষ্ট অর্থ ধরা না পড়িলেও, মহাকবির একটা মনোভাব তাহার মূলে নিশ্চয়ই বিদ্যমান আছে। সেই মনোভাবের প্রকাশ-ভঙ্গি হইয়াছে নাটক। বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্তে যে জগৎ-সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে একরূপ মনোভাব এক নূতন সাহিত্যিক রূপ আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—অলঙ্কারশাস্ত্রের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে আমরা সেই রূপকে উপন্যাস নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। তাঁহার অপরাপর রচনায় যে সজ্ঞান চিন্তা ও বিচারবুদ্ধি আছে, তাহাও সেই এক ভাবদৃষ্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—সে যেন সেই একই ভাবানুভূতির টীকা-ভাষ্য। বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনা এই দুইয়ের এমন আশ্চর্য্য একমুখীনতা সচরাচর দেখা যায় না। পূর্ণ মনুষ্যত্বের যে আদর্শ তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, তিনি আপনার মধ্যেই যেন তাহার কতকটাকে পাইয়াছিলেন। ইহা যে তাঁহার নিজ ব্যক্তিত্বেরই একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ—কোনও তত্ত্ব বা চিন্তা-গ্রন্থি নহে, তাঁহার উপন্যাসগুলিই তাহার প্রমাণ। কারণ, চিন্তামাত্রেই বিশ্লেষাত্মক, তাহা দ্বারা রূপসৃষ্টি হয় না; সকল তত্ত্ব নিরাকার—তত্ত্বও ভাবরূপেই অপরোক্ষ হয়; এবং যখন সেই ভাব রূপধারণ করিবার সামর্থ্য লাভ করে, তখনই তাহা সেই শক্তির বলে সৃষ্টির সত্যে পরিণত হয়। বঙ্কিচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে ইহার সাক্ষ্য রহিয়াছে; গ্রন্থের মুখবন্ধে বা আখ্যানপত্রের উপরে নানা বচন উদ্ধৃত করিয়া, তিনি যে তত্ত্বটির প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন, তাহাই আখ্যানমুখে, ভাবকল্পনার অবারিত বেগে, জীবনের পটভূমিকার উপরে রঙে ও রেখায় প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। 'দেবীচৌধুরাণী'র প্রফুল্ল এমনই একটি শরীরী চিন্তা, তথাপি কে বলিবে সে একটি রূপক মাত্র—জীবন্ত নারীমূর্ত্তি নহে! 'আনন্দমঠ' এমনই একটা ভাবচিন্তার বাণী-রূপ—শুধু তাহাই নহে, একটা সম্পূর্ণ বিদেশী ভাব-সত্যকে, তিনি এই দেশের জল মাটি আকাশ ও অরণ্যের পরিবেশে, এবং এই জাতির মজ্জাগত সংস্কারের অনুকূল করিয়া, কী জীবন্ত জগৎরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন! আমি এখানে তাঁহার কল্পনা বা সৃষ্টিশক্তির কথাই বলিতেছি না—সে কবিত্বের যে নিদর্শন তাঁহার কাব্যে আছে, তাহা সকল শ্রেষ্ঠ কবির পক্ষেই গৌরবজনক; এখানে আমি কেবল ইহাই বলিতেছি যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্যকীর্ত্তির মূলে ছিল যে প্রেরণা তাহা কোনও চিন্তা বা মতবাদের প্রেরণা নহে; তাহা সেই পূর্ণদৃষ্টি; যাহার বলে, ভাব ও রূপ, তথ্য ও তত্ত্ব, বাস্তব ও আদর্শ এক হইয়া যায়, রসপিপাসা ও জীবন-জিজ্ঞাসার মধ্যে কোনও বিরোধ থাকে না।

এই যে প্রতিভা—ইহা এমনই স্বতন্ত্র যে, ইহার বাণী সাহিত্যবিচারে একটা নূতন আদর্শ ও নূতন রুচির দাবি করিতেছে। বঙ্কিম-সাহিত্যে একটা জীবনবাদেরই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সে জীবনবাদের এক দিকে আছে প্রত্যক্ষের উপাসনা, যাহা আছে

তা ছাড়া আর কিছুকে স্বীকার না করিয়া, তাহারই ইঙ্গিত অনুযায়ী পূর্ণ মনুষ্যত্বের সন্ধান। অপর দিকে আছে, সেই প্রত্যক্ষকে একটি সমগ্র উপলব্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত করা—জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম, এই ত্রিবিধ উৎকণ্ঠার নিবৃত্তিসাধন। প্রথম দিকটির প্রেরণা য়ুরোপীয়; দ্বিতীয়টি ভারতীয় সংস্কারের ফল। তিনি জীবনকে কেবলমাত্র আর্টের অধীন করিয়া দেখেন নাই, মানুষের চরিত্রে অন্ধ নিয়তির লীলাই প্রত্যক্ষ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যে রোমান্স-রস আছে তাহার কারণ রসাবেশের অসংযম নহে; অতিশয় স্থিরদৃষ্টিতে জীবনের বাস্তব-মহিমাকে বরণ করিয়া যথাযথ প্রকাশ করিবার আকাঙ্ক্ষাই তাহার কারণ। এজন্য তাঁহার রচনায় যে নীতিজ্ঞানের প্রভাব আছে, তাহাতে যদিও আর্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহাতে সাহিত্যের ক্ষতি হয় নাই। কারণ, সাহিত্যের উৎস আর্ট নহে—ব্যক্তি-প্রতিভা, এবং জীবনকেই যে যত বড করিয়া দেখিয়াছে সেই তত বড় ব্যক্তি—তাহার যে বাণী তাহাই উৎকৃষ্ট স্টাইল, তাহাই great art; আর সকল আর্ট—আর্টমাত্র; সে আর্ট মরসুমী ফুলের মত যেমন চমকপ্রদ তেমনই ক্ষণস্থায়ী। যে সকল কাব্য আদিকাল হইতে মানুষের জীবন-রসে অভিষিক্ত হইয়া আজও পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে, যাহার আর্ট মানুষের প্রাণের আকুল উৎকণ্ঠা নিবারণ করে, যাহার মধ্যে তাহার ভয়-ভাবনা দ্বন্দ্ব-সংশয় একটি পরম উপলব্ধি দ্বারা আশ্বস্ত হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সেই শ্রেণীর, তাঁহার সাহিত্যকীর্ত্তিও সেই প্রশস্ত ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। তথাপি তাঁহার তুলনা তিনিই। বর্ত্তমান যুগে সেই সাহিত্যের যে পরিণাম লক্ষ্য করা যায়, তাঁহার গদ্যকাব্যগুলি তাহারই শেষ নিদর্শন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ য়ুরোপীয় জ্ঞান-সাধনা, একজন বাঙালীর প্রতিভাকে আশ্রয় করিয়া যে ভারতীয় মনীষাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল, তাহার ফলে জীবনের বাস্তব যে ধরণের কল্পনায় এক নূতন রূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার যথার্থ মূল্য নিরূপণে এখনও বিলম্ব আছে।

অতি-আধুনিক সমালোচক ও বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিম-জীবনী বা বঙ্কিম-সাহিত্য—কোনটারই সম্যক আলোচনা এ যাবৎ বাংলা-সাহিত্যে হয় নাই। না হওয়ার কারণ অনেক। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ, সে যুগের এই তিন মহত্তর বাঙালী পুরুষ মনঃপ্রাণের যে শক্তি ও যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা এই অলস, ভাবাতিরেক দুর্ব্বল চরিত্রহীন জাতিকে ক্ষণেকের জন্য বিস্ময়-বিমূঢ় করিয়াছিল মাত্র—সে জীবন, সে চরিত্রকে বুঝিবার শক্তিও ছিল না, আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। চিন্তার ক্ষেত্রে বাঙালী মৌলিকতাকে ভয় করে—তৎপরিবর্ত্তে বিদেশী বিদ্যার ধারকরা বড-বড বুলি সংক্ষেপে ও সহজে মুখস্থ করিয়া তাহারই আবৃত্তি দ্বারা স্বদেশী সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া থাকে। গত এক শত বৎসরের অধিককাল যে শিক্ষা জাতীয় শিক্ষারূপে পরিণত হইয়াছে—সে শিক্ষা এই প্রবৃত্তির পুষ্টিসাধনপক্ষে বডই উপযোগী হইয়াছে। এক ধরণের মেধা—যাহাকে পরবিদ্যা মগজস্থ করিবার শক্তি বলা যাইতে পারে—স্বকীয় চিন্তার বিঘ্নমাত্র ব্যতিরেকে পরকীয় চিন্তার অনুসরণ, ও তদ্দ্বারা মস্তিষ্ক-ভরণ করিবার সেই যে শক্তি—তাহাই সাধারণ বাঙালী-জিনিয়াস। ইহাতে, যে সকল বিষয় বিদেশের পণ্ডিতেরা সমাধান করিয়া দিয়াছেন, সেই বিষয়ে পঞ্চমুখ হওয়া তাহার পক্ষে সুখসাধ্য, এবং তাহাই পাণ্ডিত্য প্রমাণ করিবার সহজ পন্থা। কিন্তু নিজের সমাজে, সাহিত্যে ও জীবনে, যদি ভাবিবার মত কিছু থাকে—কোনও নূতন আবির্ভাব, মৌলিক প্রতিভা বা অভিনব প্রকাশ ঘটে, তবে তাহার বড়ই মুশকিল হয়। যদি সে সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন উঠে, তবে দুই উপায়ে তাহার সমাধান হইয়া থাকে—তাহাকে বাংলা বা বাঙালী বলিয়া আলোচনার অযোগ্য হিসাবে বিদায় করা; অথবা, বিদেশী বিদ্যার স্বদেশী প্রয়োগে তাহার এমন অদ্ভুত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা যে, তাহার স্বরূপ-বিরূপ একাকার হইয়া যায়।

এ তো গেল পণ্ডিতদের কথা। সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভাব ও ভাবুকতা যাত্রা-থিয়েটারেই চরিতার্থ হয়। সমাজের মধ্যে যাহারা বড়, তাহারা যে দিকে যে কারণে বড় হউক, তাহাদিগকে আমরা ভয় অথবা ভক্তি করি—বিচার বা চিন্তার ধার ধারি না। জ্ঞানের সব চেয়ে বড় যা—সেই আত্মজ্ঞান এ জাতির নাই বলিলেই হয়; হাসিয়া কাঁদিয়া, কখনও মুক্তকচ্ছ, কখনও কৃতাঞ্জলি হইয়া, জীবনটাকে কোনরূপে সহাইয়া লওয়াই এ জাতির ধর্ম্ম। বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর, বঙ্কিম বেড়ে লেখে, এবং বিবেকানন্দ সাহেবদের দেশে হাততালি পাইয়াছে—ইহার বেশি জানিবার বা বুঝিবার প্রয়োজন তাহার নাই, কারণ বৈঠকখানায় বা চণ্ডীমণ্ডপে ঐটুকুই যথেষ্ট। পণ্ডিত ও অপণ্ডিতে তফাৎ এই যে একজন ধূর্ত্ত, অপরটি বোকা; একজন শহুরে, অপরজন গেঁয়ো।

এই সমাজে যখন বঙ্কিমের মত অতিশয় সাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষের সম্বন্ধে

কিছু বলিতে হয়, তখন মনে না হইয়া পারে না যে, সে কথায় কান পাতিবার আগ্রহ কাহারও নাই—আগ্রহ থাকিলেও সে কথার ভাবগ্রহণ করিতে হইলে যে সংস্কার থাকা প্রয়োজন তাহা নাই। কিন্তু কিছু না শুনিয়া এবং না বুঝিয়া, এই সমাজে দাদাঠাকুরের মত পাণ্ডিত্য জাহির করিবার মত প্রবৃত্তি অনেকেরই হইবে। কারণ, যাহারা থলিতে পরের বুলি বাজাইয়া বাজার সরগরম করে—তাহাদের রসনা নিরঙ্কুশ। দ্বিতীয়ত, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গে শুধুই পাণ্ডিত্য ও রসবোধ নয়—সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার প্রয়োজনও আছে। সস্তা পাণ্ডিত্যের ও যাথুশি বলিবার সৎসাহস যাহাদের আত্মপ্রসাদের কারণ, নিজেরা মনে ও প্রাণে অতিশয় ক্ষুদ্র বলিয়া মহত্ত্বের প্রতি যাহাদের সহজাত আক্রোশ—বড়র প্রতি দাঁত খিঁচাইয়া নিজেদের ইতরতা প্রকাশ করিতে যাহাদের কিছুমাত্র বাধে না—তাহাদের সমাজে বঙ্কিম-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেই অতিশয় সঙ্কোচ বোধ হয়। উত্থাপন করিয়া কোনও লাভ নাই। সমুদ্র দেখিয়াও যাহারা তাহাকে খুব বড় পুকুর বলিয়া ধারণা করে, গৌরীশৃঙ্গ দেখিয়া একটা অত্যন্ত বিসদৃশ বিপর্য্যয় এবং দুরারোহ পাথুরে-কাণ্ড বলিয়া যাহারা নাসিকা কুঞ্চিত করে—তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিবে কে? কিন্তু উঁচু ঢিবি ও তালপুকুরের কথা সকলেই বোঝে। এ আসরে বঙ্কিমের পরিচয় করিতে যাওয়া বাতুলতা নয় কি?

তথাপি কথাটা তুলিয়াছি। সত্যকার রসিকের সংখ্যা কোনও কালে কোনও সমাজে অধিক নয়। একালে আরও কম। কারণ এ যুগের আবহাওয়াই রসিকতাবিরোধী। যেটুকু রসিকতা আমাদের এই সমাজে ছিল বা এখনও আছে, তাহাও এই যুগবিরুদ্ধতার ফলে যেন সঙ্কুচিত হইয়াছে—মুখ ফুটিতে পায় না। এককালে অল্পই বহুকে শাসন করিয়াছে—যখন বিদ্যার কৌলীন্য ছিল, তখন তাহার কাছে মূর্খতা আত্মসম্বরণ করিত। এখন দুই টাকায় যেমন বড়-মানুষী করা যায়, তেমনই দুই পাতা বর্ণজ্ঞান লইয়া রসনার আস্ফালনে বাধা নাই! এ অবস্থা বিশেষ করিয়া দাস-জাতির পক্ষে অবশ্যম্ভাবী; কারণ, আত্ম-মর্য্যাদা-বোধ যাহার নাই, তাহার মহৎকে অপমান করিতে বাধে না। এ সমাজে ইহারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, অথবা ইহাদের লইয়াই সমাজ। এখানে বিদ্যা, ভদ্রতা বা রসিকতা যদি কোথাও থাকে, তবে তাহা নির্ব্বাসন-দুঃখ ভোগ করিতেছে। বোল না ফুটিতেই যাহারা বাপান্ত করে, তাহাদের সম্মুখে কথা কহিবে কে? তাই সাহিত্য-রসিকও নীরব। রসিকের পক্ষ সমর্থন করিবার প্রয়োজন নাই জানি, আমিও পক্ষ সমর্থন করিতে বসি নাই—কারণ, রসবোধ বাদ-প্রতিবাদের বস্তু নয়, বেরসিকের বিরুদ্ধে রসিকের একমাত্র উপায় স্থান-ত্যাগ। কিন্তু বঙ্কিম-সম্বন্ধে কোনওরূপ আলোচনা প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে—সে আলোচনা এ যুগের রসিক-সমাজে নূতন করিয়া আরম্ভ করা প্রয়োজন মনে করিয়াছি। তাই মূর্খ ও বেরসিকের আক্রমণকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া আমি রসিকজনের সঙ্গেই কিঞ্চিৎ আলাপ করিব।

বঙ্কিমচন্দ্র যে বাংলা-সাহিত্যের কে, তাহা যাহাদিগকে তর্ক করিয়া বুঝাইতে

হয়, তাহাদের জন্য এ প্রসঙ্গের অবতারণা করি নাই। কিন্তু বিংশ-শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে একদল সাহিত্যিক (অধিকাংশই রবীন্দ্রশিষ্য!) রব তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা-সাহিত্যের যত বড় লেখকই হউন, তিনি যে উপন্যাসগুলি লিখিয়াছিলেন, তাহা উৎকৃষ্ট আর্টের দিক দিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। এ ধুয়া আরও উচ্চে উঠিল—আধুনিকতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্কিম-বিরোধী মনোভাবে। তাহারও পরে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির সম্বন্ধে মাঝে মাঝে যে সকল বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্তে, শৌখিন সাহিত্যিক-মজলিসে যে উঁচুদরের সাহিত্য-সমালোচনা হইয়া থাকে, এবং যাহা মৌলিক সমালোচনা-প্রবন্ধরূপে—বাংলা মাসিকে, অর্থাৎ হীনযান ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়ের সাহিত্য-রসিক পাঠক-গণের দরবারে প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রকে অপদস্থ না করিলে আধুনিক হওয়া যায় না। শরৎচন্দ্রের মনোভাব অতিশয় সহজবোধ্য, রবীন্দ্রনাথের ততটা নয়। শরৎচন্দ্র যে বিষয়ে যাহা বলেন, তাহা সমালোচনা নয় —সমালোচনা বলিয়া মনে করিলে তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা হয়। কারণ, কোনরূপ সবল মনোবৃত্তি বা বিচারশক্তি যদি তাঁহার সৃজনীশক্তির সহিত যুক্ত থাকিত, তবে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তেমনটি হইত না—শরৎচন্দ্র এত 'পপুলার' হইতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁহার আক্রোশ যদি না থাকিত, তবে বিস্মিত হইবার কারণ ঘটিত। বঙ্কিম-প্রতিভা ও শরৎ-প্রতিভা —পুরুষ ও নারী-চরিত্রের মত বিপরীত; অতএব ভাবের ক্ষেত্রে, বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রতি শরৎ-চিত্তের একটা আদিম বিতৃষ্ণা বা natural antipathy থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিমুখতা, বিশেষত এই শেষ বয়সে, একটু বিচিত্র বটে। কারণ, রবীন্দ্রনাথের কবি-ধর্ম্ম অতিশয় স্বতন্ত্র হইলেও, তাঁহার প্রতিভা খুবই আত্মসচেতন; এবং সেই জন্য অন্ধ আত্ম-সংস্কারকে—অতিশয় অবোধ instinct-কেই অবলম্বন করিয়া তিনি বঙ্কিমচন্দ্র অথবা অন্য কোনও ভিন্ন-ধর্ম্মা শক্তিমান সাহিত্যিকের কবিকীর্ত্তির মূল্য নিরূপণ করিবেন—তাঁহার সাহিত্য-সমালোচনার যে ভঙ্গির পরিচয় আমরা বহুপূর্ব্বে পাইয়াছিলাম, তাহাতে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, কবি-ব্যক্তিত্বের বহুত্বই তাঁহার যেমন কাম্য, তেমনই সমালোচনা বা যুক্তিচিন্তার ক্ষেত্রেও তিনি বহু-বচনের পক্ষপাতী। তা ছাড়া, সকল কালের সমবয়সী হওয়ার—বা সর্ব্বদা 'আপ-টু-ডেট' থাকিবার যে সাধনা, তাহাতে তিনি অতিমাত্রায় বিশ্বাসী, তিনি বৃদ্ধ হইবেন না—এবং স্থাবরতাই স্থবিরতার লক্ষণ—সেজন্য স্থাবরতাকে বর্জ্জন করিতে হইবে, এমন একটা সঙ্কল্প তাঁহার ইদানীন্তন সাহিত্যিক প্রয়াসগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। কাল-ধর্ম্মে বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাতিল হইতে বসিয়াছেন তখন অতিশয় সজাগ থাকিয়া সেই কালের অনুবর্ত্তন করিতে না পারিলে তিনিও বাতিল হইয়া যাইবেন—এ ভয় তাঁহার প্রবল; তাহার প্রমাণ অতি-আধুনিকদিগের সঙ্গে বারবার রফা করিবার চেষ্টায় নিত্যই পাওয়া যাইতেছে।

বঙ্কিমের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ—তাঁহার কল্পনার 'অ্যারিষ্টোক্রেসি'; তিনি নিম্ন-শ্রেণীর মানুষকে লইয়া উপন্যাস রচনা করেন নাই, অর্থাৎ রামা-শ্যামা বা রামী-বামী তাঁহার সহানুভূতি লাভ করে নাই—তিনি জীবনের বাস্তবতাকে স্বীকার করেন নাই। আর এক গুরুতর অভিযোগ এই যে, তিনি ধর্ম্ম ও নীতিকে তাঁহার রচিত চরিত্র ও ঘটনা-সৃষ্টিতে এতই প্রাধান্য দিয়াছেন যে, তাহাতে রসিকের রস-বোধকে পীড়িত, অপমানিত করা হইয়াছে। এত বড় জবরদস্ত নীতি-শিক্ষক ও গোঁড়া বর্ণাভিমানী ব্রাহ্মণ যে, সে কবি হয় কেমন করিয়া? তাঁহার উপন্যাসগুলির প্লট এক-একটা ছেলেভুলানো ফাঁকি—তাঁহার চরিত্রগুলা এমন ভাবে চলে যে, তাহাতে সাইকলজির সত্য নাই, জীবনের স্ফূর্ত্তি তাহাতে নাই। এই সকল উক্তির স্বপক্ষে যে যুক্তি দেওয়া হয়, তাহা আর কিছুই নয়—তাহাও এই উক্তিরই পুনরাবৃত্তি; অর্থাৎ যেহেতু তাহাতে নীতি ও ধর্ম্মের প্ররোচনা আছে এবং যেহেতু তাহার মধ্যে বাস্তবানুকৃতি নাই, অতএব সেগুলা আর্ট-সম্মত রসরচনা নহে।

এই সকল কথার অন্তরালে যে মনোবৃত্তি বা সাহিত্য-জ্ঞান আছে, আমাদের অতিশয় শিক্ষিতম্মন্য ব্যক্তিও তাহার উপরে উঠিতে পারেন না। রসবোধ বা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-জ্ঞান সকলের কাছে আশা করাই অসঙ্গত; কিন্তু প্রাকৃত রুচি ও অশিক্ষিত মনোবৃত্তি যদি শিক্ষিত সমাজেও প্রশ্রয় পায়, তবে সর্ব্ববিধ সাহিত্যিক আলোচনাই নিষ্ফল। আধুনিকত্বের ধ্বজাধারী নব্য রসিকসম্প্রদায় যে রুচি ও রসবোধকে সদম্ভে প্রচার করিতেছেন, তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়া লাভ নাই; কারণ যাহা নিতান্তই সাময়িক—এবং সেই হেতু বহুব্যাপ্ত, তাহাকে লইয়া বিচার চলে না। কিন্তু আধুনিককে ছাড়িয়া প্রাচীনতর ও সুপ্রতিষ্ঠিত যে সাহিত্যকীর্ত্তি, কালের নিকষে যাহার মূল্য একরূপ নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে; তিন চার পুরুষ ধরিয়া যাহার রস-সংবেদনা বহু-রসিক-চিত্তে গভীরভাবে সাড়া জাগাইয়াছে—আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আদি ও শ্রেষ্ঠ প্রতিভারূপে যাঁহার আসন আজিও সকল সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যজ্ঞানী বাঙালীর হৃদয়ে অটল হইয়া আছে, তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যসম্বন্ধে, এ কালের বড় হইতে ছোট সকলের মুখে এই যে সকল কথা নির্ব্বিবাদে প্রচারিত হইতেছে, ইহার কারণ অনেক হইতে পারে; কিন্তু যে একটা কারণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে শিক্ষিত বাঙালীর সম্বন্ধে লজ্জিত হইতে হয়। ব্যক্তিগত রুচি বা রসবোধ লইয়া বিবাদ করা চলে না—বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যে যে রস আছে, তাহা আধুনিক মনোধর্ম্ম বা জৈব-প্রবৃত্তির অনুকূল না হইতেও পারে—যেখানে ধর্ম্মগত বিরোধ আছে, সেখানে রসবিচার অবান্তর। কিন্তু এইরূপ মনোধর্ম্ম ও ব্যক্তিগত সংস্কার, বা বিশেষ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া যাহারা সাহিত্যের সার্ব্বভৌমিক আদর্শকে অস্বীকার করে, এবং সাহিত্য-সমালোচনা বা রসবিচারের মূল নীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়াও যুক্তিতর্কের আস্ফালন করে, তাহারাই যদি বাঙালী শিক্ষিত-সমাজের মুখপাত্ররূপে গণ্য হয়, তবে এ জাতির শিক্ষা-দীক্ষার পরিচয়

সত্যই লজ্জাজনক। দায়িত্বজ্ঞান কুত্রাপি নাই! য়ুরোপীয় সাহিত্যে আজ সমালোচনার যে নীতি ও পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—সমগ্র রস-শাস্ত্রকে যেভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে, যে পাণ্ডিত্য, প্রজ্ঞা ও রসবোধ, যে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, যে আস্তিক্যবুদ্ধি এবং বিচারনৈপুণ্য তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে—তাহাতে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতে হয়। আমাদের দেশে তাহার খবর অন্তত এই তথাকথিত সাহিত্যরথীরা রাখেন না। তাঁহারা সে সাহিত্যের ভাঁড়ামি ও চটকদার বুলি, দুষ্ট রসিকতা ও সুনিপুণ ফাজ্‌লামিকে গলাধঃকরণ ও বমন করিয়া, সস্তায় সাহিত্যিক এবং সমালোচক হইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। সেখানকার অতি-আধুনিকেরা শেক্সপীয়ারকে কবি বলেন না, এখানকার অতি-আধুনিকেরা তদ্দৃষ্টান্তে বঙ্কিমকেই তাঁহাদের আধুনিকত্বের পাদুকা বহন করাইতে চান।

রস সকল যুগেই এক—খাঁটি রসিকতারও একটা গূঢ় লক্ষণ আছে যাহা যুগাতীত। রসসৃষ্টি, জীবনকে বাদ দিয়া নয়,—বরং জীবনেরই গভীরতর পরিচয় ইহাতে থাকে বলিয়া, এবং সেই জীবন ব্যক্তি ও জাতি, যুগ ও যুগান্তরে বিচিত্র বলিয়া, রসের রূপসৃষ্টি, সকল যুগের সকল কবির কল্পনায় একই রূপ হয় না। সাহিত্যের ইতিহাস যাঁহারা লেখেন, বা সাহিত্যের সমালোচনা যাঁহারা করেন, তাঁহারা ইহার কারণ জানেন; যাঁহারা রসিকমাত্র—সাহিত্যজ্ঞানী নহেন—তাঁহারা কারণ না জানিয়াও রসসৃষ্টির সেই বৈচিত্র্য সাগ্রহে উপভোগ করেন এবং তাহাতে তাঁহাদের রুচি যেমন আরও মার্জ্জিত ও উদার হয়, তেমনই রসবস্তু সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রত্যভিজ্ঞা আরও দৃঢ় হইয়া উঠে। প্রাচীনকাল হইতে কাব্যের কত রূপ-বিবর্ত্তন হইয়াছে—গান, গীতিনাট্য, মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি—রস-সৃষ্টির কত রূপ উদ্ভূত হইয়াছে; ঐতিহাসিক তাহার যুগ-কারণ অথবা সেই সকল পরিবর্ত্তনের মূলে বৃহত্তর নিয়ম—জাতি ও সমাজের উপর নানা শক্তির ক্রিয়া, জাতীয় প্রকৃতি ও নানা ঘটনার সংঘাত প্রভৃতি—কত-কিছুর হিসাব লইবেন, কিন্তু খাঁটি রসের দিক দিয়া এ সকলের প্রয়োজন হয় না। যুগ, জাতি বা দেশ-হিসাবে যত ব্যবধান বা পার্থক্য থাকুক, বাল্মীকি-ব্যাস, হোমার-এস্কাইলাস, আরব্য উপন্যাস, কথাসরিৎসাগর, কালিদাস-শেক্সপীয়ার, দান্তে-ফেরদৌসী, চণ্ডীদাস-শেলী, স্কট-হিউগো, ডিকেন্স-বঙ্কিমচন্দ্র, হার্ডি-ডস্‌টয়েভ্‌স্‌কি—সকলেই রসস্রষ্টা; ভাবনা, কল্পনা বা উপাদান-উপকরণ যাঁহার যেমনই হউক, আকার যে ছাঁচেরই হউক, ইঁহারা যে কবি, ইঁহাদের কাব্য যে উৎকৃষ্ট রসের বিচিত্র রূপ-সৃষ্টি—রসিকমাত্রেই তাহা জানেন, আর কিছু জানিবার প্রয়োজন তাঁহার নাই। যদি কেহ তাহা অস্বীকার করে, তবে তাহার সহিত তর্ক চলে না—কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইঁহারা সেই সকল কবি, যাঁহাদের সম্বন্ধে তর্ক বা প্রমাণের কাল আর নাই, জগতের সাহিত্যে ইঁহাদের আসন কায়েম হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কবি কি না, এমন প্রশ্ন এই শতকের প্রারম্ভে একটা গুরুতর প্রশ্নই ছিল; আজ সে প্রশ্ন যেমন হাস্যকর, শতাব্দী পরেও তাহা তেমনই হাস্যকর হইবে; কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সম্মান আমরা যতই অল্প করিয়া থাকি, অথবা মতান্তরে,

যতই অতিরিক্ত করিয়া থাকি—রবীন্দ্রনাথ যে একজন খাঁটি কবি ও বড় কবি, এ বিষয়ে যুগান্তরেও কোনও সংশয় ঘটিবে না, এ কথা যে-কোনও রসিক ব্যক্তি জোর করিয়াই বলিতে পারিবেন। আরও একটা কথা এইখানে বলিব। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যখন সেকালের সাধারণ সাহিত্যরসিক অতিশয় সন্দিগ্ধ ছিলেন, তখনও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যথার্থ রসিক-সমাজের অগোচর ছিল না। সাধারণের রুচি বা রসবোধ মৌলিক প্রতিভার পক্ষে এমনই ব্যর্থ হইয়া থাকে; কিন্তু যথার্থ রসিক বা আসল 'ক্রিটিক' যিনি— তিনিও কবির মত দিব্যদৃষ্টির অধিকারী, তিনিও এক হিসাবে 'প্রফেট'। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মত কবি ফাঁকি দিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন না—এবং যে প্রতিষ্ঠা তাঁহারা লাভ করেন, তাহাকে পরবর্ত্তী কোনও যুগেই লোপ করিতে কেহ পারে না—শেক্সপীয়ার বা মিলটনকে তোমাদের ভাল লাগিতে না পারে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই; শেক্সপীয়ারের কবিগৌরব সম্যক উপলব্ধি করিতে তিনশত বৎসর লাগিয়াছিল, সম-সাময়িকগণ তাঁহাকে বিশেষ আমল দেন নাই—যুগমনোবৃত্তির সহিত রসিকতার সম্বন্ধ এমনই! সকল যুগেই বেরসিকের সংখ্যা বেশি; এ যুগে আরও বেশি এইজন্য যে, সেই সকল বেরসিকেরাই সস্তা ছাপাখানার দৌলতে বাচাল হইবার সুযোগ পাইয়াছে—এজন্য ঝিঁঝিপোকার সংখ্যা আজকাল এত বেশি বলিয়া মনে হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার প্রমাণ যুগ-মনোবৃত্তির যুক্তিতর্কের অতীত; বঙ্কিমচন্দ্রকে গালি দিয়া কিছু করিতে পারা দূরের কথা—বঙ্কিমপ্রতিভার মহত্ত্ব সম্বন্ধে যেটুকু ধারণা এ পর্য্যন্ত আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে, তাহাও অতিশয় সঙ্কীর্ণ ও অসম্পূর্ণ। সে প্রতিভা যে কত বড়, তাঁহার উপন্যাস-কাব্যে যে অসামান্য সৃষ্টিশক্তির পরিচয় আছে, তাহার বিচার-বিশ্লেষণ এখনও আরম্ভই হয় নাই। যদি উপযুক্ত সমালোচনা আরম্ভ হয়, তবে দেখা যাইবে যে, সে প্রতিভার—সে সৃষ্টির এত দিক আছে এবং তাহা এতই গভীর যে, যুগ হইতে যুগে সে সম্বন্ধে নূতন কথার শেষ হইবে না।

কিন্তু ইহা তো যুক্তির কথা হইল না। আধুনিক রসিকেরা যুক্তি চায়—যুক্তি না পাইলে একটি আধলা-পয়সাও দিবে না! তাহারা সেয়ানা হইয়াছে—যত সেয়ানা দল পাকাইয়া রাস্তার মোড়ে মোড়ে ক্যানেস্তারা বাজাইয়া 'সাধু সাবধান!' বলিয়া সাধুকে শাসাইতেছে!

এ চাৎকারের মধ্যে কথা কহিবে কে? শুনিবে কে? সাহিত্য-সমালোচনায় যাহারা যুক্তিতর্কের আস্ফালন করে ও প্রতিপক্ষ খাড়া করিয়া অব্যর্থ শরসন্ধানের দাবি করে, তাহাদের অন্তত একটুও সাহিত্য-জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সাহিত্যিক বিচারে যুক্তির দ্বারা রসের প্রমাণ হয় না, তথাপি তর্ক যদি করিতেই হয়, তবে সাহিত্যের সমালোচনারও একটা ব্যাকরণ, অভিধান আছে—ফৌজদারী মোকদ্দমায় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করিবার জন্য উকিলের যেরূপ বাকপটুতার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ চোখা-বুলির কসরত দেখাইতে পারিলেই এখানেও কেল্লা ফতে করা যায় না। লেখাপড়ার ধার ধারি না; সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্ব, রস-রহস্য, রূপ-বৈচিত্র্য বা

তাহার বিকার-বিবর্ত্তনের ঐতিহাসিক ধারা—এ সকলের কিছুরই জ্ঞান নাই; কেবল কতকগুলি প্রাকৃত-জন-বোধিনী 'অকাট্য' যুক্তির বলে সাহিত্যের চিরন্তন আদর্শ ও নীতিকে ধূলায় টানিয়া চীৎকার করিব—এ কেমন কথা? রসের কথা তোমাদের সঙ্গে নয়, কিন্তু যুক্তিতর্কই বা কি করিব?—বুঝিবার শক্তি, প্রবৃত্তি বা অবকাশ আছে?—কারণ, 'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙে হীরার ধার'!

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস—উপন্যাস নয়? উপন্যাস কি? বাস্তব-জীবনের নিখুঁত প্রতিকৃতি?—এ কথা কোন্ শাস্ত্রে বলে? উপন্যাস যদি তাহাই হয়, তবে বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যগুলিকে 'উপন্যাস' বলিও না—কেহ মাথার দিব্য দেয় নাই। মানুষেরই জীবন ও চরিত্র লইয়া এ যাবৎ পৃথিবীর সাহিত্যে মহাকাব্য, ট্র্যাজেডি, আখ্যান-আখ্যায়িকা, গল্প-উপন্যাস, নভেল প্রভৃতি নানাজাতীয় কাব্য-সৃষ্টি হইয়াছে—সকলেরই সার্থকতা রসসৃষ্টিতে। আরব্য উপন্যাসও উপন্যাস—আজও তাহা বিশ্ব-সাহিত্যের ক্লাসিক; ট্র্যাজেডিও উপন্যাস, কারণ তাহাও মানুষের কাহিনী লইয়া রচিত; গদ্য-রোমান্স ও আধুনিক নভেলও তাহাই;—সর্ব্বত্রই মানুষের চরিত্র, জগৎ ও জীবন কবিকল্পনার বিষয়ীভূত হইয়াছে—কেবল রসসৃষ্টির রূপ-ভেদ মাত্র। উৎকৃষ্ট রস-প্রেরণা বা কবির রসদৃষ্টি যাহা সৃষ্টি করে, তাহার কোন সংজ্ঞা নাই—সংজ্ঞা বা কোনও একটি বাঁধা-ধরা আকার-প্রকারের নিয়ম অনুসারে কবি-কল্পনা বাধ্য নয়। হোমার এককালে যাহাকে একরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন, শেক্সপীয়ার তাহাকেই আর এক রূপে, এবং আধুনিক কবি সেই বস্তুকে অন্যতর রূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। যুগ, জাতি বা ব্যক্তি-মানসের বৈচিত্র্যবশে সেই একই রস বিভিন্ন প্রেরণায় বিভিন্ন রূপ ধারণ করে—এই রূপ-বৈচিত্র্যে রসিক-চিত্ত আরও আশ্বস্ত ও চরিতার্থ হয়। প্রতিভা যেমন মৌলিক, তাহার প্রকাশভঙ্গিও সেইরূপ মৌলিক; এজন্য, কোনও উৎকৃষ্ট কাব্য—গদ্য বা পদ্য—কোনও সংজ্ঞার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বা চিহ্নিত হইতে পারে না। তুমি তোমার বুদ্ধি-বৃত্তির মূঢ়তাবশতঃ সকল বস্তুকেই একটা সাধারণ নামের মধ্যে না ধরিতে পারিলে তৃপ্তি পাও না, তাই কতকগুলোকে এক-জাতীয় মনে করিয়া একটা নাম, আর কতকগুলিকে আর এক-জাতীয় বলিয়া আর একটা নাম—ওইরূপ 'ক্লাসি-ফিকেশন' করিয়া থাক। শুধু তুমি কেন, কবিগণেরও ঐরূপ একটা সংস্কার তাঁহাদের বহিশ্চেতনায় থাকে—কিন্তু সৃষ্টি-প্রেরণার আবেশকালে সে সংস্কার লুপ্ত হয়। তাহার একটা উদাহরণ মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'। কবি পরম পাণ্ডিত্যসহকারে সর্ব্ববিধ আয়োজন করিয়া, উপাদান-উপকরণ সংগ্রহ করিয়া মহাকাব্য ফাঁদিলেন; কিন্তু দেখা গেল, তাহা সেই সংজ্ঞা-অনুযায়ী বস্তু হয় নাই; তাহা মহাকাব্য নয়, গীতিকাব্যও নয়—তাহা একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য মাত্র। তাহাই হয়,—এবং না হইলে বুঝিতে হইবে, সেই কবি-প্রেরণাই সত্য নহে। এইজন্য আধুনিক সমালোচকেরা কাব্য-সমালোচনায় এইরূপ মধ্যযুগীয় পদ্ধতি বর্জ্জন করিয়াছেন। যাহা নিয়তিকৃতনিয়মরহিত তাহার সম্বন্ধে কোনও বহির্গত আদর্শ বা সংজ্ঞা খাড়া করিলে, কাব্য-বিশেষের যে অনন্যসাধারণত্ব তাহার প্রধান রস-

প্রমাণ, তাহাকেই অগ্রাহ্য করিতে হয়। অতএব পূর্ব্ব হইতে একটা নাম খাড়া করিয়া, এবং সেই নামীয় বস্তুর লক্ষণ কি হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া কোনও খাঁটি রস-রচনাকে বিচার করিতে বসা—সমালোচনা-রীতির এই উন্নতির যুগে শুধুই বেরসিকতা নয়, মূর্খতাও বটে।

তোমার কথা কি? উপন্যাসের প্রতিষ্ঠাভূমি হইবে বাস্তব জীবন? কথাটার মধ্যে দুইটা মিথ্যা বা মূর্খতাসুলভ সংস্কারের প্রমাণ রহিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, রসসৃষ্টির কোনও বাঁধা-ধরা সংজ্ঞা-নির্দ্দিষ্ট রূপ নাই—উপন্যাস বলিয়া যদি কোনও রচনাকে নির্দ্দেশ করিতে হয়—সে তোমারই নিজের সুবিধার জন্য, তাহার জন্য কবি দায়ী নহেন। তারপর যদি 'উপন্যাস' শব্দটি ব্যবহারই করিতে হয়, তবে সর্ব্বকালের সকল রকমের উপন্যাস-কাব্য মনে করিয়া—ভাব ও রূপ, বিষয়-উপাদান ও আকার-ভঙ্গির যত বৈচিত্র্য আছে এবং আরও হওয়া সম্ভব, এবং সেই সঙ্গে কবির স্বতন্ত্র মৌলিক রস-দৃষ্টির বিশিষ্ট প্রয়োজন চিন্তা করিয়া—উপন্যাস-বিশেষের লক্ষণ নির্ণয় করিতে হইবে। ইংরেজীতে এই ধরণের গদ্য কথা-কাব্যের নানা অভিধা থাকিলেও একটি সাধারণ নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে—'ফিক্‌শন'। তাহার কারণ স্পষ্ট; সকলে এক জাতীয় না হইলেও তাহাদের মধ্যে একটা রূপ-সামান্য আছে। এইরূপ সংজ্ঞা-নির্ম্মাণও বিচার-সৌকর্য্যের জন্য; নতুবা, কবির সৃষ্টি প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র, তাহাদের কোনও জাতি নাই। আধুনিক সমালোচনা-বিজ্ঞান জাতি ধরিয়া কোনও রস-রচনার বিচার করে না—কেন করে না, তাহার একটু আভাস মাত্র এখানে দিলাম, সুধী রসিক-মাত্রেই বাকিটা বুঝিয়া লইবেন। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বলিতে আমরা একজন বিশিষ্ট কবি-ব্যক্তির বিশিষ্ট প্রেরণার বিশিষ্ট রূপের—বা ছাঁচের—সৃষ্টি বুঝিব; তাহাকে উপন্যাস বলিতে হয় বল, না বলিলেও কিছুমাত্র হানি নাই; বরং তাহাতে রস-প্রমাণের বাধা আরও অল্প ঘটিবে। বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি বঙ্কিমী গদ্যকাব্য—তাহার রূপ তাহারই, আর কাহারও সহিত তাহার সগোত্রতা থাকিতে পারে না; কারণ অন্যতর কবিও স্বতন্ত্র, তাঁহার সৃষ্টিও তদ্‌জাতীয়; তাহার সম-জাতি অন্য কোনও উপন্যাস পূর্ব্বে ছিল না, পরেও হইবে না; ইহাই রসবিচারের গোড়ার কথা।

বঙ্কিমের সেই সৃষ্টি যদি সার্থক রস-পরিণতি লাভ না করিয়া থাকে, তবে তাহা 'উপন্যাস' হয় নাই বলিয়া নহে—তাহারই নিজস্ব প্রেরণা বা ভাব-প্রকৃতিকে সে লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া। যাহারা উপন্যাস বলিতে অতি-আধুনিক কোনও আদর্শের দোহাই দেয়, এবং তাহারই মাপকাঠিতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে মাপিয়া তাহার রস-বিচ্যুতি প্রমাণ করিতে চায়, তাহারা শুধুই বেরসিক নহে, মূর্খও বটে। কারণ, রসবিচারের পদ্ধতি সম্বন্ধেই তাহারা অজ্ঞ। গোলাপ বাঁধাকপি হইল না, কাব্য ইতিহাস হইল না—বলিয়া যাহারা তর্ক উত্থাপন করে, তাহারা ফুলের বাগানে ফলের গাছ দেখিতে না পাইয়া, বা অর্কিড্‌-হাউসে লাল-নীল মাছের চৌবাচ্চা না দেখিয়া, নিরাশ হইয়া নিজেদের রুচি ও রসবোধের অভ্রান্ত

পরিচয় দেয় মাত্র। বঙ্কিমের উপন্যাস শরৎচন্দ্রের বা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নহে; অতি-আধুনিক সাইকলজি, সেক্সলজি, বায়োলজি বা সোসিয়োলজি-মূলক রস-প্রবন্ধও নহে। রসকে যাহারা কোনও যুগ-মনোবৃত্তির—কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের তত্ত্ব-বুদ্ধির—সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া তবে স্বীকার করিয়া লয়, তাহারা সাহিত্য, অর্থাৎ যাহা সর্ব্বকালের সর্ব্বমানবের রসপিপাসা মিটাইবার উপায়, তাহার চর্চ্চা না করিয়া দর্জ্জীর দোকান খুলিয়া নিত্য-নূতন পোষাকের ফ্যাসন সম্বন্ধে তাহাদের ফতোয়া জারি করিলে তবু একটা কাজ হয়—আধুনিকত্ব-বিলাসী বাবুদের মনোরঞ্জন করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে।

জানি, এ কথাটাও ছিদ্রহীন হইল না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস উপন্যাসই হউক বা আর যাহাই হউক, তাহার মধ্যে উপাদান-বৈষম্যহেতু রস-বিরোধ ঘটিয়াছে। অর্থাৎ, তিনি যেসব চরিত্র ও ঘটনার উপাদানে এই সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে বাস্তবের ভাণ আছে, অথচ তাহা বাস্তব-অনুকারী নহে। অভিযোগটা মারাত্মক বটে। বাস্তবের কথা বলিলে তো আর কথাটি কহিবার জো নাই! কথাটা কিন্তু এইরূপ দাঁড়ায়। আরব্য উপন্যাস বাস্তবের ভাণ করে না—তাহা নিছক কাহিনী মাত্র। কিন্তু এ ধরণের উপন্যাস (আবার সেই জাতিবাচক নাম!) যে পরিচিত-প্রত্যক্ষের দোহাই দেয়! অর্থাৎ, বাস্তব-জীবন বা মানুষের সত্যকার নিয়তি সম্বন্ধে গল্প করিতে বসিয়াও (তাহাকে লইয়া কাব্য-সৃষ্টির কালেও!)—কল্পনাকে বাস্তব তথ্যের কঠোর শাসন স্বীকার করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ যখন 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পে 'রতন' মেয়েটির কথা বলিয়াছেন, তখন তাঁহাকেও বাস্তবের শাসন মানিতে হইয়াছে—আমরা পথে ঘাটে সর্ব্বত্র রতনের মত গ্রাম্য-বালিকার মুখেও অতি সূক্ষ্ম ও গভীর কাব্য কল্পনাসুলভ হৃদয়টিকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; এবং পোষ্টমাষ্টারটির মত কলিকাতার ছেলেরই নয়—যে কোনও আপিসের যুবক-কেরাণির প্রাণে, মানব-ভাগ্যের দার্শনিক কাব্যিয়ানা এমনই ভাবে উৎসারিত হইতে দেখি। কাজেই 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পটি বাস্তবের প্রতিলিপি বলিয়াই এমন একটি সার্থক রসসৃষ্টি হইয়াছে! কিন্তু 'ভ্রমর'—সম্ভ্রান্ত ঘরের বধূ হইলেও অশিক্ষিত, এবং তাহার জীবন বৈচিত্র্যহীন; অর্থাৎ, সে না পড়িয়াছে লরেটোয় বা ডায়োসিসানে, না করিয়াছে ট্রামে-ট্যাক্সিতে প্রেম, না পড়িয়াছে সেক্সলজি—তাহার মত মেয়ের মধ্যে এতবড় ট্র্যাজেডির নায়িকা সম্ভব হইল কেমন করিয়া! আবার, বঙ্কিমচন্দ্র যে সব বীরপুরুষকে নায়ক করিয়াছেন—তাহারাও শেষে আর কিছু করিতে না পারিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যায়! ইহা কি জীবনের সত্য? সন্ন্যাসী হইব কোন্ দুঃখে? দেখ দেখি, আমি—আধুনিক সভ্য মানুষ—কেমন সসম্মানে কুলচুরী-সমাজে বাস করিতেছি! বিবাহ করি নাই—সে মূর্খতা আমার নাই। বিবাহ করিলেও স্ত্রী যদি অন্যপূর্ব্বা হইত, অথবা 'নিখিলেশে'র স্ত্রীর মত বন্ধুর সঙ্গে প্রকাশ্যেও প্রেম করিত, তাহাতে কষ্ট পাইবার মত ক্ষুদ্র অশিক্ষিত জীব আমি নহি। চরিত্রনীতির কোনও দুর্ব্বলতা নাই, তাই কোন সংশয় বা আধ্যাত্মিক সঙ্কট আমাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে

পারে না। তিন পয়সার চাকরি বা পাঁচ পয়সার ঘুষে আমি আত্মবিক্রয় করিয়া থাকি ; এক কাপ চায়ের জন্য ধনী বন্ধুর আড্ডায় মোসাহেবি করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করি না ; কিন্তু সেই আমি বিশ্বমানব ও বিশ্বসাহিত্যের অতি-উচ্চ আদর্শ কেমন উপলব্ধি করিতে পারি ! জীবন-রস-রসিকতার এই যে আধুনিক কৌশল, ইহা বঙ্কিমের সেকেলে কল্পনার অগোচর। তাই, এই অতি সরস বাস্তবতা উপেক্ষা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কি উপন্যাসই লিখিয়াছেন ! সন্ন্যাসী হইতে চায় ! কোন্ দুঃখে ? মানুষের দেহে বা প্রাণে জুতার আঘাত এমনই কি অসহ্য হইতে পারে যে, মানুষ খুন করিবে, বা সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে ? আর সন্ন্যাসী হওয়া ?—হিন্দুর ছেলে কোনও কারণে সন্ন্যাসী হইয়া যায়, ইহাও কি বাস্তব ? বঙ্কিম উপন্যাস লেখেন নাই—কারণ, বাস্তব-জীবনের কথা লইয়াই উপন্যাস, এমন গাঁজাখুরি গল্প সে নয়।

খুব সত্য কথা ! ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করাই বাতুলতা। এমন গভীর বাস্তব-রস-রসিকতার মুখে বঙ্কিমের উপন্যাস তো ঐরাবত হইলেও ভাসিয়া যাইবে। রসের তর্কে হার মানিলাম ; কিন্তু প্রশ্ন উঠিতেছে, বাস্তব জিনিষটা কি ? দার্শনিক তর্ক না তোলাই ভাল—সেখানে কোনও উত্তরই মিলিবে না। কারণ, বাস্তবের এই 'বস্তু' যে কি, তাহার স্বরূপ এ পর্য্যন্ত উদ্ঘাটিত হয় নাই ; সর্ব্ব-রহস্যের মূল রহস্য তাহাই, আজও তাহারই সন্ধানে কত নূতন তত্ত্বের উদ্ভাবনা হইতেছে। দর্শনের কাজ তাই আজিও ফুরায় নাই—কখনও ফুরাইবে না। ঋষির দিব্য-দৃষ্টি তাহাকে দেখিয়াছে বলিয়া দাবী করে, কিন্তু কাহাকেও তেমন করিয়া দেখাইতে পারে না—অথবা, দেখিবার সেই শক্তি কেবল ঋষিরই আছে। কবি এই বাস্তবেরই রসরূপ উপলব্ধি করিয়া তাহাই যে উপায়ে প্রকাশিত করেন, সেই উপায়গুলি বিবিধ কলা-কৌশল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেও বাস্তবের বস্তু-রূপ নয়—রস-রূপ, এবং সে রূপ এক নয়—বহু ; কাজেই তাহার কোনও নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা নাই, মানুষের মনোবৃত্তি তাহাকে ধরিতে পারে না—এমন কি, তাহার সেই বৈচিত্র্য বা বহুরূপই তাহার স্বরূপের একমাত্র আভাস। বস্তুর সেই তত্ত্ব—সেই 'burden of the mystery' কবিকল্পনায় যে-রূপে ধরা পড়ে, তাহাই কাব্য ; এবং এই কবিদৃষ্টি যে রচনায় নাই তাহা সাহিত্যিক সৃষ্টি-নামের অযোগ্য। অতএব, যেখানে রস-বিচারই মুখ্য অভিপ্রায়, সেখানে বাস্তব-অবাস্তবের প্রশ্নই অবান্তর। বরং বস্তুসকলের অন্তর্নিহিত এবং অপরোক্ষ-অনুভূতি-গোচর যে বাস্তবতা—রস-সৃষ্টিতে সেই বাস্তবতাই ফুটিয়া উঠে বলিয়াই রসিকচিত্ত গভীরভাবে আশ্বস্ত হয়। এই বাস্তবতা ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে যাচাই করিবার নয়। রসলোক বা কাব্যজগৎ এই ব্যবহারিক জীবনের একটা মানস-প্রতিচ্ছবি নয়, তাহার অবাস্তবতা-প্রমাণে এ জগতের সাক্ষ্য চলে না। কোনও গদ্য বা পদ্য-কাব্য এইরূপ বাস্তবতার গুণেই যেমন উৎকৃষ্ট সৃষ্টি নয়, তেমনই তাহার অভাবেই, উৎকৃষ্ট কাব্য নহে। জীবনকে যে-ভাবে ইচ্ছা দেখিবার স্বাধীনতা কবিমাত্রেরই আছে—তথাকথিত বাস্তবেরই অবাস্তব-রমণীয়তা সৃষ্টি করিবার অধিকার যেমন

তাঁহার আছে, তেমনই অবাস্তবকেও আমাদের রসচেতনার পরিধির মধ্যে আনিয়া এবং তাহার অনুগত করিয়া, বাস্তব-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিবার অধিকারও কবিরই আছে। সেই যাদুশক্তিকেই কবিপ্রতিভা বলে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, তত্ত্বের দিক দিয়া যেমন, তেমনই কাব্যরসের দিক দিয়াও বাস্তব বলিয়া কিছু নাই, কারণ, 'বাস্তব' একটা ব্যবহারিক প্রাকৃত সংস্কারমাত্র। বস্তুকে কেহ দেখে নাই; সেইজন্য কাব্য-সাহিত্যও বাস্তবতার দাবি করে না—বরং বস্তুর অন্তরালে যে পরম রহস্যময় সত্তা আছে তাহারই রূপ, নানা ইঙ্গিতে ও ভঙ্গিতে আমাদের রস-চেতনার গোচর করিতে চায়—জ্ঞানচেতনার নহে। এই-জন্যই প্রত্যেক রসসৃষ্টি মৌলিক ও স্বতন্ত্র, প্রত্যেকটির একটা নিজস্ব ভাব-সঙ্গতি আছে—সেই সঙ্গতিই তাহার বাস্তবতার প্রাণ। এই সঙ্গতি-রক্ষা যদি কোনও কাব্যে না হইয়া থাকে, তবে কবি-প্রেরণা সত্য ও সার্থক হয় নাই বুঝিতে হইবে। আধুনিক সাহিত্যে যে বাস্তবতার জয়-ঘোষণা হইয়া থাকে, তাহা রস-বস্তুর বাস্তবতা নয়—উপাদানের বাস্তবতা মাত্র। সেই বাস্তবতার বিরুদ্ধে রসিকের কোনও নালিশ নাই; কিন্তু সেই সকল রচনা যদি সার্থক রসসৃষ্টির দাবি করে, তবে সেই উপাদান-বস্তু সত্ত্বেও তাহাকে রস-পদবীতে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, বাস্তবতার দোহাই দিয়াই তাহা কাব্যপদবাচ্য হইবে না। অতএব কবি-কল্পনার আশ্রয় যাহাই হউক, সেই উপাদান-বৈচিত্র্য রসরূপের বৈচিত্র্য-বিধান করে—কেবল বাস্তবতার দাবিতেই কোনও রচনা উৎকৃষ্ট রসসৃষ্টি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। জীবনের এমন কোনও দিক নাই—এমন কোনও বিষয় নাই, যাহা কবি-কল্পনার অধিগম্য নহে। সকল কাব্য-সৃষ্টির মত উপন্যাসেও বাস্তব-অবাস্তব-ভেদ নাই—জীবন ও জগতের একটা, রসরূপ উদ্ভাবন করাই তাহার মূলীভূত প্রেরণা। বরং, যে-কাব্য বাস্তব ও অবাস্তবের প্রাকৃতসংস্কার লোপ করিয়া দেয়, পাঠক-চিত্তে বাস্তব বুদ্ধিকে দমন করিয়া, সকল বিরোধ বা দ্বন্দ্ব হইতে তাহাকে নিষ্কৃতি দেয়—সেই উপন্যাস কাব্যগুণে, অর্থাৎ রসসৃষ্টি-হিসাবে তত উৎকৃষ্ট। ঘোড়ার পিঠে দুইখানা পাখা বসাইয়া দিলে কিছুমাত্র দোষ হয় না—যদি সেই কাব্যে পক্ষবান ঘোড়াকে সত্যকার জীবন্ত ঘোড়া বলিয়া বিশ্বাস করিতে কোনও বাধা না পাই। এই যে "suspension of disbelief"—পাঠকের স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ—ইহাই কবির যাদু-শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমি যে জগৎ সৃষ্টি করিতেছি, তাহার বিধান আমারই বিধান; আমার কল্পনা বস্তুকে রূপান্তরিত করিয়া, সম্ভব-অসম্ভবের সকল প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া, তোমার প্রত্যক্ষ পরিচিত জগৎকেও উল্টাইয়া ধরিয়া—মূককে বাচাল করিয়া, পঙ্গুকে গিরি-লঙ্ঘন করাইয়া, বীরকে কাপুরুষ ও কাপুরুষকে বীর করিয়া, নদীকে সাগর করিয়া, বাঙালী পল্লীবধূর পায়ের মলের আঘাতে ঘোড়া ছুটাইয়া, কিংবা তাহার মুখরতায় শাহেন-শা বাদশাহকে পর্য্যন্ত পরাস্ত করাইয়া—যে-কাব্য নির্ম্মাণ করিবে তাহাই আরও সত্য, আরও বাস্তব। যদি তাহা না হয়, তবে, হয় তুমি রসাস্বাদনের অধিকারী নও, নয়—আমারই শক্তির অভাব

আছে; কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে তোমার এই বাস্তব-জগতের সাক্ষ্য নিতান্তই অপ্রযুক্ত ও হাস্যকর;—এমন কথা বলিবার অধিকার যে-কোনও কবিরই আছে।

আমি বলিয়াছি, যুক্তি-তর্কের যে বাস্তব—তাহা কাব্যসৃষ্টির বাস্তব নহে। কিন্তু তত্ত্বের দিক দিয়াও যুক্তি-তর্কের বাস্তব নির্ভরযোগ্য নয়। মানুষের জীবনই ধরা যাক্। সাধারণ মনুষ্য-জীবন বা ব্যক্তি-জীবন সম্বন্ধে আমাদের কোনও ধারণা সম্যক্ বা সম্পূর্ণ নয়। জীবনের সুখ ও দুঃখ, পাপ ও পুণ্য, ব্যর্থতা ও সফলতা—এ সকলের স্বরূপ-নির্ণয় বা স্থিরসিদ্ধান্ত আমাদের বুদ্ধির অতীত। সুখ-দুঃখের আপেক্ষিক মূল্য, অবস্থা ও চরিত্র-বিশেষে তাহার জমাখরচের হিসাব, কে কবে ঠিক করিয়া দিতে পারিয়াছে? পাপ ও পুণ্য দুই-ই তত্ত্বহিসাবে যাহাই হউক—তথ্য হিসাবে সত্য; কারণ পাপ ও পুণ্য-বোধ মানুষের চেতনায় সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে—সুস্থ ও সহজ মানুষের সংস্কারে তাহা দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু এই পাপ-পুণ্যের সার্ব্বজনীন কোনও নিরিখ নাই। মানুষের মনুষ্যত্ব বলিতে আমাদের যে একটা সাধারণ ধারণা আছে তাহাও বাস্তব নহে; কারণ, প্রত্যেক মানুষই অপর হইতে ভিন্ন, অতএব প্রতিপদে মনুষ্যত্বের সেই সংজ্ঞা কোনও না কোনও অসাধারণ লক্ষণের সম্মুখে মিথ্যা হইয়া পড়ে। ভাল করিয়া দেখিতে জানিলে, জীবন ও জগৎঘটিত কোনও-কিছুর বিষয়ে তুমি বাস্তবের একটা মাপকাঠি খুঁজিয়া পাইবে না। আবার প্রত্যেক মানুষেরই তাহার নিজস্ব প্রকৃতি, সংস্কার ও বোধশক্তির ফলে একটা স্বতন্ত্র জগৎ আছে। তাই রসিক ও ধ্যানী যাঁহারা, তাঁহারা এই কারণেই কখনও বস্তুর বাস্তবতার মোহ স্বীকার করেন না। কবির কাব্যে এই তথাকথিত বাস্তব—অজ্ঞানীর পক্ষে যাহা সত্য, এবং জ্ঞানীর চক্ষে যাহা আদি-অন্তহীন সংশয়সঙ্কুল একটা বিরাট ধাঁধা, এবং সেই কারণেই অর্থহীন, নীতি-হীন,—তাহাই কেবলমাত্র একটি রসরূপের ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনায় সকল সংশয়ের—সমাধান নয়—লোপ করিয়া, বাস্তব-মুক্তির আনন্দ দান করে। যাহারা সে আনন্দের অধিকারী বা প্রার্থী নহে, তাহারা তাহাকে বিশ্বাসই করে না—তাহারা ভিন্নজাতি, ভিন্নধর্ম্মী। বৈষ্ণবের বিরুদ্ধে শাক্তের, বৈদান্তিকের বিরুদ্ধে ঈশ-বাদীর, হিন্দুর বিরুদ্ধে খৃষ্টানের যে বিদ্বেষ—এ বিদ্বেষও ঠিক সেইরূপ। তর্ক-যুদ্ধের দ্বারা ইহার অবসান কখনও হইবে না।

বাস্তব-অবাস্তবের কথা বলিয়াছি, কাব্যের পক্ষে সেই ভেদবুদ্ধি কতখানি সত্য, তাহাও বলিয়াছি। তথাপি রচনাবিশেষে একরূপ অবাস্তবতার স্পষ্ট অনুভূতি জাগে। কিন্তু সে অবাস্তবতা-বোধের কারণ কাব্যবর্ণিত ঘটনা বা চরিত্রই নয়; যে কোনও ঘটনা বা চরিত্র—আমাদের প্রাকৃত সংস্কারে তাহা যতই অসম্ভব বলিয়া মনে হউক—কবির কল্পনাগুণে বাস্তবরূপে প্রতিভাসিত হইতে পারে। কিন্তু কবি যে জগৎ তাঁহার কাব্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই জগতের একটা গূঢ় নিয়ম-সঙ্গতি আছে—চরিত্র ও ঘটনা সেই সঙ্গতি-বিরুদ্ধ হইলেই রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটে, সেইজন্য কাব্য অস্বাভাবিক বা অবাস্তব বলিয়া মনে হয়। অতএব সে অবাস্তবতার প্রমাণ বা মানদণ্ড বাহিরের কোনও বস্তু-সত্য নহে। কবির

দৃষ্টি যদি দিব্যদৃষ্টি হয়, তবে কাব্যে সকল বিরুদ্ধ উপাদান একটি সমান রস-পরিণতি লাভ করে। অসম্ভব ও বালকোচিত কাহিনীও কবিকল্পনার বস্তুভেদী দৃষ্টির বলে একটি সুসমঞ্জস রসরূপ পরিগ্রহ করে। শেক্‌স্‌পীয়ারের 'লীয়ারে'র সমগ্র নাট্য-সৌধ এইরূপ ছেলেমানুষী কাহিনীর উপরেই নির্ম্মিত হইয়াছে; ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গেই তাঁহার নাটকে অতিপ্রাকৃত উপাদান গ্রথিত হইয়াছে। অত্যুচ্চ, অতি-গম্ভীর, এবং অতিরিক্ত কাব্য-প্রধান ট্র্যাজেডিগুলিতে অতিপরিচিত ও সাধারণ চরিত্র, এবং অতিশয় ঘরোয়া—এমন কি, ভাঁড়ামিপূর্ণ চিত্রও—সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার অনেক কমেডিতে ঘটনার অসম্ভব যোগাযোগ বা আকস্মিক রূপান্তর নির্ব্বিরোধে স্থান পাইয়াছে; এমনকি 'ক্যালিবানে'র মত অনাসৃষ্টিও অপূর্ব্ব সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবতার সাধারণ প্রাকৃত মাপকাঠি দিয়া বিচার করিলে এ সকল গাঁজাখুরির সমর্থন করিবে কে? তাই বলিয়া শেক্‌স্‌পীয়ার কি জগৎ ও জীবন—মানুষের চরিত্র বা হৃদয়রহস্যকে তাহার সমগ্র বাস্তবতায় মণ্ডিত করিতে পারেন নাই? এই বাস্তবতার প্রমাণ অন্যরূপ। মানুষের মধ্যে যে সহজ মনুষ্যত্ব আছে, তাহারই গভীরতর চেতনা রসিকের রসবোধের মধ্যে জাগ্রত হইয়া থাকে; জগতের যাহা-কিছু তাহার বাস্তব-স্বরূপ—তাহা এইরূপ গভীরতর চেতনার সহায়ে রসিকের হৃদয়গোচর হয়, সেখানে ফাঁকি চলে না। যাহা অবাস্তব, তাহা সেই চেতনার প্রবেশ-দুয়ারে বাধা পায়। কবির সৃষ্টি যেমন সমগ্র-দৃষ্টির ফল, তেমনই কাব্যরস আস্বাদনে রসিকেরও সেই সমগ্র-দৃষ্টি আবশ্যক। এই রসদৃষ্টি লাভ করিতে হইলে, অর্থাৎ যথার্থ রসিক হইতে হইলে, 'genuine being' হইতে হইবে। খণ্ড ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ সংস্কার বা কতকগুলা অসংলগ্ন চিন্তাপ্রসূত মতবাদের দর্পণে এই বাস্তব-রূপ প্রতিবিম্বিত হয় না। এইরূপ অবাস্তবতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের 'জাতীয় মহাকবি' মহানাট্যকার গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলিতে প্রায়শই দৃষ্টিগোচর হয়। মানব-জীবন বা চরিত্রের যে রূপ তাঁহার নাটকে চিত্রিত হইয়া থাকে, তাহাকে অতিচারী কল্পনার মহামহোৎসব বলা যাইতে পারে। 'প্রফুল্ল' নাটক বাঙালী রসিক-সমাজের বড়ই প্রিয়; কিন্তু এই নাটকের অভিনয় দেখিবার কালে যে মানুষের অন্তরতম মনুষ্যত্ব বিদ্রোহী না হয়, সে খাঁটি বাঙ্গালী হইতে পারে, কিন্তু খাঁটি মানুষ নয়। মানুষকে সু এবং কু-রূপে চিত্রিত করিতে গিয়া এই ভাবাতিরেকগ্রস্ত নাট্যকার যে আতিশয্যকে অভিনয়-সাফল্যের একমাত্র উপায় করিয়া, মানুষের মনুষ্যত্বকে যেভাবে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত করিয়াছেন তাহা বাংলা রঙ্গমঞ্চের আদর্শ নাট্যকলা বলিয়া অভিহিত হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ রচনাই কাব্যগত অবাস্তবতার চরম নিদর্শন। ইহাতে কল্পনার সত্য নাই; যে সত্য ঘটনাগত বাস্তবেরও বহু উর্দ্ধে, যে বাস্তবতার গভীরতম উপলব্ধির জন্য রসিকচিত্ত আকুল, এবং যাহার জন্য কবির নিকটে তাহারা কৃতজ্ঞ, সেই সত্য, সেই বাস্তবতা যে কি—এই সকল রচনায় তাহার একান্ত অভাবই সে সম্বন্ধে আমাদিগকে আরও সচেতন করিয়া তোলে।

নাটকই হউক, আর উপন্যাসই হউক, আর কাব্যই হউক—প্রাচীন হউক বা আধুনিক হউক, তথাকথিত realistic হউক বা romantic হউক—সাহিত্যের রসবিচারের পদ্ধতি সর্ব্বত্রই এক। কবির কল্পনা আপন প্রয়োজনে উপাদান সংগ্রহ করে, এবং নিজস্ব দৃষ্টি-অনুযায়ী রূপ-সৃষ্টি করে। এজন্য উপাদান যেমনই হউক, সেই রূপ বা form-ই কাব্যের সর্ব্বস্ব,—content তাহার সহিত অভিন্ন, একাকার হইয়া থাকে। উপাদানগুলিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া, পৃথকভাবে তাহার মূল্য যাচাই করিয়া, কোনও কাব্যের রসরূপ—যাহা সমগ্রতায় সমাহিত হইয়া থাকে—বিচার করা চলে না। বাংলা-সাহিত্যে সমালোচনার জন্ম আজিও হয় নাই, তাই যাহারা রসিক নয়, বিদ্বানও নয়—তাহাদের দায়িত্বহীন ও নির্লজ্জ আত্মঘোষণায় সমালোচনার ভবিষ্যৎও বিঘ্ন-সঙ্কুল হইয়া উঠিতেছে। আত্মঘোষণা বলিলাম এইজন্য যে, ইহারা সাহিত্যের ধার ধারে না—সাহিত্য-সমালোচনার অজুহাতে কতকগুলা দুঃসাহসিক উক্তি করিয়া পাঠক-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই, বিগত শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্য—যাহা বাঙালী-জাতির শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি, এবং সেই সাহিত্যের যিনি অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কবি-পুরুষ, তাঁহাকে লইয়া বপ্রক্রীড়া শুরু হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথই হউন আর শরৎচন্দ্রই হউন—পরবর্ত্তী যে কোনও প্রতিভাশালী লেখকই হউন—এ সাহিত্যের যে স্থানে বঙ্কিমচন্দ্র চির-দিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন, সেখান হইতে সকলকেই উচ্চকণ্ঠে এ কথা বলিবার অধিকার তাঁহারই আছে—“Not to know me is to argue yourselves unknown”

পৌষ ১৩৪৩

বঙ্কিম-প্রতিভার মহত্ত্ব-বিচার

পূর্ব্ব-মীমাংসা

১

একদা আমাকে একটি প্রশ্ন করা হইয়াছিল—য়ুরোপীয় সাহিত্যে ও তথাকার চিন্তাজগতে যে কয়জন মহামনস্বী, ব্যক্তিকে দিব্যপ্রতিভার অধিকারী বলিয়া উল্লেখ করা হয়, তাঁহাদের সহিত তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক বা অন্যবিধ প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব কিরূপ? তিনি কি তাঁহাদের সহিত একাসনে বসিবার যোগ্য? অবশ্য এরূপ প্রশ্ন-উত্থাপনের কারণ ছিল, আমি বঙ্কিমচন্দ্রকে আধুনিক ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষী-কবি, উৎকৃষ্ট প্রতিভার অধিকারী বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলাম—খাঁটি সংস্কৃত অর্থে, অর্থাৎ ভারতীয় শাস্ত্রে যে-জ্ঞানীকেও কবি বলা হইয়াছে—তিনি সেই অর্থেও মহাকবি ("কবয়ঃ ক্রান্তদর্শিনঃ"); বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান কালে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমাদের প্রগতিপন্থী সমাজের কেহই এইরূপ আখ্যা দিতে স্বীকৃত হইবেন না। তাঁহাদের মতে, বঙ্কিমচন্দ্র একটা বিগত যুগের তাৎকালিক ভাবনা—অতিশয় সংকীর্ণ এককাল-দর্শী বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন; তাঁহার জীবন-দর্শনও যেমন, তেমনি তাঁহার সাহিত্য-কীর্ত্তিও অতীতের জঞ্জালস্তূপে পরিণত হইয়াছে। এই মতের স্বপক্ষে যতকিছু বলিবার আছে তাহা আমার ভালরূপ জানা আছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও, যেহেতু এই বর্ত্তমান একদিন অতীত হইয়া যাইবে, তখন সেই অতীতের কোন্ কবি, কোন্ ঋষি, কোন্ মনীষী অমর, তাহা চির-বর্ত্তমান সেই অতীতের দরবারে স্থিরীকৃত হইবে, অতএব আমি আজিকার কল-কোলাহল সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া আমার চিন্তাকেও সেই কালের দরবারে পেশ করিতেছি, এবং বঙ্কিম-প্রতিভার মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমার সেই প্রত্যয়কে আর একবার সমগ্র-ভাবে ও সবিস্তারে উপস্থাপিত করিতেছি।

এই প্রশ্নটির উত্তরে প্রথমেই বলিতে হয়, য়ুরোপীয় জীবন ও চিন্তাধারা যেমন স্বতন্ত্র, তেমনই সেই সমাজের ইতিহাসও ভিন্নমুখী; কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম সর্ব্বত্র এক হইলেও, য়ুরোপ ও ভারত এই দুই দেশের অধিবাসীদের স্বভাব ও আধ্যাত্মিক চেতনা একরূপ নহে। সেখানে মানব-সমাজের বিকাশ-বিবর্ত্তন যে গতি-পথে ঘটিয়া থাকে, ভারতে তাহা অন্যরূপ। ইহার প্রধান কারণ এই যে, সেখানে প্রথম হইতেই প্রকৃতি প্রধান হইয়া আছে—প্রকৃতির সত্যই একমাত্র সত্য। সেই সত্য-আবিষ্কারের অভিযানে যুগে যুগে কবি-মনীষিগণ সেই একই প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়াছেন, এবং সেই পথে যে নব-নব তথ্য ও তত্ত্বের আবিষ্কার তাঁহারা করিয়াছেন, তাহাতে সত্য অপেক্ষা নবত্বই মূল্যবান। ঐ নিরন্তর গতিশীলা প্রকৃতির যে-তত্ত্ব তাহাকেই য়ুরোপ এককালে অন্ধভাবে, এবং একালে সজ্ঞানে বরণ করিয়াছে। ইহারই প্রেরণায়—ঐ প্রকৃতি-শক্তি-সাধনায় সেখানকার মানুষ রাষ্ট্রে ও সমাজে, সাহিত্যে ও শিল্পকলায়, দর্শনে ও বিজ্ঞানে—

তাহার ক্ষুধাকে যেমন অতৃপ্ত রাখিয়াছে, তেমনই জিজ্ঞাসাকে নিত্য-নব সংশয়ের মহিমায় মহিমান্বিত করিয়াছে; তাহার প্রতিভা সেই ক্ষুধাকে 'দুরত্যয়া মায়া'র অপূর্ব্ব রসচাতুর্য্যে কবিত্বময়, এবং সেই জিজ্ঞাসাকে অশেষ প্রশ্ন-কাতরতার দুশ্ছেদ্য জালে জটিল করিয়া, উভয়কেই এক প্রাণস্তম্ভনকারী অনর্থতা দান করিয়াছে। আজ সে তাহার সেই প্রবৃত্তিধর্ম্মী প্রকৃতিবাদের পূর্ণপ্রজ্জ্বলিত বহ্নিতে পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইয়া গত হাজার বৎসরের দুর্দ্ধর্ষ দেহাত্ম-সাধনা সাঙ্গ করিতেছে। এই সমাপ্তির একটা সুফল হয়তো আছে—ঐরূপ পরিণাম হইতেই একটা প্রকাণ্ড 'নেতি' জগজ্জনের অন্তরে দৃঢ় মুদ্রিত হইতে পারে, এবং তাহা হইতেই পরিশেষে একটা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা হইবে, কারণ জগতের কোন কিছুই নিরর্থক নহে।

এইবার য়ুরোপের সেই মনীষা ও প্রতিভার কথা। উপরে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, য়ুরোপীয় প্রতিভা ও মনীষার প্রধান লক্ষণ—তাহার কীর্ত্তির নবত্ব; সেখানে কবি, ভাবুক, চিন্তানায়ক প্রভৃতির শ্রেষ্ঠতা নির্ভর করে তাঁহাদের ভাব-কল্পনা বা চিন্তার মৌলিকতার উপরে—অতিশয় অপূর্ব্বদৃষ্ট কোন ভঙ্গি, সম্পূর্ণ নূতন কোন তত্ত্বঘোষণার উপরে। কোন সুনিশ্চিত সত্য, কোন নিঃসংশয় উপলব্ধি সেখানকার সাধনায় স্বীকৃত হইবে না—বুদ্ধি সেখানে সংশয়াত্মিকা, "বহুশাখাহ্যনন্তাশ্চ"; অতএব কিছুই চূড়ান্ত নয়; ভাবে, কল্পনায়, চিন্তার সম্পূর্ণ নূতন-কিছুর সন্ধান দিতে পারাই উৎকৃষ্ট মনীষা বা প্রতিভার পরিচায়ক; তাই যে কয়জন ক্ষণজন্মা পুরুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেইরূপ মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারিয়াছেন তাঁহারাই তথাকার শ্রেষ্ঠগণের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। এইরূপ মানদণ্ডের যেমন একটা সহজ যুক্তি আছে, তেমনই প্রতিভা হিসাবেও উহার একটা প্রত্যক্ষ গৌরব আছে। কারণ, যাহা পূর্ব্বে ছিল না, যে-তত্ত্ব, যে-ভাব, যে-দৃষ্টি ঐ ব্যক্তিরই উপলব্ধি তাহাই তো নূতন-সৃষ্টি—সেইরূপ সৃষ্টিশক্তিই প্রতিভার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সেই চির-অলব্ধ বা অলভ্য যাহা—যাহা চির-দূরায়মান, বৈদিক-কবির পুরা-কল্পিত সেই চির-অধরা ঊষা, তাহারই পশ্চাতে ধাবমান—পুরূরবা-রূপী সবিতা, অথবা কবি টেনিসন (Tennyson)-বর্ণিত Ulysses-এর মত, তথাকার কবি-মনীষিগণ এক অপূর্ব্ব প্রাণোন্মেষ (inspiration) অনুভব করেন; সেই পলায়মানা উর্ব্বশীর প্রয়াণ-পথ হইতে তাহার কণ্ঠচ্যুত মণিহারের যে মণিগুলি তাঁহারা কুড়াইয়া পান তাহারই দীপ্তিতে য়ুরোপীয় চিত্রশালার মণিগৃহ আলোকিত হইয়াছে। উর্ব্বশীকে ধরিতে না-ই বা পারা গেল, তাহার কণ্ঠহারের ঐ মণিগুলিই কি কম মূল্যবান! বরং সেই অধরাকে ধরিয়া ফেলিলে ঐ মায়াময় মণিহার মিলাইয়া যাইবে; "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ" তাহাকে লাভ করিলে চক্ষু হইতে কামনার অঞ্জন মুছিয়া যাইবে। প্রাপ্তি নয়—লাভ নয়, কেবল ঐ প্রবৃত্তিময় পৌরুষের প্রয়াস, উহার নিষ্ফলতাই পৌরুষকে আরও দৃপ্ত ও দুর্দ্দমনীয় করিয়া তোলে; উহাই জীবনের জীবন মহিমা,—য়ুরোপীয় কাব্য-সাহিত্যেও ঐ না-পাওয়ার হাহাকার একটি অপূর্ব্ব রসে সিঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব সেখানে প্রতিভার প্রবীণ লক্ষণ ঐ মৌলিকতা যে কোন্ অর্থে সত্য, এবং কি কারণে সম্ভব, বুঝিতে পারা যাইবে।

এইবার আমাদের সাহিত্যে, তথা ভাব-চিন্তার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বলিতে কি বুঝায়, এবং য়ুরোপীয় প্রতিভা ও মনীষার সহিত তুলনায় তাহার বিচার যে আদৌ অযুক্তিযুক্ত কেন, তাহাই বলিব। ঐরূপ বিচার আজিকার দিনে—য়ুরোপীয় সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই অতিরিক্ত প্রভাবের দিনে—খুব স্বাভাবিক বটে; কিন্তু উহার মূলে যে-সংস্কারের বশ্যতা আছে, যে-কারণে ঐরূপ প্রশ্ন মনে স্বতঃই উদিত হয়, তাহা সম্পূর্ণ অ-ভারতীয়। আমরা অনেকদিন য়ুরোপের শিষ্যত্ব করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই শিষ্যত্বের ফলে য়ুরোপকে আরও উত্তমরূপে জানিয়া, তাহার সেই বিষম-ধাতুর কষ্টিপাথরে আমাদের ধাতুটাকে ঘষিয়া তাহার মলিনতা দূর করাই আমাদের কর্ত্তব্য। ঐ অর্থে প্রতিভা কথাটি আমরা য়ুরোপীয় ভাষা হইতেই আহরণ করিয়াছি, ক্ষেত্রবিশেষে উহার প্রয়োগ বড় সুবিধাজনক হইয়াছে, ইহাও সত্য। কিন্তু প্রাকৃতিক তত্ত্ব, বিজ্ঞান ও কলাশিল্পের রূপকর্ম্ম-বিশেষে—আধুনিক কবিকর্ম্মের বিচারেও—ঐ শব্দটির অর্থমহিমা যেমনই হোক, আমাদের সাধনার ঐতিহ্য অনুসারে প্রতিভার ঐ লক্ষণ এতখানি মূল্য-বান নয়—কেন, তাহা পরে বলিতেছি। ঐ প্রতিভার সহিত যদি গভীরতর প্রজ্ঞা যুক্ত না হয়, প্রাকৃতিক তত্ত্বের উপরে একটা বৃহত্তর তত্ত্বের স্বাক্ষর না থাকে, তবে আমরা কবিদৃষ্টিকে পূর্ণদৃষ্টি বলিয়া স্বীকার করি না; অর্থাৎ সৃষ্টিটা নূতন হইলেই হইবে না তাহাতেও সেই ঋষির মন্ত্রদৃষ্টির সমর্থন থাকা চাই, কালের নৃত্য-বন্ধে মহাকালের মুক্তচ্ছন্দকেও চাই। যদি ঐ য়ুরোপীয় অর্থই বুঝি, তবে আধুনিক ভারতে, বিশেষ করিয়া, এই বাংলা দেশে—অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তির উদয় হইয়াছে; এবং য়ুরোপীয় প্রতিভার তুলনায় তাঁহাদের আসন যে অনেকেরই নিম্নে, তাহাও স্বীকার করি। তজ্জন্য দুঃখ করিব না, কারণ, ঐ মানদণ্ড আমাদের নয়, ঐ প্রতিভাও খাঁটি ভারতীয় প্রতিভা নয়। এইবার ভারতীয় অর্থে সেই প্রতিভা কি, তাহারই আলোচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান নির্ণয় করিব, এবং আরও দেখাইব যে, য়ুরোপীয় আদর্শে সেই প্রতিভার বিচার নিরর্থক। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা যে কারণে ভারতীয়, ঠিক সেই কারণেই তাহা অদ্বিতীয় ও অনন্যসাধারণ, কেন না, পাশ্চাত্ত্যের উপরেই তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—পাশ্চাত্ত্যকে অস্বীকার করিয়া নহে, তাহাকে স্বীকার করিয়া; এই সমন্বয় সাধনও ভারতীয় প্রতিভার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ।

ঐ সমন্বয়-সাধনের দক্ষতাই একটা অসাধারণ সৃষ্টিশক্তি—সেই শক্তি কেমন শক্তি? ভারত য়ুরোপের মত প্রকৃতিপন্থী নয়, কিন্তু তাই বলিয়া সে প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করে নাই, বরং এত অধিক গ্রাহ্য করে যে, তাহার স্বরূপ দেখিবার জন্য সে দুরূহতম যোগাসন করিয়া বসিয়াছে; আত্মসংস্কার-মুক্ত হইয়া—পুরুষ-চিত্তে প্রকৃতি যে সূক্ষ্ম অবিদ্যাজাল বিস্তার করিয়াছে তাহা ছিন্ন করিয়া, এবং প্রকৃতিরও মুখাবরণ ভেদ করিয়া, সে তাহাকে তদ্রূপে দেখিবার যে প্রয়াস করিয়াছে, এবং

তাহাতে যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে—জগতের আর কোন জাতি তাহা পারে নাই। সে ঐ প্রকৃতি-তত্ত্বকে সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়াছিল বলিয়াই, আজও প্রকৃতির নব-নব নৃত্যভঙ্গি তাহার সেই যোগাসন টলাইতে পারে নাই—বিজ্ঞানের যতকিছু ধমক-চমকে তাহার পরা-বিদ্যার সেই অমৃত-হাস্য কিছুমাত্র মলিন হয় নাই; সে যে মূলা-প্রকৃতিকে দর্শন করিয়াছে! এইরূপ সিদ্ধিলাভের কারণ—ভারত প্রথম হইতেই একটি সর্ব্বাশ্রয়ী অখণ্ড-সত্তাকে জানিবার, এবং তাহাকেই জীবনের সর্ব্বব্যাপারে প্রতিফলিত দেখিবার আবশ্যকতা বোধ করিয়াছিল; এমন আর কোন জাতি করে নাই। যাহা সকল দ্বন্দ্ব, সকল বিরোধ ও বিষমতাকে—ঐ দ্বন্দ্বের ছন্দেই লয়যুক্ত করে, এমন একটা-কিছু আছে, থাকিতেই হইবে—এই ঐকান্তিক অধ্যাত্ম-গভীর বিশ্বাসই তাহার ঐ সাধনা ও সিদ্ধিলাভের হেতু। সে ঐ প্রকৃতিকেই সর্ব্বাগ্রে জানিয়াছে—প্রকৃতির প্রকৃতি (Natura Naturans) বা মূলা-প্রকৃতিকে। ঐ যে সৃষ্টিধারা—চিরচঞ্চল, তরঙ্গভঙ্গকুটিল কালস্রোত—যাহাতে ফেনমালার মত নব-নব রূপ বা মূর্ত্তির বিবর্ত্তন-বিলাস হইতেছে—উহাই সাক্ষাৎ প্রকৃতি; উহার অর্থ বা অভিপ্রায় উহার নিজেরও অজ্ঞাত; এ সকল কথা ভারতের যোগীঋষিগণ বহুপূর্ব্বে জানিয়াছিলেন। এই প্রকৃতিকে পাশ্চাত্ত্য সমাজের মানুষ বিমূঢ়ভাবে নিরীক্ষণ করিয়াছে, এবং উহাকেই পুরুষার্থ সমর্পণ করিয়া, সকল চিন্তা, ভাব ও জ্ঞানকে—উহার ঐ উদ্দেশ্যহীন অনাদ্যন্ত গতিধারার ছন্দে, নিত্য-নব চমৎকারের দুর্জ্ঞেয়তায় আচ্ছন্ন করিয়াছে; ঐ প্রকৃতির প্ররোচনায়, তাহারই বশে, আত্মার শান্তি বা সান্ত্বনা নয়—আত্মঘাতী অভিমানে একদিকে যেমন দম্ভ, অপর দিকে তেমনই নৈরাশ্যে আত্মহারা হইয়াছে; সেই নৈরাশ্য—অপ-জ্ঞানের অতি-বিস্তারের সেই নিষ্ফলতাই তাহাকে নাস্তিক্যবাদের ঔদ্ধত্য দান করিয়াছে। যে সন্ধানের শেষ নাই—কারণ মূলে কোন ধ্রুবের প্রতি বিশ্বাস নাই,—সেই সন্ধানের একমাত্র গৌরব আবিষ্কারের বহুত্ব বা বৈচিত্র্য; আর কিছুই নয়, কেবল নূতন হইলেই হইল; সেই নূতনের যে মৌলিকতা তাহাই প্রতিভার প্রমাণ। নিছক শিল্পকলার দিক দিয়া এই বৈচিত্র্যের বা নানারূপত্বের যে একটা রস-গৌরব আছে তাহা আমরা জানি; য়ুরোপীয় সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্র-কলা তাহার সাক্ষ্য দিতেছে, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু প্রকৃতি বলিতে ঐ যে কালস্রোতের তরঙ্গশীর্ষে মূর্ত্তিমালার ফেনরাশি, উহারই উদয়-বিলয়ের ছন্দকে যাহারা সকল সাধনার মূলমন্ত্র করিয়াছে তাহারা উহার বিপরীত আর একটা সত্তা—গতি নয়, স্থিতি—রঙ্গীন বা রূপময় নয়, শুভ্র-নিরঞ্জন—অর্থাৎ, প্রকৃতির প্রতিযোগী আর একটা সত্তাকে—সেই পুরুষকে—পৃথকভাবে উপলব্ধি করে নাই; সেই পুরুষকে বা আত্মাকে গণনার বহির্ভূত করিয়াছে; অথবা তাহার স্বাতন্ত্র্য চিন্তা না করিয়া তাহাকেও প্রকৃতির অধীন করিয়া রাখিয়াছে। ঐ পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন হইলেও, তিনিই প্রকৃতির সহিত নিত্যসংযুক্ত থাকিয়া সৃষ্টিকে প্রকাশমান এবং আশ্রয়বান করিয়াছেন—এই তত্ত্ব তাহাদের অনধিগম্য হইয়া আছে, তাই তাহাদের জগৎ কেবল টলিতেছে, পড়িতেছে, ভাঙ্গিতেছে; তাহাদের

ইতিহাস কেবল অগ্রগতির একটা রেখা-লিপিমাত্র,—তাহাতে পুরাতন ও অধুনাতন আছে; প্রত্যেক অধুনাতন পুরাতনের একটা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম; সেই পরিণামের পরিণতির শেষ নাই, অতএব তাহার কোন অর্থ নাই,—নিত্য-সংশয়ের জিজ্ঞাসা আছে, উত্তর নাই; উহার মূলে কেবল একটা জড়-নিয়ম মাত্র আছে—তাহার নাম কার্য্য-কারণ-বিধি। সেইরূপ জ্ঞান যে পূর্ণজ্ঞান নয়, তাহা যে একদেশদর্শী, তাহার প্রমাণ—উহাতে, প্রকৃতি-পরবশ পুরুষের কেবল বুদ্ধি-ভ্রংশই হয়—আত্মার শান্তি, সান্ত্বনা বা আনন্দলাভ হয় না; যে "শান্তং জ্ঞানং অনন্তং" তাহার মগ্ন-চৈতন্যে অতি গূঢ়-গভীর পিপাসার বস্তু হইয়া বিরাজ করিতেছে—প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও তাহার সঙ্গলিপ্সা যতই বাড়ে ততই অন্তরের অন্তরে সেই নিরুদ্ধ পিপাসার অস্বস্তিই মানুষকে যেন উন্মাদ করিয়া তোলে, সে আরও বিদ্রোহী ও নাস্তিক হইয়া উঠে। সেই পিপাসার তৃপ্তি উহাতে নাই।

তাই ভারতের মনীষা উহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। সে ঐ নিত্য নবকে —ঐ কালগত পরিণাম বা পরিবর্ত্তনের ধারাকেও যেমন মানিয়াছে, তেমনি তাহার অন্তরালে একটা ধ্রুব-স্থির শাশ্বতকেও মানিতে বাধ্য হইয়াছে; কারণ, পরিবর্ত্তন একটা কিছুর পরিবর্ত্তন বটে; তাহার মূলে অবিনাশী কিছু যদি না থাকে, তবে উহা পরিবর্ত্তন নয়—একটা নিছক মায়া বা শূন্যবস্তুর ক্ষণিক অস্তিত্ব-বিলাস। মানুষের নিগূঢ় আত্মসংবিৎ তাহাতে আশ্বস্ত হইতে পারে না—সেই আত্মার ধর্ম্মই একটা স্থির-কিছুকে আশ্রয় করা; তাহাই সৎ, তাহাই সত্য; যদি তেমন কিছু না থাকে তবে আমিও নাই। এই মহাতত্ত্বটি ভারতীয় সাধনায় বহুপূর্ব্বে ধরা পড়িয়াছিল। প্রকৃতিও যেমন আছে, আমিও তেমনই আছি। আমি বলিয়া একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যে আছে—আমিও যে আছি—অর্থাৎ আমার আমিটা যে প্রকৃতির ঐ তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ, তাহার প্রমাণ, ঐ প্রকৃতির আচরণ আমাকে আঘাত করে, ত্রস্ত করে, সংশয়ান্বিত করে; অতএব আমার চৈতন্য ও প্রকৃতি-ধর্ম্ম পরস্পর বিরোধী। এই ভারতেই ঐ প্রকৃতির বিরুদ্ধে একটা বিরাট বিদ্রোহ বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছিল, শেষে প্রকৃতির দোর্দ্দণ্ড শাসন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভগবান বুদ্ধ এক নূতন তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ প্রকৃতিকে নস্যাৎ করিবার জন্য, তাহার সম্মুখে সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান আত্মাটাকেও তিনি 'নাস্তি' বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল, আত্মা মরে নাই—বরং তাহার আকুতি আরও বাড়িয়াছে। অতএব সৃষ্টিকে যদি সম্পূর্ণ বুঝিয়া লইতে হয়, অর্থাৎ উহাকে আমার সকল সংশয় হইতে মুক্ত করিয়া, আমার চৈতন্যের সহিত উহার অ-বিরোধ স্থাপন করিতে হয়, তাহা হইলে আমাকে এবং ঐ প্রকৃতিকে একটা বৃহত্তর সত্তার অনুগত হইতে হইবে; যদি না হয়, তবে কোনটাই সত্য নয়। কিন্তু সত্য না হইয়াও যে নিস্তার নাই—আমার আত্মার ঐ অতৃপ্তি ও অশান্তিই তাহার প্রমাণ। ঐ সত্য আমারই সত্য বটে, তবু প্রকৃতি সেই সত্যের বহির্ভূত নয়। ভারত 'আত্মা' ও 'প্রকৃতির' এই

দ্বৈতকে স্বীকার করিয়াই পরে উভয়কে সেই 'এক'-এর তত্ত্বে সমন্বিত করিয়াছে, এই সমন্বয়-সাধনই ভারতীয় প্রতিভা ও মনীষার শ্রেষ্ঠ গৌরব। ঐ সমন্বয় যে একটা তত্ত্বমাত্র নয়, তাহার প্রমাণ—জগৎ ও জীবনের সর্ব্বত্র সকল ব্যাপারেই ঐ সমন্বয়ের প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহত্তর ক্ষেত্রে যেমন ঐ যুগ ও সনাতনের সমন্বয়, তেমনই সমাজেও স্বার্থ ও পরার্থের, অর্থাৎ ব্যক্তি-জীবনের সহিত বহু-জীবনের সমন্বয়; আবার ব্যক্তির মধ্যেও ঐরূপ সমন্বয় না ঘটিলে জীবনের পূর্ণতা-সাধন হয় না; সেখানে দেহের সহিত আত্মার—প্রবৃত্তির সহিত ধীরবুদ্ধির—হৃদয়ের সহিত মস্তিষ্কের সমন্বয় না হইলে পূর্ণ-মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না।

এই সমন্বয়-সাধনেরও দুই পন্থা আছে; একটিতে ঐ দ্বৈতকে স্বীকার করিয়া, তাহা হইতেই অদ্বৈতে আরোহণ; তাহাতে সৃষ্টির ঐ দৃশ্যমান প্রবহমান ধারাকেও সত্য বলিয়া গণ্য করিতে হয়; ইহাই তন্ত্রের পন্থা। অপরটিতে অদ্বৈতে আরোহণ করার পর দ্বৈতকে বুঝিয়া লইতে হয়; ইহাই বেদান্তের পন্থা। এই দ্বিতীয় পন্থায়, অধিকার-বিশেষে যদি দ্বৈতের সংস্কার একেবারে দূর না হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির যাহা কিছু ক্রিয়া সকলই পুরুষের স্বভাবে হইয়া থাকে ("স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে") এবং সেইরূপ ক্রিয়া সত্ত্বেও পুরুষ নির্লিপ্ত, এইরূপ ধারণাই করিতে হয়। গীতায় এইরূপ প্রকৃতিবাদের সমর্থন আছে। কিন্তু এ সকল উচ্চাধিকারের কথা, আমাদের তাহাতে প্রয়োজন নাই। আমরা ইহাই দেখিব যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতীত হইলে, অদ্বৈতের যে অর্থই হোক, ভারতীয় চিন্তায় প্রকৃতি কোথাও অবজ্ঞাত হয় নাই, বরং তাহাকেই অর্থসমন্বিত করিয়া একটা অখণ্ড সত্তার, অর্থাৎ পূর্ণ-সত্যের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ঐ সত্য এমনই যে তাহার উপলব্ধি ঘটিলে, কিছুকেই 'না' বলিবার আবশ্যক হয় না।

২

আমি বলিয়াছি সকল দ্বন্দ্বের সমন্বয় হয় যাহাতে তাহাই সত্য; ইহাও বলিয়াছি, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে—প্রকৃতির প্রতিবাদী একটা পুরুষ-এর অস্তিত্ব না থাকিলে—ঐ প্রকৃতি একটা দৃশ্যবস্তু বলিয়া দ্রষ্টার অভাবে তাহারও অস্তিত্ব থাকে না। বলা বাহুল্য, আমি এখানে সূক্ষ্ম দার্শনিক তর্ক তুলিতেছি না, যেটুকু প্রয়োজন মাত্র তাহারই একটা সহজ ব্যাখ্যা করিতেছি। স্থূল কথা—প্রকৃতি অস্থির, পুরুষ বা আত্মা-নামক যে সত্তা তাহা উহার বিপরীত, অতএব স্থির—এই তত্ত্বটুকুই উপস্থিত যথেষ্ট; তাহাই স্পষ্ট করিবার জন্য আমি এতক্ষণ আমার এই আলোচনাকে একটু দূরে টানিয়া লইয়া গিয়াছি, আশা করি, এই প্রসঙ্গে তাহা অবান্তর হয় নাই। প্রকৃতি কালে কালে বিবর্ত্তিত হইতেছে, ঐ আত্মা কিন্তু অপরিণামী; উহা বিবর্ত্তনহীন, অথচ সৃষ্টিতে উহা যুক্ত হইয়া আছে, না থাকিলে এই সৃষ্টি অসৎ বা মিথ্যা হইয়া যায়। অতএব ঐ স্থিরের সহিত অস্থিরের বিরোধ নাই—নিশ্চয় কোন এক সূত্রে কোথাও একটা মিল আছে। কেমন করিয়া তাহা সম্ভব? ভারত তাহার সেই অদ্বৈত দৃষ্টির দ্বারা

দেখিয়াছে—কালের ঐ গতি-ধারা সরলরেখার ধারা নয় ; ঐ গতি অন্তহীন, উহা স্বাধীনও বটে, তৎসত্ত্বেও উহা নিরুদ্দেশ বা উন্মার্গগামী নহে—উহা চক্রাকার। সেই ঘূর্ণনের কেন্দ্রে একটি স্থির-বিন্দু আছে, সেই স্থির-বিন্দু উহার ঐ গতিকে যথা-ইচ্ছা বিস্তার ও সংকোচের স্বাধীনতা দিয়াও তাহাকে সর্ব্বদা একটা ধ্রুবের—ঐ মধ্যবিন্দুর অভিমুখী করিয়া রাখিয়াছে। এমন করিয়া গতি ও স্থিতির, ধ্রুব ও অধ্রুবের, প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে সন্ধি হইয়াছে—বিরোধ সত্ত্বেও সমন্বয় ঘটিয়াছে।

আমি ঐ যে বিন্দু ও চক্রগতির কথা বলিয়াছি, উহাই ভারতীয় গতিবাদের একটা রূপক বটে, কিন্তু এখানে ঐ রূপকটিকে আমি অপর একটি তত্ত্বের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে গ্রহণ করিতেছি, আমি উহাকেই যুগ ও সনাতনের দ্বন্দ্ব ও সেই দ্বন্দ্বের সমন্বয়বিচারে প্রামাণ্যরূপে ব্যবহার করিব, সেইজন্য উহার প্রয়োজন ছিল। ঐ যে কালচক্রের কেন্দ্রবিন্দু—গতির অন্তর্নিহিত ঐ যে স্থিতির তত্ত্ব, উহাকেই ভারত আর এক প্রসঙ্গে 'সনাতন' নাম দিয়াছে, অপরটিকে 'তদানীন্তন' বলা যাইতে পারে। একটা যেন সমুদ্রের স্থির তলদেশ, আর একটা তাহার উপরিস্থ তরঙ্গমালা। একের নৃত্যছন্দে অপরটির লয় যুক্ত হইয়া আছে ; তালে-লয়ে এই যে সামঞ্জস্য ইহাই ঐ কাল-তরঙ্গের ছন্দ রক্ষা করে, নহিলে সৃষ্টির কোন সার্থকতা হয় না ; ধারাটিকে ঐভাবে ধরিতে ও রক্ষা করিতে পারিলে মানব-সমাজের সাধনা অব্যাহত থাকে, নিত্যনূতন তালভঙ্গ বা বিপ্লবের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। ক্ষুদ্র পরিধি বা স্বল্প পরিসরে তাহাই হইয়া থাকে—মানব-সমাজের অজ্ঞানই তাহার কারণ ; কিন্তু বিপুল বিরাটের যে গতিচ্ছন্দ তাহাতে কখনও তালভঙ্গ হয় না, হইলে ব্রহ্মাণ্ডই লয় হইয়া যাইত। আমরা এই ক্ষুদ্র জীব-জগতের সংবাদই রাখি ; এই পৃথিবী ও তাহার প্রত্যক্ষ পরিবেশে সৃষ্টির যে লীলা চলিতেছে, তাহাতেও ঐ বিরাট বিশ্ববিধানের সেই এক নিয়মকে জ্ঞানগোচর করিবার দিব্যদৃষ্টি একমাত্র এই ভারতই লাভ করিয়াছিল। অন্যত্র সৃষ্টির অনিয়ত গতি-ধারাই যুগ ও যুগান্তের সঞ্চয়-অপচয় ছড়াইয়া গিয়াছে, মানুষ তাহারই শাসনে আত্মসমর্পণ করিয়াছে ; প্রত্যেক যুগ তাহার পূর্ব্ব-যুগের মত মিথ্যা হইয়া গিয়াছে ; নূতন সম্পূর্ণ নূতন, পুরাতনের সহিত একটা কালানুক্রমিকতার সম্পর্কমাত্র আছে—বিকাশের লক্ষণ আছে, কিন্তু প্রকাশ কোথাও নাই। পশ্চাৎ কেবল সম্মুখে ঠেলিয়া দেয়, এবং সম্মুখও ক্রমাগত একটা অনির্দ্দেশের অভিমুখে ধাবমান হইতেছে। তাহার কারণ সেই এক ; সেই অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুবই যে ক্রমাগত প্রত্যেক যুগে একটা কালোচিত রূপ ধারণ করে—সেই বহু ও বৈচিত্র্যের মধ্যে একের মহিমাই যে আরও নিঃসংশয়রূপে প্রতিভাত হইতেছে—এ ধারণা যাহাদের নাই, তাহারা, যে-নূতন পুরাতন হইয়া গিয়াছে তাহাকে যেমন অবজ্ঞা করে, তেমনই যে-নূতন পুরাতন হইয়া যাইবে, তাহাকেও ("modern, modern" শব্দে) অসীম ভক্তি-ভরে বরণ করিয়া লয়। এমন চিন্তা, এমন বিশ্বাস তাহারা করে না যে, পুরাতনও যেমন সত্য, নূতনও তেমনই ; প্রত্যেক যুগ সেই এক সত্যকেই আপনার মত করিয়া রূপ দেয় বা দিবে ; কোন নূতনের সঙ্গে সেই সত্যের বিরোধ ঘটিতে পারে না,

ঘটিলে বুঝিতে হইবে তাহা সত্য নয়—অসত্য, তাহাই অকল্যাণকর। যুগের সহিত তাহার এই সঙ্গতি আছে বলিয়াই তাহাকে সনাতন নাম দেওয়া হইয়াছে। 'সনাতন' বলিতে যদি এমন কিছু বুঝায় যাহা 'যুগের' একান্ত বিরোধী, অর্থাৎ সনাতনকে মানিলে যুগকে অস্বীকার করিতে হয়, কিংবা যুগকে মানিলে সনাতনের অমর্য্যাদা হয়, তবে সেই সনাতন সর্ব্বাশ্রয়ী নয়। কারণ, সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যেও যাহা অপরিবর্ত্তনীয় তাহাই সনাতন। এইজন্য নূতন নূতন হইয়াও চির-পুরাতন, তাহার মধ্যে সেই চির-পুরাতনকে দেখিতে পারাই মনীষার দিব্যদৃষ্টি, তাহাই ঋষিত্ব। ইহাকেই আমি সমন্বয়-তত্ত্ব বলিয়াছি, এই দৃষ্টি একান্তভাবে ভারতের, যদিও ভারতের বাহিরেও এমন দৃষ্টির কচিৎ আভাস পাওয়া যায়; তাহা স্থিরদৃষ্টি না হইলেও চকিতদৃষ্টি বটে; কারণ, এমন সকল উক্তিও পাশ্চাত্ত্য কবি-মনীষীর মুখে কদাচিৎ শোনা গিয়াছে, যথা—

"I come not to destory-but to fulfil"

ইহার নিগূঢ় অর্থ—"আমি নূতন কিছুই বলিতেছি না, কেবল নূতন যুগের ভাষায় সেই পুরাতন ও চিরন্তনকেই ঘোষণা করিতেছি।" আধুনিক কালের এক ইংরাজ কবির যে উক্তিটি আপ্তবাক্যের মতই দীপ্তিমান হইয়াছে, সেই—

"Old order changeth yielding place to new,
God fulfils Himself in many ways."

—ইহাও আমাদের সেই তত্ত্বেরই আশ্চর্য্য প্রতিধ্বনি! ঐ যে 'Old order changeth'-'পুরাতন ধারার পরিবর্ত্তন'—উহাই সেই যুগান্তর; এবং ঐ যে "God fulfils Himself" ইত্যাদি, উহার অর্থ—"বহু ও বিচিত্রের মধ্য দিয়া সেই এক 'অচলং ধ্রুবং' তাঁহার সেই এক অভিপ্রায় পূর্ণ করিতেছেন।" উহাই সেই 'সনাতন'। কিন্তু এই সক উক্তির অন্তর্নিহিত যে তত্ত্ব তাহা আর কোথাও কোন জাতির সাধনার বস্তু হয় নাই, আর কোথাও মানুষ ইহাকে এমন অসংশয়ে উপলব্ধি করিয়া—সৃষ্টির ঐ অনিয়ত গতিধারাকে নিয়মাধীনরূপে দেখিয়া, জীবনকে তথা সংসারকে এমন সার্থক করিবার প্রয়াস পায় নাই। সৃষ্টির সেই গতিকে নিরুদ্দেশমুখী হইতে না দিয়া, ভারত তাহাকে ঐ কেন্দ্রবিন্দুর আকর্ষণে চক্রাকারে বাঁধিয়াছে, এবং 'চক্র' ও 'পদ্ম'ই তাহার ধর্ম্মের প্রতীক হইয়াছে। সে জানে ঐ বৃত্তের পরিধি কালবশে যতই বিস্তৃত বা সঙ্কুচিত হউক, তাহাতে যায় আসে না, ঐ বিন্দুটি স্থির থাকিলেই হইল; তাই সে কোন যুগের কোন মূর্ত্তিকেই ভয় করে না,— সনাতনের সহিত তাহার সঙ্গতিকে সে বিশ্বাস করে, ঐ সঙ্গতি-সাধনই তাহার তপস্যা, তাহার প্রতিভার সৃষ্টিকর্ম্ম।

অতএব ভারতীয় প্রতিভা বলিতে যদি কোন নূতন সৃষ্টিকর্ম্মের বা কবিকর্ম্মের প্রতিভা বুঝায়, তাহা আর কিছু নয়—যুগের সহিত সনাতনের ঐ সঙ্গতি-সাধন; তাহাতে কোন নূতন সত্য বা মৌলিকতার গৌরব নাই; সৃষ্টিকে সার্থক করিবার—অনাসৃষ্টি নিবারণ করিবার যে শক্তি তাহাই ভারতীয় প্রতিভার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। প্রকৃতির নটিনী-নৃত্যের নব-নব ভঙ্গিমা, অথবা তাহার সেই নৃত্যোন্মত্ত

চরণের মণি-মঞ্জীরধ্বনিকে নব নব ছন্দে ধরিয়া দেওয়াই সেই প্রতিভার কাজ নহে; তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি—ঐ যুগেরই যতকিছু প্রয়োজন ও প্ররোচনাকে একটি সুডৌল সৃষ্টিতে সার্থক করিয়া তোলা এবং তদ্দ্বারা সেই সনাতনের জয়-ঘোষণা করা। আরও একটি বড় দায় তাহার আছে—ভারতের সেই পুরুষ-আত্মাকে উদ্ধার করা, তাহাকে পুনঃসঞ্জীবিত করা; এই দায়টাই বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে একটা বড় দায় হইয়া উঠিয়াছিল।

এতক্ষণে বুঝিতে পারা যাইবে, প্রতিভা ও মনীষার মানদণ্ড য়ুরোপে ও ভারতে কেন একরূপ নহে। এইবার আমি ভারতীয় প্রতিভার সেই সৃষ্টিশক্তি, সেই দুরূহ কবিকর্ম্মের কথা বলিব, এবং তাহারই দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বঙ্কিম-প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করিব।

আমি বলিয়াছি ভারতের সাধনায় সেই 'একে'র তত্ত্ব—সেই 'ব্রহ্ম' নামক সত্য বহুকাল আগে ধরা দিয়াছে, সে নিজের ব্যক্তিজীবন ও সমাজ-জীবনকে তাহারই অভিমুখে স্থাপন করিয়া, এই অনিত্যকেই নিত্যের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছে। কবি যথার্থই বলিয়াছেন—

"ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্ম্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্ম্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি' সর্ব্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।"

কিন্তু কাজটি তো সহজ নয়—ঐ ব্রহ্মকে, ঐ সত্য-সনাতনকে কাল ক্রমাগতই লঙ্ঘন করিতে চায়, উন্মার্গগামিতাই তাহার স্বভাব। তাহা হইলে ঐ কালকে ভুলাইয়া—যেন তাহারই কামনা-পূরণের ছলে, সেই কালাতীতকে একটা নূতন সাজে সাজাইতে হইবে—নহিলে সনাতনের কোন মর্য্যাদাই থাকিবে না। একথা ভক্তের বা সংসার-বিরাগীর কথা নয়—সংসার-সাধকের কথা; কারণ, যাহারা সংসার-বিরক্ত ভগবৎপ্রেমিক—জগৎ বা মানবসমাজের নিয়তি-চিন্তা করে না, তাহারা ঐরূপ সমন্বয়—প্রকৃতি ও ব্রহ্মের মধ্যে ঐরূপ বোঝা-পড়ার প্রয়োজন বোধ করে না, অতএব ঐ কবিশক্তি বা সৃষ্টিশক্তি তাহাদের আবশ্যক হয় না। তাহারা কবি না হইয়া মিষ্টিক হইয়া থাকে। যাহাকে ভারতের মধ্যযুগ বলা যাইতে পারে, সেই গত হাজার বৎসর ধরিয়া ভারত ঐরূপ বৈরাগ্যের সাধনা করিয়াছে—প্রকৃতি বা প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ দমন বা উচ্ছেদ করিয়া নিবৃত্তির গুণগান করিয়াছে; ফলে ঐ কাল যেন স্রোতোহীন হইয়া জীবনকে অতিশয় দুর্ব্বল ও স্বাস্থ্যহীন করিয়াছে। ইহার কারণ, ঐ সনাতনকেই সে সকল পূজা নিবেদন করিয়াছে, যুগ ও কালকে কিছুমাত্র সম্মান করে নাই; একটি চমৎকার কবি-বচন তাহার সাক্ষ্য দিতেছে—

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি-অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগরলহরী-সমানা॥

একটা—সাগর, আরেকটা তাহার লহরী ; একটার আদিও নাই, অবসানও নাই, আরেকটা ক্ষণেকের তরঙ্গমাত্র, অতএব তাহার মূল্য কি ? সনাতনকেই এমন একান্ত করিয়া দেখা—ইহাও প্রকৃতিবাদের মত একই প্রকার ভ্রান্তি—ইহাতেও সেই সমন্বয়ের দিব্যদৃষ্টি বা সৃষ্টিসত্য নাই। এই যে দুই বিষম বস্তুকে মিলাইয়া এক বস্তু করিয়া তোলা, ইহাই উৎকৃষ্ট সৃষ্টিকর্ম্ম, উহার যে প্রতিভা তাহাকেই উৎকৃষ্ট কবি-প্রতিভা বলিতে হইবে—অন্ততঃ তাহাই উৎকৃষ্ট ভারতীয় প্রতিভার মানদণ্ড। সত্যকে দর্শন করা দ্রষ্টার কাজ—ঋষির কাজ ; সেই সত্য দেশ-কাল-নিরপেক্ষ, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের প্রয়োজন-মুক্ত, সর্ব্বরূপবর্জ্জিত, নিরঞ্জন ; ঋষিরা সেই সত্যের উপাসনা করেন, একটি মন্ত্ররূপে তাহাকে আত্মগোচর করেন ; জগতের সহিত তাহার সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই। কিন্তু সেই মন্ত্রকেই রূপময় করিয়া তোলা—সেই সনাতনকে কালের প্রবাহে পদ্মের মত ফুটাইয়া তোলা—আর একজনের কাজ, তিনি কবি—তিনি স্রষ্টা।

আমি এই যে রূপসৃষ্টিকেই শ্রেষ্ঠ কবিকর্ম্ম বলিয়াছি, উহার অর্থ কি ? একটা সহজ অর্থ আছে—একটা abstract idea বা ভাব-বস্তুকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া তোলা ; জ্ঞানগম্য বা ধ্যানগম্যকে শরীরী—নিরাকারকে সাকার করিয়া তোলা ; ভাবের একটা symbol বা প্রতীক নয়, যদি রূপক হয় তবে তাহাও একটা জীবন্ত মূর্ত্তি হওয়া চাই, অর্থাৎ রূপক বলিয়া মনেই হইবে না। এই যে ভাবের অনুরূপ দেহ-যোজনা ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হয় ? সেই সৃষ্টিকর্ম্মে কবির দৃষ্টি কিরূপ ? একথা সত্য যে, কবিরা ভাবের যে দেহ-নির্ম্মাণ করেন তাহার উপাদান এই প্রত্যক্ষ দেহ-জগৎ বা বস্তুজগৎ হইতেই সংগ্রহ করিতে হয়। ঐ প্রত্যক্ষ বস্তুগুলির (যেমন, নদ-নদী, বন-পাহাড়, জীব-জন্তু, মাঠ-প্রান্তর, এমন কি, সাধারণ মনুষ্যমূর্ত্তি) আকার বা আকৃতিই আছে—অর্থাৎ দেহই আছে, সেই দেহগুলির কোন ভাব নাই। এই দেহেই ভাবের রূপ ফুটাইয়া তুলিতে হয়। কাব্যসৃষ্টিতেও ঠিক ইহাই করিতে হয় ; সাধারণ চলিত ভাষার শব্দগুলাতেই—যাহাদের নিজস্ব কোন ভাব নাই—যখন কোন ভাব যুক্ত হয়, তখনই তাহারা একটা রূপ ধারণ করে ; ভাবের তো রূপ ছিল না, শব্দগুলাও রূপহীন ; অতএব ঐ রূপ একটা পৃথক বস্তু, উহা ভাবও নয়, শব্দও নয় ; উহা একটা নূতন সৃষ্টি, ভাব ও ভাষার সঙ্গম-স্থলেই উহার চকিত-বিকাশ হইয়াছে। শব্দগুলিকে ভাবের স্পর্শে ঐ যে রূপময় করিয়া তোলা—উহাই আদ্য কবিকর্ম্ম, উহাকেই বলে ভাবের সহিত ভাষার সারূপ্য-সাধন। তেমনই, বাহিরের ঐ জড়বস্তুগুলাও যখন কোন ভাবের সারূপ্য লাভ করে, তখনই তাহাতে একটা সুষমা ফুটিয়া উঠে, উহারই নাম সৌন্দর্য্য, ঐ সৌন্দর্য্যই রূপ। এখানেও দেখা যাইতেছে, ভাবের দেহ ছিল না, বস্তুরও ভাব ছিল না ; কিন্তু যখন ভাবের সহিত বস্তুর মিলন হয় তখনই একটি তৃতীয় বস্তুর উদ্ভব হয়—সেই বস্তুর রূপ ; ঐ রূপ আর কিছুই নয়, বস্তুর আকারের সৌষম্য,—সেই সুষমাই সৌন্দর্য্য। অর্থাৎ, বস্তুর সহিত ভাবের সমন্বয় ঘটিলেই রূপের জন্ম হয়। কবির দৃষ্টি এই রূপকেই আবিষ্কার করে—এবং আবিষ্কার

করার নামই সৃষ্টি করা ; কারণ যে মুহূর্তে ঐ আবিষ্কার সেই মুহূর্তেই সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাকে আমাদের দর্শনশাস্ত্রে দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ বলে। এইবার এই প্রসঙ্গে একজন মনীষী ইংরেজ লেখকের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—

"I would also urge now as ever the worship of beauty as true form……When will men understand that form (রূপ) is not an unimportant accident, a mere chance—but an expression of the inner being ; that in this very point the two worlds, the inner and the outer, the visible and the invisible touch ?"

[Sir John Woodroffe—*Is India Civilized ?*]

তিনি বলিতেছেন, "মূর্ত্তিসকলের ঐ যে নিখুঁত সুষমা উহাই সৌন্দর্য্যের মূলাধার, ঐ সুষমাই বস্তুর অন্তরতম সত্তার বহিঃপ্রকাশ ; যেখানেই ঐ প্রকাশ হইয়াছে সেইখানেই অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগতের—দৃশ্য ও অদৃশ্যের (আমাদের ঐ বস্তু ও ভাবের) মিলন ঘটিয়াছে।" আমরাও সেই এক তত্ত্বের আশ্রয় লইতেছি, কেবল প্রসঙ্গের প্রয়োজনে ভাষাটা একটু ভিন্ন। এই যে তত্ত্ব, ইহাই যে সকল রূপসৃষ্টির মূলতত্ত্ব, তাহার প্রমাণ, পূর্ব্বে ঐ যে সনাতনকে যুগের আকারে রূপ দেওয়ার কথা বলিয়াছি, উহাও সেই এক তত্ত্ব। সেখানে কালধারা রূপিণী প্রকৃতির নব-নব, বিক্ষিপ্ত, অবিন্যস্ত ও উন্মার্গগামী যে সাকার বস্তু-প্রবাহ, অর্থাৎ তাহার অন্ধশক্তির যে অনিয়ত লীলা—তাহাতেই যখন সনাতনের—সেই নিরাকার ধ্রুব-তত্ত্বের স্পর্শ ঘটে, তখনই একটা শৃঙ্খলার সুষমা ফুটিয়া উঠে, একটা রূপ দেখা দেয়—সবকিছু সুডৌল ও সার্থক বলিয়া মনে হয়। ঐ যে একটা তত্ত্বকে জীবনের জবানীতে রূপ দেওয়া—যতকিছু অভাবকে ভাবের ছন্দে মিলাইয়া দেওয়া—উহাই তো শ্রেষ্ঠ কবিকর্ম্ম। রূপকার শিল্পীমাত্রেই যেমন জড়-দেহের মধ্যে ভাবের সুষমা আবিষ্কার করে, তেমনই এখানেও ঋষিদৃষ্টি কবিদৃষ্টিতে পরিণত হয় বলিয়াই তাহা যুগের মধ্যে সনাতনকে আবিষ্কার করে, সনাতনের আলিঙ্গনপাশে যুগ সেই রূপ-সুষমা ধারণ করে। ইহারই নাম—সান্তের সহিত অনন্তের পরিণয় ; একটা হয় content বা বিষয়, অপরটি হয়—তাহার form বা মূর্ত্তি-সুষমা। এইবার ভাব-সত্যকে রূপ দেওয়ার—ধ্যানগম্যকে ইন্দ্রিয়গোচর করিবার একটা বিশেষ পদ্ধতির কথা বলিব।

৩

ভারতের ইতিহাসে ঐ সনাতনকে যুগের অনুরূপ মূর্ত্তি দেওয়া কতবার কত ভঙ্গিতে হইয়াছে আমাদের তাহা জানা নাই, কিন্তু একবারের কথা আমরা জানি—সেই যুগের নাম দেওয়া হইয়াছে পৌরাণিক যুগ। সে একটা বিরাট যুগান্তরের যুগ—একটা বড় বিপ্লবের নিরসন-যুগ ; সম্ভবতঃ এত বড় সমস্যা-সমাধানের যুগ তৎপূর্ব্বে আবির্ভূত হয় নাই। ঐ যুগের প্রবৃত্তি ও প্রেরণাকে, একটা জটিল সংশয়-জাল হইতে—প্রায় হাজার বৎসরের দ্বন্দ্ব ও অন্ধ-প্রয়াস হইতে—মুক্ত করিয়া,

অবশেষে যে সৃষ্টিকর্ম্মে সার্থক করা গিয়াছিল—সেই অসাধারণ কবি-প্রতিভার কথা পরে বলিব। তৎপূর্ব্বে বৌদ্ধবিপ্লব হইয়া গিয়াছে; সেই বিপ্লব সহসা হয় নাই,—বোধ হয়, কয়েকশত বৎসর ধরিয়া একটা বিষম আধ্যাত্মিক সংগ্রামে ভারতের সংশয়ী আত্মা নানা সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া শেষে ঐ বৌদ্ধ-চিন্তাকে জয়যুক্ত করিয়াছিল। তার কারণ, উপনিষদের অরণ্য-সভায় অতিশয় বিবিক্তভাবে ভারত যে মহাসত্যের সন্ধান পাইয়াছিল সেই ব্রহ্মজ্ঞান কয়েকজন অধিকারীর অধিকারেই ছিল, জনগণের মধ্যে তাহার প্রচার নিষিদ্ধ ছিল। এজন্য সেই তত্ত্ব মানবসমাজে মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, অর্থাৎ সেই ব্রহ্মকে সমাজের জবানীতে রূপ দেওয়া হয় নাই। সেই প্রাচীন যজ্ঞতত্ত্ব হইতেই, তাহার প্রতিবাদে বা প্রতিক্রিয়ামূলক চিন্তাধারায়, যে পরাবিদ্যার উদ্ভব হইয়াছিল তাহা এমনই করিয়া গহনগুহায় নিহিত হইয়া রহিল। কিন্তু সেই প্রতিক্রিয়া বা বিদ্রোহ—সেই সংশয়-সংগ্রাম নিরস্ত হয় নাই, বরং আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এবং সমাজ-মনে গভীরতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; তাহাতেই নানা শূন্যবাদ বা নাস্তিক্যদর্শনের কোলাহলে ভারতের চিন্তা আচ্ছন্ন হইয়াছিল। বৌদ্ধবিপ্লবের পর শঙ্করাচার্য্য সেই নাস্তিক্যদর্শন বা শূন্যবাদের প্রতিরোধে যে দার্শনিক পাষাণ-প্রাচীর গড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহাও সেই শূন্যবাদেরই নামান্তর—সেও এক তত্ত্বের উপরে আর এক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা; তাহাতেও জগৎ ও জীবন অতিসূক্ষ্ম বিচার-বিতর্কের অন্তরালে অদর্শন হইয়া গেল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তিনি যে অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন—তাহাতে প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করাই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বলিয়া, তিনি বেদান্তের ব্রহ্মকেও বৌদ্ধের প্রায় সম-পন্থায় স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—যেন তাহাদের অস্ত্রেই তাহাদিগকে জয় করিতে হইবে; আজ যেমন মুসলমানকে নিরস্ত করিবার জন্য হিন্দুকে অহিন্দু করিয়া তোলা হইতেছে—যাহা হিন্দুধর্ম্ম নয়, তাহাকেই বিশুদ্ধ হিন্দু-আদর্শ বলিয়া প্রচার করা হইতেছে; নহিলে মুসলমানকে বুঝানো যায় না। শঙ্করাচার্য্য যে নব-বেদান্তদর্শন প্রণয়ন করিলেন তাহাতে আস্তিক্যে ও নাস্তিক্যে বিশেষ পার্থক্য রহিল না, তত্ত্বটাই এতবড় হইয়া উঠিল যে, তথ্যের সহিত—জীবন-সত্যের সহিত তাহার সঙ্গতির উপায় রহিল না। কিন্তু ভারতীয় প্রতিভা ইতিমধ্যেই, ঋষিত্ব নয়—কবিত্বের এমন এক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল যে তেমনটি তৎপূর্ব্বে আর কখনও ঘটে নাই। এই কাব্য-সাহিত্যের নাম—পৌরাণিক সাহিত্য; সেই সাহিত্যের মধ্যমণি—মহাভারত। এই পুরাণ একাধারে মহাকাব্য ও মহানীতিগ্রন্থ—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষের এক বিরাট মানব-শাস্ত্র। উহাতে অতি উচ্চ তত্ত্বের সহিত বাস্তবের সমন্বয় হইয়াছে, অসীমের কল্পনা সীমার আকারে সমর্পিত হইয়াছে;—সেই নিত্য-চিরন্তনকে রূপে-রূপে রূপময় করা হইয়াছে। বেশ বুঝিতে পারা যায়, উহাতে সনাতনের মন্ত্রেই যুগের অর্চ্চনা করা হইয়াছিল, তাহাতে ভারত-ইতিহাসের একটা কঠিন সঙ্কট নিবারিত হইয়াছিল। আরও দেখা যায়, সাধারণের দুরধিগম্য বেদান্তের সেই তত্ত্ব—সেই 'ব্রহ্ম' বা 'আত্মন্'

নামক অবিনাশী বস্তুকে অতিশয় নিরক্ষর নিম্নতম সমাজেরও হৃদয়গোচর—চিন্তাগোচর নয়—অনুভূতিগোচর করিবার এক আশ্চর্য্য সাহিত্য-রীতির উদ্ভব হইয়াছিল। সাহিত্য যদি বিশেষ অর্থে রূপ-সৃষ্টির পন্থা হয়, তবে এত বড় সাহিত্য আর কোন দেশে, কোন জাতির মধ্যে উদ্ভূত হয় নাই। মহাভারতের কবি যদিও "রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য যন্ময়া ধ্যানেন কল্পিতম্" ইত্যাদি অপরাধের জন্য সেই অরূপ অনির্ব্বচনীয়ের নিকটে ক্ষমাভিক্ষা করিয়াছেন, তথাপি তিনি যে কেন ঐ রূপ-কল্পনা করিয়াছিলেন, এবং তদ্দ্বারা কত বড় প্রয়োজন-সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সে জ্ঞান নিশ্চয়ই তাঁহার ছিল। বস্তুতঃ এতবড় অসাধ্য-সাধনের প্রতিভা জগতের ইতিহাসে বিরল। তবেই বুঝিতে হইবে, সেই যুগ কত বড উৎকণ্ঠা, কত বড় সমস্যার যুগ ছিল—নতুবা জাতির আত্মা আত্মরক্ষার জন্য এতবড় প্রতিভার জন্মদান করিত না। আমি পূর্ব্বে যে রূপসৃষ্টির কথা বলিয়াছি—ইহাও সেই ভাবকে মূর্ত্তিসুষমা দান করিবার প্রতিভা; কারণ এখানেও সেই অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ—সেই গোচর ও অগোচরের মিলন ঘটাইতে হইয়াছে; আবার যেহেতু সেই অমূর্ত্তকে এমন করিয়া সর্ব্বসাধারণের চক্ষুগোচর করা গিয়াছে, অতএব উহার তুল্য কবি কীর্ত্তি আর নাই।

তাহা হইলে, ঐ পুরাণের যুগই ভারতীয় সাধনার শেষ-পরিণতির যুগ, ঐ পৌরাণিক কবি-প্রতিভাই ভারতকে এক মহাসঙ্কটে উদ্ধার করিয়াছিল, ভারতে মহাভারতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল; আরও দেখা যাইতেছে, যুগ-সঙ্কট যেমনই হউক, সেই যুগের আকারেই সনাতনকে মূর্ত্তিদান করিতে হইবে; প্রত্যেক যুগের প্রবৃত্তি নূতন হইবারই কথা, অথচ তাহারই উপাদানে সনাতনকে নবরূপে অবতারণ করিতে হইবে। কবির বা স্রষ্টার সেই দিব্যপ্রতিভাই যুগের সেই রূপটিকে যেন একটা রূপহীন প্রস্তর-ফলক হইতে কুঁদিয়া বাহির করে— তাহার সেই জড়দেহ-উপাদানেই সনাতনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে। ভাগবতী সৃষ্টির মতই সেই মূর্ত্তিও জীবন্ত, তাহা আর্টের মনোহর রূপ নয়—জীবনের মৃত্যুহর রূপ। কারণ, "The touch of Truth is the touch of Life"—ঐ Truth-এর স্পর্শেই দেহটা জীবন্ত হইয়া উঠে—সেই সনাতনের অনুপ্রবেশেই যুগও মৃত্যুর পরিবর্ত্তে অমৃত-রূপ ধারণ করে, জাতির ইতিহাস একটা নব-জীবনের পথে প্রবর্ত্তিত হয়।

সেই পৌরাণিক কবি-প্রতিভা একালের ভারতে—আবার এক মহা-যুগসঙ্কটের সন্ধিক্ষণে সহসা বাঙালী-জাতির হৃদয় হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল—বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্রেরণাই অনুভব করিয়াছিলেন। সেই প্রেরণার বশেই তিনি আর এক যুগের মূর্ত্তি, বা সাধন-বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার একটা সাক্ষ্য-প্রমাণও আছে—বঙ্কিমচন্দ্র ঐ পৌরাণিক ধর্ম্মকেই হিন্দুধর্ম্মের পূর্ণ-পরিণতরূপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। অতঃপর, তিনি এই আরেক যুগের অভিনব বিপ্লবী প্রবৃত্তিকে—ঐ য়ুরোপীয়, প্রকৃতি-সর্ব্বস্ব, অন্ধ জীবনাবেগের দুরন্ত দাবিকে—স্বীকার করিয়া তাহারই জবানীতে ভারতের সেই নিত্য-সনাতন পুরুষ-আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন। তিনিও ব্রহ্ম-তত্ত্ব হইতে মূর্ত্তি-তত্ত্বে নামিয়া আসিলেন

আমি ইহার দুই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। এ পর্য্যন্ত, কোন যুগেই, ভারত প্রকৃতিকে বা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎটাকে তাহার ধর্ম্মসংহিতায় একটা বড় স্থান অধিকার করিতে দেয় নাই, তার কারণ, আর কোন যুগে তাহার প্রতি এইরূপ দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন হয় নাই। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, ঐ রূপসৃষ্টিতে যুগটাই প্রধান ; কারণ সেই মূর্ত্তির content বা বিষয় হইবে—অর্থাৎ রূপের প্রধান আশ্রয় হইবে—কালধারার ঐ যুগ-নামক একটি বিশেষ তরঙ্গ-সমষ্টি ; অতএব, মূর্ত্তি-নির্ম্মাণে যুগটাই সর্ব্বাগ্রে গণনীয়। পুরাণকার কবিও তাঁহার সেই যুগের পিপাসাকে পূর্ণ প্রশ্রয় দিয়া, তাহার পশ্চাতের চিন্তাবস্তুগুলাকে এমন রূপ ও রূপক, কাহিনী ও রূপকথায় মূর্ত্তিমান করিলেন যে, তাহাতেই মানুষের সকল উৎকণ্ঠা, ভয়-সংশয় ও বিদ্রোহ যেন আপনা হইতেই জুড়াইয়া গেল ; তার কারণ, মনুষ্য-সুলভ সংস্কার-কেই আশ্রয় করিয়া—যাহা সর্ব্বসংস্কার-বহির্ভূত, সেই পরম তত্ত্বও একটি অপূর্ব্ব অনুভূতিযোগে তাহাদের আত্মগোচর হইল। রূপ-সাধনাতেই এইরূপ উপলব্ধি সম্ভব, কারণ, ভাব ও বস্তুর ঐ সঙ্গম-তীর্থেই অসীমা সীমাকে স্পর্শ করে, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। রূপমাত্রেই ভাবের দ্যোতক বলিয়া সেই রূপ-যোগেই ইন্দ্রিয়ের সহিত অতীন্দ্রিয়ের যোগস্থাপন হয়, উপলব্ধির এমন সহজ পন্থা আর নাই। আবার যুগ-মন বা জন-মন ভাবের পথেই চালিত হয়, সেই ভাব মূর্ত্তির রূপেই সহজগ্রাহ্য হয়। জন-মনের উপরে জ্ঞানের শাসন কিরূপ ব্যর্থ হয় তাহার প্রমাণ—মূর্ত্তিকে বা রূপকে যাহারা ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে বাদ দিয়াছে, তাহারাই অজ্ঞ জন-মনকে চিরদিন অন্ধ-বিশ্বাসের দাস করিয়া রাখিয়াছে—জ্ঞান তো তাহাদের হয়ই না, উপরন্তু অজ্ঞানের মোহ তাহাদিগকে পশুবৎ হিংস্র করিয়া তোলে। অতএব জ্ঞানে যাহাকে ধরিয়া দেওয়া দুরূহ, তাহাকে ঐ রূপের একরূপ মিষ্টিক-পন্থায় ধরাইয়া দেওয়া যায় ; তজ্জন্য অতীন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত করিতে হইবে, তাহাকে একটা রূপ বা মূর্ত্তি দিতে হইবে। কবি যে বলিয়াছেন—"পরশ যাঁরে যায় না করা, সকল দেহে দিলেন ধরা", তাহার একটা অর্থ এই যে, জ্ঞানের দ্বারা যাহাকে পরোক্ষ করা যায় মাত্র, দেহের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ প্রতীতির দ্বারাই তাহাকে অপরোক্ষ করা যায়। রূপ ও অরূপের ঐ মোহনায়—জ্ঞানযোগে নয়, একরূপ ভাবযোগে সেই পরমবস্তু মানুষের গভীরতর অনুভূতির গোচর হইয়া থাকে। এতখানি মিষ্টিক ভাব-সমাধির প্রয়োজন ঐ জনগণের অবশ্য নাই ; তথাপি ঐ উপায়ে তাহাদের চিত্ত সেই সত্যের যেটুকু উপলব্ধি করিতে পারে তাহাই যথেষ্ট। এই মূর্ত্তিনির্ম্মাণের যে কাব্য তাহারই নাম—পুরাণ ; অরূপকে রূপে ধরিয়া দিবার সেই পৌরাণিক প্রতিভাই শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা।

তাই ভারতের পৌরাণিক যুগ এমন রূপ ও অরূপের হরিহর-মিলনের যুগ, সাকারের মারফতে নিরাকারকে ধরিবার যুগ। সেই মূর্ত্তি বা ভাব-বিগ্রহ অপর যুগের উপযোগী না হইবারই কথা, কিন্তু সেই কল্পনা চিরযুগের। সেই কবি-শক্তিও বিশেষ করিয়া ভারতীয় শক্তি, কারণ তাহা কেবল আর্ট-কর্ম্মই নয়। আর্টের দ্বারা অর্থাৎ aesthetic রস-সৃষ্টির দ্বারা যে অসীম অনন্তের আভাস দেওয়া যায়,

তাহা একটা মানস বস্তু, তাহা জীবনের রূপ নয়, তাহাকে জন-মন দেখিতে পায় না। আবার সনাতনের বাণীটাকেই গানে সুরময় করিয়া তুলিলে, কালধারায় প্রত্যক্ষ বাস্তবই সেই সনাতনের ছাঁচে রূপময় হইয়া উঠে না; কেবল সেই তত্ত্বকে জ্ঞানের ভাষা হইতে সুরের ভাষায় অনুবাদ করা হয় মাত্র। এইজন্য পুরাণ মহাকাব্য—গীতিকাব্য নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র তেমনই পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন—আধুনিক যুগের পুরাণ। তাঁহার সেই নব-মহাভারতও আদি মহাভারতের মত একাধারে—ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও মানবজীবনকাব্য। এই মহাভারতের কৃষ্ণ—পূর্ণমানব-অবতার; সেই অবতার-বাদও দেবতার অবতরণ নয়, মানুষেরই দেবত্বে আরোহণ—প্রকৃতির সাহায্যেই পুরুষকর্তৃক প্রকৃতি-জয়।

অতএব বঙ্কিমচন্দ্র নবযুগের ঐ পাশ্চাত্ত্য প্রকৃতি-ধর্ম্মকেই ভারতীয় সনাতন-ধর্ম্মের বাহন করিলেন, সেই পৌরাণিক কবি-প্রতিভার বলে সনাতনের নিরাকারকে যুগের আকারে সাকার করিয়া, চিন্ময়কে মৃন্ময় করিয়া, সৃষ্টির দ্বারা অনাসৃষ্টি নিবারণ করিলেন। তিনি সেই যুগের অন্তর্নিহিত পাশ্চাত্ত্য প্রকৃতি-সাধনাকে অতি-গভীর স্থিরদৃষ্টিতে অনুধাবন করিয়া তাহার সেই রাজসিক প্রবৃত্তিকে ভারতীয় সাধনায় আত্মসাৎ করিবার যে উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা মৌলিক না হইলেও তাহার মত সৃষ্টি-কর্ম্ম আর কি হইতে পারে? তাহার পদ্ধতি পৌরাণিক হইলেও, দৃষ্টিটা তাঁহার নিজস্ব। ঐ নবমহাভারতের শাস্ত্র-অংশ বা ধর্ম্মতত্ত্ব পুরাতন হইলেও নূতন; এই পুরাণের দেবতাও বিষ্ণু, শিব বা ব্রহ্মা নয়, বাসুদেব কৃষ্ণও নয়, তাহা এক নূতন দেবতা—দেশমাতৃকা; এ পুরাণের নাম মাতৃকা-পুরাণ, তাহার আবাহন-মন্ত্র—'বন্দে মাতরম্'। ঐ এক দেবতার আরাধনায়, একই কালে, প্রকৃতিপন্থী পাশ্চাত্ত্যের একান্ত রাজসিক প্রবৃত্তিকেও যেমন স্বীকার করা যাইবে, তেমনই, ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনাও অব্যাহত থাকিবে; এক কথায়, ঐ প্রকৃতি-শক্তিকে দেশ-মাতৃকার রূপে বরণ করিয়া, তাহার মন্ত্রে আত্মাহুতি দিয়া ভারতের মানুষ আবার সেই বৈদিক পুরুষ-যজ্ঞের পুরুষ হইতে পারিবে। এমনি করিয়া যুগের সহিত সনাতনের যোগসাধন হইবে।

৪

এই প্রসঙ্গে, এইখানেই আমি আর একবার যুগসমস্যা-সমাধানের তত্ত্বটা একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্ত্র ও তাহার সাধনতত্ত্বের যথোচিত সমালোচনার অবকাশ মিলিবে। যুগ-মন বা যুগ-প্রভাবে জাতির জন-মন যে কামনা-বাসনা, আশা-বিশ্বাস এবং নবজাগ্রত নানা সংস্কারের বশীভূত হয়, সেইগুলাকে উপাদান করিয়া—সাক্ষাৎভাবে যেন সেইগুলারই পোষকতা করিয়া, তাহাদেরই রং ও রেখার জবানীতে এমন একটি মূর্ত্তি গড়িয়া দিতে হইবে যে, তাহা সনাতনেরই একটা রূপ; যাহা আদৌ রূপহীন অর্থাৎ, কালাতীত, ঐ যুগ যেন তাহারই একটা প্রকাশ। আমি ভারতের সনাতন-তত্ত্ব

সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ঐ যুগ-মন সনাতনকে জানে না, জানিতে চাহেও না, সে-মন সর্ব্বদা একটা রূপকে, অর্থাৎ বাস্তব অভিব্যক্তিকেই বরণ করে। তথাপি, কালবিশেষের ঐ ভাব-অভাবের উপাদানে গঠিত একটা মূর্ত্তির মারফতেই চিরন্তনের তত্ত্বকেও হৃদয়গোচর করানো যায়। পুরাণগুলা এইরূপ বহু মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিল—প্রত্যেকটাই এক একটা ভাবের শরীরী বিগ্রহ; আমরা যাহাকে পৌরাণিক যুগ বলি, সেই যুগের অন্তঃ স্রোতো-বাহী ভাবগুলাকে, জন-মনের যাবতীয় উৎকণ্ঠাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া পুরাণ-কবি সনাতন-সত্যের সেই এক তত্ত্বকেই কথায়, কাহিনীতে, রূপক-এ মূর্ত্তিমান করিয়া-ছিলেন। এ যে কতবড় প্রতিভা তাহা জ্ঞানী হিন্দুমাত্রেই জানে। বঙ্কিমচন্দ্রকেও ঠিক ঐরূপ কবি-কর্ম্ম করিতে হইয়াছিল। সনাতনকে আপাততঃ দৃষ্টির আড়ালে রাখিয়া, অর্থাৎ গোঁড়া হিন্দুর মত তাহাকেই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা না করিয়া, কিংবা সেই সনাতনের কোন একটা বিশেষ যুগমূর্ত্তিই যে সর্ব্বযুগের উপাস্য, এইরূপ জিদ না করিয়া—তিনি ঐ নবযুগের লক্ষণগুলাকেই গুরুত্ব দান করিয়াছিলেন; তার কারণ,—ঐ যে মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ, উহা মুখ্যতঃ ঐ যুগেরই প্রয়োজনে; আবার এই যুগও কিছু অধিক মাত্রায় আধিভৌতিক বাস্তবের যুগ; তাই প্রকৃত সৃষ্টি-কর্ম্মে যে বাস্তববুদ্ধির শাসন থাকিবেই তাহার বশে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ঐ পুরাণ-রচনায় একালের প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও ইতিহাস-বিদ্যাকে যতদূর সম্ভব মান্য করিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিকতা যে পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে সেই পরিমাণেই ঐ পুরাণ-রচনা সার্থক হইয়াছে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা সত্যই ক্ষুণ্ণ হয় নাই—বরং যে-ভাবে তাহা রক্ষিত হইয়াছে তাহাই প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এ যুগের গূঢ়তম প্রবৃত্তিকে আবিষ্কার ও আয়ত্ত করিয়া তিনি এমন প্রচ্ছন্নভাবে তাহাকেই সেই সনাতনের অভিমুখী করিয়াছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তিনি যেন ঐ যুগেরই জয়গান করিয়াছেন। যুগের জয়গান তো করিতেই হইবে, কিন্তু তাহাতেই সনাতনও জয়যুক্ত হইবে। তথাপি ঐরূপ মনে হওয়ারও প্রয়োজন আছে, কারণ, এমনই করিয়া যুগকে ভুলাইতে হয়, ভুলাইতে না পারিলে সে বিদ্রোহ করিবে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে, আধ্যাত্মিকতারই অত্যুচ্চ ভূমিতে তুলিয়া এই যুগকে সার্থক করিবার যে প্রয়াস আর এক বাঙালা মহাপুরুষ করিয়াছিলেন তাহার ফলাফল সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিব না; বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ পৌরাণিক ভাব-সাধনার উপরেও সেইরূপ অধ্যাত্ম-গভীর অত্যুচ্চ আদর্শ সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকার প্রয়োজন নিশ্চয় আছে; কিন্তু তাহাতে নূতন সৃষ্টিকর্ম্মের প্রেরণা নাই—প্রকৃতির সহিত পুরুষের, যুগের সহিত সনাতনের সমন্বয়মূলক সেই দেহ-প্রত্যক্ষ জীবন্ত মূর্ত্তিরচনা নাই। তাহার জন্য একধাপ নামিয়া আসিতে হয়—ব্রহ্মকে ব্রহ্মা হইতে হয়, উপনিষদের ঋষি না হইয়া পুরাণকার কবি হইতে হয়। পুরাণের ঐ দেব-দেবীগুলাকে, জ্ঞান-বিজ্ঞানগর্ব্বীরা যেমন পৌত্তলিক বলিয়া নিন্দা করে, তেমনই, বিশুদ্ধ অধ্যাত্মবাদীরা বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ নব-পৌরাণিক ধর্ম্মকে বিজ্ঞান-গন্ধী বা অনাধ্যা-ত্মিক বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু ঐ পৌরাণিক দেব-দেবীগুলাই যেমন

হিন্দুর শ্রেষ্ঠ সাধন-তত্ত্বকে যুগ-মনের ও জন-মনের সহজগ্রাহ্য করিয়াছিল, তেমনই বঙ্কিমচন্দ্রও যে-মন্ত্রে যুগের যে-মূর্ত্তিনির্ম্মাণ এবং তাহাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাতেই ভারতের সেই অধ্যাত্ম-দৃষ্টিই একটা নূতন-পথে নূতন রূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবে; উহার ঐ যুগোচিত বেশ একটা ছদ্মবেশই বটে—যুগোচিত বলিয়া তাহা যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনই পরিণামে চিত্তশুদ্ধিকর। ইহাই পৌরাণিক কবি-কর্ম্ম—ইহার যে প্রতিভা তাহাই শ্রেষ্ঠ ভারতীয় প্রতিভা।

* * * *

এ পর্য্যন্ত আমি ভারতীয় আদর্শে বঙ্কিম-প্রতিভার বিচার করিয়াছি; প্রবন্ধের আরম্ভে যে প্রশ্ন ছিল তাহারও যথাসাধ্য উত্তর দিয়াছি। এইবার তত্ত্ব ছাড়িয়া তথ্যের মধ্যে অবতরণ করিব; সেই মন্ত্রের সাক্ষাৎ প্রেরণা, মন্ত্রের দেবতা, এবং মন্ত্রের সাধন-তত্ত্ব ও পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব; কোন্ ভাবানুরূপ চিন্তা ও চিন্তানুরূপ ভাবের যোগ-বলে ঐ সৃষ্টিকর্ম্ম সম্ভব হইয়াছিল তাহাও দেখিব। সেই সঙ্গে, ঐ প্রতিভা যে কেন বিশেষ করিয়া বাঙালীকে আশ্রয় করিয়াছিল, এবং আজিও ভারতের এই নবযুগ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ কি কারণে বাঙালীর দ্বারাই সম্ভব, সে বিচারও করিতে হইবে, কারণ, গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ ভারত যে ঘূর্ণাবর্ত্তে ঘুরিয়া এক্ষণে প্রায় ডুবিতে বসিয়াছে, তাহা যে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই স্বাজাত্য-ধর্ম্মকে ত্যাগ এবং বাঙালীর সাধন-পন্থাকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করার জন্যই ঘটিয়াছে, ইহা বুঝিয়া লইতে না পারিলে বঙ্কিম-প্রতিভার মহত্ত্ব উপলব্ধি করা যাইবে না। অতএব, অতঃপর এই আলোচনা কিঞ্চিৎ ভিন্নমুখী হইবে, অর্থাৎ সাহিত্যিক ভাব-চিন্তার উচ্চভূমি হইতে বাস্তব ঘটনা বা তথ্যের নিম্নভূমিতে ভ্রমণ করিবে; কিন্তু তাহাতে লজ্জা পাইবার কারণ নাই—বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও কেবল 'সাহিত্যিক' ছিলেন না, তদপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন; তিনি ভাববিলাসী কবি ছিলেন না, প্রাণবান পুরুষ ছিলেন,—প্রতিভার সেই প্রাণ-শক্তি ও দিব্যপ্রয়াসের কথাই এইবার সবিস্তারে বলিব।

উত্তর-মীমাংসা

১

বাংলা-সাহিত্যের জনক বঙ্কিম, জীবন-মহাকাব্যের কবি বঙ্কিম, মনীষী বঙ্কিম —এ সকল হইতেও যে বঙ্কিম বড়, এমন কি, যাহা বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র সত্যকার পরিচয়, তাহা—স্বজাতি-প্রেমের—স্বাজাত্য-মন্ত্রের মন্ত্রদ্রষ্টা বঙ্কিম। যাহারা কেবল পড়া-পাখীর মত এই কথাটা আবৃত্তি করে, এবং একটা ফ্যাশনের মতই তাঁহার নামটাতে 'ঋষি'-উপাধি যোগ করিয়া সেই পরিচয়কে সহজসাধ্য ও সহজবোধ্য করিয়া লইয়াছে, তাহারা বঙ্কিমচন্দ্রকে জানে না, জানিতে চাহেও না; হয় তো সেইরূপ জানাটাই এক্ষণে সংস্কারবিরুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, একালে অতিশয় বর্ত্তমানে, যে ধর্ম্ম প্রচারিত ও প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে প্রেমের—স্বজাতি-প্রেমের লেশমাত্র প্রয়োজন আর নাই, এখন যে মহাপ্রেমের সাধনা

চলিতেছে, তাহা মহামানব-প্রেম, সকলেই তাহাতে ব্রহ্মসিদ্ধি লাভ করিয়া উচ্চ কলরব করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন জন্মিয়াছিলেন, তখন আর কিছু না থাক, মানুষের প্রতি মানুষের দয়া ছিল; এ জাতি যতই দুর্ব্বল হইয়া পড়ুক,—শুধুই পুত্র-কন্যা নয়, আত্মীয়-পরিজন এবং স্ব-সমাজের প্রতি একপ্রকার মমতা তখনও ছিল। সেইটুকু মাত্র প্রেমের উপর নির্ভর করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এমন একটি নূতনতর ও মহত্তর প্রেমের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন, যাহা ভারতবর্ষে এতকাল অজ্ঞাত ছিল। এই প্রেমের মন্ত্রদৃষ্টিই তাঁহাকে ঋষিপদবাচ্য করিয়াছে, তিনিই এ মন্ত্রের আদি-দ্রষ্টা। ইহাই দেশকে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান; তাঁহার সমগ্র সাহিত্য-কর্ম্ম আর কিছুই নয়—ঐ এক যজ্ঞাগ্নিতে একই মন্ত্রে নিরবচ্ছিন্ন আহুতি-দান। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনা করেন নাই, ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন নাই, ইতিহাসের গবেষণা করেন নাই, 'কৃষ্ণচরিত্র' লেখেন নাই, কাব্যসমালোচনা করেন নাই, সমাজ-ব্যবস্থা ও শিক্ষানীতির চিন্তা করেন নাই—তিনি সারাজীবন কেবল দেশের জন্য, স্বজাতির জন্য কাঁদিয়াছিলেন—কেমন করিয়া তাহাকে বাঁচাইবেন ইহাই ছিল তাঁহার একমাত্র ভাবনা। সেই ভাবনার বশে, এই মুমূর্ষু স্বজাতি-সমাজে পুরুষের পুরুষকারকে এক নূতন আধ্যাত্মিক আদর্শে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য তিনি এক নবধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

তখন ভারতের ইতিহাসে এক মহাসন্ধিক্ষণ সমাগত; বিগত তিন চারি হাজার বৎসরের সমাজ-জীবন সাহসা এমন একটা সমস্যার দ্বারা আক্রান্ত হইল যে, সেই সনাতন ধর্ম্মের যতগুলি যুগোপযোগী সংস্করণ ইতিপূর্ব্বে উদ্ভাবিত হইয়াছিল তাহার কোনটাই ঐ সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। কথাটা আর একটু বুঝাইয়া বলি। ভারত তখন প্রায় শতাধিক বৎসর ইংরেজের শাসনাধীন হইয়াছে, এই শাসনের অর্থ ও ফলাফল ক্রমেই সুগোচর হইয়া উঠিতেছে। ইংরেজ তাহার নূতন ধর্ম্মনীতি, চরিত্র-নীতি, দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রভায় ভারতের সমাজপতি ও ধর্ম্মগুরুদিগকে চকিত, চমকিত ও বিভ্রান্ত করিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রকেও করিয়াছিল। যে-কেহ ইংরেজী-শিক্ষার প্রলোভ-ফল আস্বাদান করিয়াছিল তাহারই চক্ষে, কবি টেনিসনের Lotus-Eaters-দের মত একটা নূতন ভাবের, নূতন তত্ত্বের রঙ্গীন ঘোর লাগিয়াছিল। তাহার ফলে দেশের প্রাচীনপন্থী ও নব্যপন্থীদের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল, সেই দ্বন্দ্বে অতিশয় মেধাবী চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই আত্মভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, ধর্ম্মচিন্তা শিথিল হইয়াছিল। ধর্ম্ম বলিতে আমি জাতির সংঘ-চেতনা বা সামাজিক একতা-বুদ্ধির কথা বলিতেছি, যাহা শেষ পর্য্যন্ত ব্যক্তির জীবন-যাত্রার পক্ষেও প্রয়োজন—যে-ধর্ম্ম নির্বিঘ্ন না হইলে কোন ধর্ম্মই রক্ষা পায় না। ঐ একশত বৎসর ধরিয়া ইংরেজের শাসন তাহাকে কোন্ পথে লইয়া যাইতেছিল তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। এতকাল ভারতে যে-জাতি বা যে-রাজাই রাজত্ব করিয়া থাকুক, কেহই এমন করিয়া তাহার জীব-ধর্ম্মকে বিপন্ন করে নাই। তার কারণ, এই নূতন জাতির রাজ্যশাসনের প্রয়োজনই স্বতন্ত্র। উহারা একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের অধিবাসী;

উহাদের ধর্ম্ম খৃষ্ট-ধর্ম্ম অর্থাৎ এশিয়ার ধর্ম্ম হইলেও, উহারা আসলে প্রকৃতিধর্ম্মী—বা আরও ঠিক করিয়া বলিতে হইলে, এক অতি-কৃপণা, অকরুণা প্রকৃতির কঠিন পীড়নে, জীবিকাসংগ্রহের তাড়নায় উহারা যেমন ক্রূর, তেমনই কৌশলী; যেমন চতুর, তেমনই দুঃসাহসী। এই জাতি তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও চরিত্র-নীতির উৎকর্ষ সত্ত্বেও এমন একটা বিজাতীয় লোভ এবং ক্ষুধার বশীভূত যে, একবার যখন ভারতের দ্বার খুলিয়া উহারা তাহার ধনভাণ্ডার ও খাদ্যভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়াছে, তখন তাহাদের সেই লোভান্ধ লুণ্ঠনের ফলে ভারত একদিকে যেমন অন্নহীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, তেমনই পরধর্ম্মের মোহে আত্মার শক্তিও হারাইবে, উহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। সর্ব্বনাশটার সূত্রপাত হইবে ভিতরে—তাহার স্বধর্ম্ম শিথিল হইবে; তাহাতেই স্মৃতিভ্রংশ ও বুদ্ধিনাশ হইবে, পরে দ্রুত বিনষ্ট হইতে কোন বাধা আর থাকিবে না। আরও দেখা যায়, ঐকাল হইতেই জগতের ইতিহাসে পট-পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক নানা আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফলে, পৃথিবীতে আর কোন দেশ কেবল মাত্র ভৌগোলিক বাধার সাহায্যে আপন সীমানার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিবে না। এক কথায়, ঐ ইংরেজ-অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে ভারতের অতীত যাহা কিছু উপার্জ্জন —তাহার জীবনযাত্রাপ্রণালী, সমাজ-ব্যবস্থা, ও ধর্ম্মীয় আদর্শ—সকলই সহসা অতিশয় অনুপযোগী হইয়া উঠিল, একটা নূতন-কিছুর উপরে তাহাকে স্থাপিত করিতে না পারিলে, এ জাতি আর বাঁচিয়া থাকিবে না।

যে-কালে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হয় সেকালেও দেশের কেহই এই সঙ্কট সম্বন্ধে সচেতন হয় নাই। সকলেই একটা নূতন শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্মাদনায় বিভোর হইয়াছে। অনেকের তখন বিশ্বাস, ঐ বিলাতী আদর্শে জীবনযাত্রা, সমাজ, ধর্ম্ম প্রভৃতি সংস্কার করিয়া লইতে পারিলেই, অর্থাৎ ইংরেজের পন্থা যতদূর সম্ভব অনুসরণ করিলেই, ইংরেজের মত উন্নত-জীবন যাপন করিতে পারিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আজিকার তথাকথিত স্বাধীন ভারতের নেতারাও ঠিক এই মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন—ভারতের সমাজ, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ বিলাতী ছাঁচে ঢালিয়া স্বর্গরচনার স্বপ্ন দেখিতেছেন। ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছু নয়, বহু শতাব্দীর পরাধীনতা সত্ত্বেও, এই জাতি যদি বা তাহার দেহটা সুস্থ রাখিতে পারিয়াছিল, প্রাণ বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল; এবং প্রাণ বা আত্মা দুর্ব্বল হইলেও যে-ধরণের চিন্তাবৃত্তি বা মস্তিষ্কক্রিয়া লুপ্ত হয় না—বরং ক্ষীণপ্রাণ, সংকীর্ণ-হৃদয় মানুষ তাহাকেই প্রশ্রয় দেয়—একরূপ প্রেমহীন মানস-আদর্শের পূজা করে, এই জাতির অপেক্ষাকৃত মস্তিষ্কশালী ব্যক্তিগণ তাহারই চর্চ্চায় এমন আত্মহারা হইয়া উঠিলেন যে, দেশ, জাতি, বা জনসাধারণের কল্যাণচিন্তা দূরে থাক, সেই নূতন বিদ্যা ও ভাবচিন্তার ঔদ্ধত্যে তাহাদের প্রতি একটা কৃপামিশ্রিত অবজ্ঞার ভাব প্রবল হইয়া উঠিল; নিজেদের সেই মানস-আদর্শে ঐ অসভ্যগণকে দীক্ষিত করিয়া তাহাদের উদ্ধারসাধনের জন্য তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। আসলে

সেই মনোভাব যেমন প্রেমহীন, তেমনই শ্রদ্ধাহীন ; তাহাতে সেই নূতন বিদ্যার দম্ভ এবং খ্রীষ্টীয় মিশনারী-সুলভ পতিতোদ্ধারের উৎসাহই প্রবল। ভারতের ঐতিহ্য, এজাতির বিশিষ্ট সাধনা, সেই সাধনার ঐতিহাসিক ধারা ও ক্রমপরিণতি, এবং শেষে তাহার দ্রুত অবনতি—কোনটাই তাঁহারা ধীর ভাবে, শ্রদ্ধা ও বিচার-বুদ্ধি সহকারে নিদিধ্যাসন করেন নাই।

দেশের অবস্থা তখন এমনই ; যাঁহারা ঐ নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, যুগোচিত ভবিষ্যৎ-চিন্তার দ্বারা জাতিকে বাস্তব কল্যাণের পথে চালিত করিবার অধিকারী তাঁহাদের মনোভাব এইরূপ। আমি একথাও বলিয়াছি যে, ঐতিহাসিক পট-পরিবর্ত্তনের ফলে ভারতের যে সঙ্কট উপস্থিত, তাহাতে তাহার সেই প্রাক্তন আত্মরক্ষণ-পন্থা কাজে লাগিবে না। এবার সে যে সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে তাহা পর-সমাজ বা পর-ধর্ম্মের আক্রমণ নয়—রাজা ও রাজ্যশাসন-ঘটিত বিপদ নয়—এক ভিন্ন প্রকৃতির, ভিন্ন জাতির সহিত জীবন-যুদ্ধের প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রকৃত পরিচয় একটি ইংরেজী বাক্যে এইরূপ নিবদ্ধ হইয়াছে—"dark and efficient West" ; ভারত-ইতিহাসে এমন দুর্য্যোগ আর কখনও ঘটে নাই। এই সমস্যাই ঐ যুগের ঐক্ষণে একজন মাত্র পুরুষের চিত্তে বজ্রদীপ্তির মত উদ্ভাসিত হইয়াছিল ; হয়তো তখনই তাহাতে এতখানি সজ্ঞান-চিন্তা ছিল না—কিন্তু সেই প্রেরণার মূলে অজ্ঞানে ঐ উৎকণ্ঠাই ছিল ; সেই পুরুষের প্রাণময় প্রজ্ঞা অন্ধকারেই ইহাকে ঈক্ষণ করিয়াছিল ; সকল দিব্য-অনুভূতি এইরূপই হইয়া থাকে। আমরা জানি, বঙ্কিমচন্দ্রের মেধা কিরূপ তীক্ষ্ণ ছিল, ইহাও জানি তাঁহার অধীত বিদ্যাও কিরূপ গভীর ও সুবিস্তৃত ছিল। তথাপি ইহা সত্য যে, এই দিব্যানুভূতি কোন বিদ্যার দ্বারা অর্জ্জন করা যায় না, ইহা আত্মাকে আপনি আসিয়া বরণ করে। সেই বোধি বা প্রজ্ঞার বলেই তিনি ঐ যুগ-প্রভাবের গূঢ়তম বিষ-বীজটিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এবং তাহার একমাত্র প্রতিষেধক কি তাহাও চকিতে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। একদিকে তিনি দেশের সেই ক্ষীণপ্রাণ, জীবনাবেগবর্জ্জিত, স্বার্থান্ধ, তর্ককুশল, ক্ষুদ্রাশয়, মৃত্যুভয়ভীত অথচ আধ্যাত্মিকতা বিলাসী, হতভাগ্য মানুষগুলাকে দেখিয়াছিলেন, অপরদিকে ইংরেজকে—তাহার ইতিহাস ও অভিলাষ, তাহার চরিত্র ও অভিসন্ধি, তাহার দুর্জ্জয় লোভ ও অমিত শক্তির দৃপ্ত মূর্ত্তিও দেখিয়াছিলেন ; তিনি তাহার পাপ ও পৌরুষ, তাহার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, তাহার জ্ঞান ও অজ্ঞান উত্তমরূপে বুঝিয়া লইয়াছিলেন। ঐ ইংরেজের জীবনে ও চরিত্রে তিনি এই যুগের বিষ ও বিষঘ্ন ঔষধ দুইয়েরই আভাস পাইয়াছিলেন। তথাপি ঐ বিষের জন্য তিনি শুধুই ইংরেজকে দায়ী করেন নাই ; তাঁহার ইতিহাস-জ্ঞান যেমন গভীর ছিল, বিচারবুদ্ধিও তেমনই তীক্ষ্ণ ছিল ; তিনি বুঝিয়াছিলেন ইংরেজের সঙ্গে যাহা আসিয়াছে তাহা অবশ্যম্ভাবী ; বাহির হইতে ঐ যে ধাক্কা, উহা একটা বৃহত্তর যুগ-পরিবর্ত্তনের ধাক্কা, সেই ধাক্কাতেই ভারতের এই সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। আজ ইংরেজের সঙ্গে যাহা আসিয়াছে, কাল আর একটা জাতিকে বাহন করিয়া সেই সঙ্কট আবির্ভূত

হইত। তথাপি বিষের সহিত ঐ যে বিষঘ্ন ঔষধের কথা বলিয়াছি—তাহার ইঙ্গিত তিনি ঐ জাতির চরিত্রেই পাইয়াছিলেন—তাহার সেই অসাধারণ স্বজাতি-বাৎসল্য। ঐ স্বজাতি-বাৎসল্য বিশেষভাবে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয় নাই—বিষঘ্ন হইলেও উহা যে নিজেও এক প্রকার বিষ, ইহা তিনি তাঁহার ভারতীয় সংস্কারে অনুভব করিয়াছিলেন; ঐ বিষকে শোধন করিয়া তাহাকেই অমৃতে পরিণত করিবার যে পন্থা, তাহাই তাঁহার "ধর্ম্মতত্ত্ব"। তাঁহার স্বজাতি-বাৎসল্য ঐরূপ একটা রিপু নয়—তাহা বিশুদ্ধ প্রেম। অতএব, ইংরেজের দৃষ্টান্তে তাহা যেমনই উদ্রিক্ত হউক, তাঁহার অন্তরের সেই দিব্যানুভূতি য়ুরোপ হইতে আসে নাই—উহা ভারত-মানসেরই এক নূতনতর অভিব্যক্তি; অথবা এমনও বলা যায় যে, উহার বৃন্তটাই নূতন, ফুল সেই একই; ঐ নূতন বৃন্তটিই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা, তথা বাঙালীর বিশিষ্ট সাধনা ও সংস্কৃতির ফল। ভারত এতদিন যে প্রেমকে আত্মার আত্ম-প্রেম বলিয়া মহীয়ান করিয়াছিল; তারপর যে প্রেমকে সে ভগবদ্ভক্তিতে রূপান্তরিত করিয়াছিল, তাহারও পরে, ভগবানের প্রসাদস্বরূপ যে-প্রেম সে নর-নারীকে বিতরণ করিয়াছিল, আজ সেই প্রেম রূপান্তরিত হইল স্বজাতি-প্রেমে; কিন্তু তাহাও সেই এক প্রেম, সেই প্রেমেরও শেষ লক্ষ্য রহিল পূর্ণতম আত্মোপলব্ধি, কেবল সাধনার সোপানটাই হইল ভিন্ন। এই সোপান-পরিবর্ত্তনই হইল বঙ্কিমচন্দ্রের ঋষিত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ; অথবা বলা যাইতে পারে, উহাই একটা সৃষ্টি, অর্থাৎ চিরন্তন সত্যের একটা নূতন প্রযোজনা। তাই বঙ্কিমচন্দ্র শুধুই ঋষি নহেন—একজন বড় স্রষ্টা, বড় কবি।

ঐ প্রেমকেও আমি ভারতীয় সাধনার অন্তর্গত বলিয়াছি,—কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলি। বেদ, পুরাণ ও তন্ত্র এই তিনের মধ্য দিয়াই যে একটি তত্ত্ব ভারতীয় সাধনায় চিরদিন অব্যাহত রহিয়াছে, স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাহাকে সেই এক যজ্ঞ-তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হোমকর্ম্ম আর কিছুই নয়--বিরাটের উদ্দেশে ক্ষুদ্রের আত্মোৎসর্গ; সর্ব্বভূতের হিতার্থে আত্মহিতের সঙ্কোচ; সৃষ্টিই যে অর্থে একটা মহাযজ্ঞ—সমাজের জীবনে, তথা ব্যক্তির জীবনে সেই যজ্ঞের নিত্য-অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম, এই যজ্ঞ গীতায় বার বার উপদিষ্ট হইয়াছে। এই ধর্ম্ম হইতে ভারতবাসী বহুদিন ভ্রষ্ট হইয়াছিল; হইয়াও যেন ফাঁকি দিয়া এতকাল বাঁচিয়াছিল; কিন্তু এইবার সেই ফাঁকি ধরা পড়িয়াছে, তাই ঐ নূতন যুগের যুগ-রাক্ষস তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভারতের সেই অধ্যাত্মবাদ যুগধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মানুষকে আত্মপরায়ণ, ক্ষীণপ্রাণ, বলহীন করিয়াছিল, ইহলোকে সর্ব্বপ্রকার দুর্গতি-ভোগ সত্ত্বেও পরলোকে সদ্‌গতি-লাভের আশায় সে অলস কাপুরুষ হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র জাতির এই মোহাবস্থা নিবারণের জন্য যে প্রেম-ধর্ম্ম প্রচার করিলেন তাহাই এ যুগের নব যজ্ঞধর্ম্ম; সমষ্টির জন্য ব্যষ্টির আত্মত্যাগই সেই যজ্ঞ; উহার জন্যই দেশ ও জাতি-প্রেমের সেই নব-ধর্ম্মসংহিতা। ভারতকে বাঁচাইতে হইলে ঐ এক পন্থাই আছে, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। ইহাই

তিনি তাঁহার জীবনব্যাপী সাহিত্য-কর্ম্মের দ্বারা দেশবাসীর প্রাণমূলে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত সাহিত্য এই ধর্ম্মেরই পুরাণ, সংহিতা, শ্রুতি ও স্মৃতি হইয়া আছে। তাহার ঐ একমন্ত্র—যদি বাঁচিতে চাও, তবে ঐ দেশ-প্রীতির সাধনায় সর্ব্বস্ব পণ কর; ভগবদ্‌প্রীতির নীচেই ঐ প্রীতিকে আসন দাও, নিজ ইষ্টদেবতার রূপে ঐ দেশ-দেবতার উপাসনা কর; উহাতেই ঐহিক ও পারত্রিক দুই পরিত্রাণই লাভ হইবে। ইহাই নব্যভারতকে বঙ্কিমচন্দ্রের দীক্ষামন্ত্র-দান, উহাতেই ভারত-ভাগ্যের—ভারত-ইতিহাসের গতি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এক নূতন ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রকে "The greatest man of the nineteenth century" বলা যথার্থ হইয়াছে।

২

এইবার আমরা ঐ প্রেমের সাধনায় সিদ্ধিলাভ ও তাহার উপায়-নির্দ্দেশে বঙ্কিম-প্রতিভার আর একদিক আলোচনা করিব। প্রেমের সাধনা যদি ভাব-সাধনা বা অধ্যাত্ম-সাধনা হয়, তবে তাহা একরূপ আত্ম-সাধনা; আমি যে-প্রেমের কথা বলিতেছি, তাহা সেইরূপ আত্মপ্রেম নয়। এ প্রেমের একটা নির্দ্দিষ্ট পাত্রও যেমন আছে, তেমনই সেই পাত্রের হিত শুধু কামনা করাই নয়, বাস্তব হিত-সাধনই তাহার ব্রত। যে প্রেমিক, সে কার্য্যের দ্বারা একটা কিছুকে গড়িয়া তুলিতে চায়; কিছু গড়িতে হইলে, শুধুই ভাবের উচ্চতা বা আদর্শের বিশুদ্ধতা, কিম্বা একটা তত্ত্বগত সত্যের উদ্ধত অভিমান যে কিরূপ ক্ষতিকর তাহা গঠন-প্রয়াসী প্রেমিক মাত্রেই জানে। অতএব প্রেমিক একদিকে যেমন তাহার কামনাকে ছোট করিতে পারে না, তেমনই অপরদিকে, সেই কামনাকে সফল করিবার জন্য তাহাকে বাস্তবের সঙ্গে বোঝা-পড়া করিতেই হয়, অর্থাৎ সে একাধারে Idealist ও Realist। তাই বঙ্কিমচন্দ্র মনুষ্যত্বের উচ্চতম শিখরকেও যেমন অভ্রান্ত ও অবিচলিত দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, তেমনই দুর্ল্লঙ্ঘ্য বাস্তবকেও স্বীকার করিয়াছিলেন।

সকল সাধনাতেই সোপান-পরম্পরা আছে, কারণ প্রকৃতিকে—বাস্তবকে বশে আনিবার জন্য পুরুষের আত্মাকে অতি সাবধানে পদক্ষেপ করিতে হয়; আবার, ঐরূপ সাধনায় সর্ব্বপ্রথম সোপানটাই দৃঢ় ও সুনির্দ্দিষ্ট হওয়া চাই। এ দেশের মানুষকে নীচাশয়তা, স্বার্থপরতা, ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য হইতে মুক্ত করিবার জন্য সাধনার সেই প্রথম সোপানটি তিনি যে প্রজ্ঞাবলে আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি; তিনি সেই পুরাতন নিস্তেজ আত্মপ্রীতিকেই পর-প্রীতিতে পরিণত করিবার উপায় করিয়াছিলেন—সেই পরপ্রীতিকে একটা সহজ মনুষ্যসুলভ প্রেরণার পথেই ঊর্দ্ধাভিমুখী করিবার জন্য, তিনি প্রেমের যে আদি-মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন তাহা যেমন রূপময় তেমনই ভাবময়; তিনি তাহাকে এমন একটি পাত্রে স্থাপন করিয়াছিলেন যাহা একাধারে মৃন্ময় ও চিন্ময়—ব্যবহারিক বাস্তব হইয়াও পারমার্থিকের প্রতীক। এই পাত্র স্বদেশ ও স্বজাতি

এই মন্ত্রের সাধনপদ্ধতি-নির্দ্দেশেও তাঁহার যে দৃষ্টির পরিচয় পাই, তাহা শুধুই ঋষিদৃষ্টি নয়, তাহাই উৎকৃষ্ট কবিদৃষ্টি—যে দৃষ্টি একটা কিছু সৃষ্টি করে, বস্তুকে ভাবের অধীন করিয়া এবং ভাবকেও বস্তুর অধীন করিয়া জীবনকে নূতন করিয়া গড়িয়া দেয়। স্বজাতি-প্রেমের এই সংহিতারচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের সেই দৃষ্টির কথাই এইবার বলিব—ইহাই বঙ্কিম-প্রতিভার সর্ব্বাধিক গৌরব। ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ, এবং ভারতের জাতিসকলকে লইয়া একটি মহাজাতিও কল্পনা করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে এমন কল্পনার প্রয়োজন ছিল না, জাতি বা মহাজাতি বলিতে এখন যাহা বুঝায় তাহা ভারতীয় সংস্কারের বহির্ভূত। যুগধর্ম্মের প্রয়োজনে ঐ জাতি-চেতনার উদ্ভব হইয়াছে, এবং তাহাও মূলতঃ ও মুখ্যতঃ বাঙালীর সাধনায়, বঙ্কিমচন্দ্রের দীক্ষা-মন্ত্রে। এই জাতি-প্রেমকে বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তব-সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাই তিনি প্রথমেই মহাজাতি বা সর্ব্বভারতীয় একটা ভাবাদর্শকে সাধন-মন্ত্র করেন নাই। স্বজাতি প্রত্যক্ষ, মহাজাতি পরোক্ষ। সহসা মনে হইবে, ইহাতে আদর্শ ছোট হইয়া গেল; বস্তুতঃ একালের অতিমূর্খ, স্বার্থপর ও মিথ্যাচারী যাহারা তাহারাই বড় বড় আদর্শের দোহাই দেয়, ঐরূপ স্বজাতি-প্রেমকে অতি হীন প্রাদেশিকতার অপবাদ দিয়া পরমার্থের নামে স্বার্থেরই গৌরব বৃদ্ধি করে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যেমন প্রেমিক তেমনই সত্যনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া, কেবল আদর্শ লইয়া উন্মত্ত হন নাই—তিনি আদর্শকে যতদূর সম্ভব জীবনের বাস্তব করিয়া তুলিবার চিন্তাকেই সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ শুধুই ভারত-প্রেম নয়—জগৎ-প্রীতি, মানবপ্রেম; কিন্তু তিনি বাক্‌সর্ব্বস্ব বা ভাবসর্ব্বস্ব আদর্শবাদী ছিলেন না বলিয়া ঐরূপ সংকীর্ণ স্বজাতি-প্রীতিকেই সেই আদর্শে পৌছিবার একমাত্র সোপান বলিয়া নিঃসংশয় হইয়াছিলেন—ইহাই তাঁহার সাধক-বুদ্ধির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বঙ্কিমচন্দ্র সাক্ষাৎভাবে বাংলাদেশ ও বাঙালীর কথাই ভাবিয়াছিলেন, তার কারণ, প্রেমিকের পক্ষে তাহাই সত্য ও স্বাভাবিক; ধর্ম্মধ্বজী ভণ্ড, অথবা উচ্চভাবপন্থী ক্ষুদ্রাত্মার কথা স্বতন্ত্র। আরও কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র দেশের ঐরূপ মহাপুরুষদের কথা চিন্তা করেন নাই, সাধারণ মানুষের—অপরিণতচিত্ত দুর্ব্বল মানুষের—কথাই ভাবিয়াছিলেন। একেবারে ভারত-প্রেমে মাতোয়ারা হইলে তাঁহার নিজের গৌরববৃদ্ধি হয় বটে; সে গৌরবলাভ তাঁহার পক্ষে অতিশয় সহজ হইলেও তিনি তাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন,—ক্ষুদ্রাত্মা হইলে পারিতেন না। তিনি তাঁহার স্বকীয় মহান্ আদর্শ এবং মহামনীষার উচ্চভূমি হইতে সাধারণ দেশবাসীদের মনে ও হৃদয়ে অবতরণ করিয়াছিলেন; তিনি জানিতেন, যেহেতু বাঙালীমাত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র নয়, এবং সেই বাঙালীকেই সাধনার সোপানে আরোহণ করাইতে হইবে, অতএব বঙ্কিমচন্দ্রকেও সাধারণ বাঙালী হইতে হইবে। ইহারই নাম প্রেম; এই প্রেম যদি তাঁহার না থাকিত, তিনি যদি নিজেও সর্ব্বাগ্রে একজন বাঙালী হইতে না পারিতেন, তবে স্বজাতি-বাৎসল্যের যে মন্ত্রটি প্রচার করিয়া তিনি সারা ভারতের নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছিলেন—সেই মন্ত্র এমন প্রাণদ, এমন শক্তি-মন্ত্র হইতে পারিত না।

ঐরূপ স্বজাতি-প্রীতি যে দূষ্য নয় তাহার একটা কারণ, সেই প্রেম—প্রেম-মাত্রেই—যদি সত্যকার প্রেম বা বিশুদ্ধ হৃদয়ধর্ম্ম হয়, তবে তাহা সঙ্কীর্ণ বা নীচাশয় হইতে পারে না; উহার পরিধি আদৌ ক্ষুদ্র হইলেও বিস্তারের সীমা নাই। দ্বিতীয়তঃ, ঐরূপ ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে প্রেমের সাধনা আরম্ভ করিলেও অধোগতির কোন আশঙ্কা নাই—যদি তাহাতে চিত্তশুদ্ধি থাকে। ইহা একটি বড় কথা; যাহারা সাধনাহীন, ভাববিলাসী, তাহারা একথা বুঝিবে না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'ধর্ম্মতত্ত্বে' এই চিত্তশুদ্ধিকেই আদি প্রয়োজন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তারপর "The soul may be trusted to the end"। ইহাই ছিল তাঁহার অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস। এই স্বজাতি-প্রীতি ও ভারত-প্রেম তাঁহার চিত্তে কোন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে নাই—তাহার আরও কারণ এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র যে হিন্দুত্বের উপরেই, হিন্দু-সাধনার সার-তত্ত্বের উপরেই তাঁহার স্বদেশপ্রেমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাতে বাঙালীর ঐ স্বজাতি-প্রীতি কখনই ভারত-বিদ্বেষের হেতু হইতে পারে না। তিনি তাঁহার সেই হিন্দু-সংস্কারের বশেই ইহাও জানিতেন যে, বাঙালীর মত, অপরাপর প্রাদেশিক জাতিও তাঁহার ঐ মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে, কেহই ভারতের সেই ভাবগত মহাজাতি-চেতনা হইতে ভ্রষ্ট হইবে না; বরং ভারতের জাতি-সকলের মধ্যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা আরও বাড়িবে; ঐ স্বাতন্ত্র্য-চেতনাই ঐ বহুত্ব-বোধই—একটি গভীরতর আধ্যাত্মিক ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করিবে। সেই ঐক্যতত্ত্বই ভারতের মূল সাধন-তত্ত্ব; এই কথা যাহারা ভুলিয়াছে তাহারাই বিজাতির আদর্শে ভারতকেও একটা 'নেশন' করিয়া তুলিতে না পারিলে স্বস্তিবোধ করিতেছে না। তাহারা জানে না, ভারতের ঐরূপ 'নেশন' হইবার কোন প্রয়োজন নাই; নেশনত্ব ব্যতিরেকেও ভারতে ধর্ম্মরাজ্য ও একরাষ্ট্র স্থাপন করা সম্ভব। ভারত য়ুরোপ নয়, য়ুরোপের 'নেশন'-তত্ত্ব সেই অন্ধ একেশ্বরবাদেরই (Semetic Theology) একটা পোলিটিক্যাল প্রতিরূপ; উহার মূলেও সেই দারুণ বহুত্ব-বিদ্বেষ আছে; তাহারই কারণে, ধর্ম্মেও যেমন সাম্প্রদায়িক সংগ্রাম, রাষ্ট্রেও তেমনই জাতিতে জাতিতে নিত্য-সংঘর্ষ। বহু বা বিচিত্রের মধ্যে 'এক'-এর উপলব্ধি তাহার সংস্কার-বিরুদ্ধ—কোন একটা 'এক'ই সত্য, বাকি সবই অসত্য; এই জন্য ধর্ম্মবিশ্বাসেও উহারা যেমন অন্ধ, জাতি-প্রেমেও তেমনই অন্ধ। এই জন্যই বহুকে গুঁড়াইয়া এক করিতে হয়; যেখানে তাহা সম্ভব নয় সেখানে একের সহিত অপরের পার্থক্য-বোধ এমন প্রবল হইয়া থাকে। তাই য়ুরোপে একটা মহাজাতির প্রতিষ্ঠা হইতে পারে নাই—জাতিগুলাকে গুঁড়াইয়া এক করা যায় না যে! ভারতে এক্ষণে সেই চেষ্টা হইতেছে, বিভিন্ন জাতিগুলাকে গুঁড়াইয়া এক করিতে হইবে, তাহারই নাম 'নেশন'! জিনিসটা সম্পূর্ণ বিজাতীয়, অথচ সেই বিজাতিরা যাহা পারে নাই, তাহাতেই ভারতের শিক্ষা-বিদ্যা গরীয়সী হইতে চলিয়াছে। এ জ্ঞান নাই যে, ঐ 'নেশন'-ধর্ম্মই যদি মানিতে হয়, তবে ঐরূপ মহাজাতি—সোনার পাথরবাটির মতই হাস্যকর। ভারতের সাধনা সম্পূর্ণ বিপরীত; এখানে সকল পার্থক্যই বিশেষভাবে বরণীয়, কারণ ঐ 'বহু'র মধ্যেই

সেই 'এক'কে দেখিয়া আশ্বস্ত হইতে চায় ; উহা সেই একেরই মহিমা, উহাই পরম সত্য। অতএব স্বজাতি-সাধনায়, তথা রাষ্ট্রীয় মহাজাতি-কল্পনায়, ভারতের ঐ আদর্শ একটা বড় সহায় ; এমন আর কোথাও হইবার নয়। উহার দ্বারাই আধুনিক সর্ব্বধ্বংসী একাকারপ্রয়াসকেও সে রোধ করিতে পারিবে। ঐরূপ নেশন বা একজাতি-বাদ নয় জাতি সকলের পার্থক্য সত্ত্বেও এক 'মহাজাতি'র ("অবিভক্তং বিভক্তেষু") প্রতিষ্ঠা ভারতেই সম্ভব, সেই জাতীয়তাই ভারতের স্বধর্ম্মসঙ্গত ; জগতের চক্ষে তাহা অভাবনীয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ যে স্বাজাত্য-মন্ত্র ও তাহার সাধন-পদ্ধতি উহা খাঁটি হিন্দু-সংস্কার-প্রসূত, এই জন্যই তিনি তাহাতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের সেই প্রেম যে একটা তত্ত্ব বা ভাবমাত্রই ছিল না,—সেই প্রেম কত গভীর, এবং গভীর বলিয়াই কিরূপ সত্যদর্শী, এতক্ষণ তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভারতের সেই ঐতিহাসিক দশান্তর—সেই অভূতপূর্ব্ব সঙ্কটের কালে, বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ দিব্যদৃষ্টির বলে ভারতের সেই সনাতনকেই একটা যুগানুরূপ প্রযোজনায় নব-রূপ দান করিলেন ; পরে দেখাইয়াছি, তাঁহার সেই ধর্ম্মমন্ত্র যে প্রেম, তাহা ভাব-শরীরের প্রেম নয়—রক্তমাংসময় দেহের প্রেম ; তাহাকেই বৃহত্তর পাত্রে পাত্রান্তরিত করিয়া—দেহ-সংস্কারকে পরিশুদ্ধ ও উর্দ্ধমুখী করিয়া, তিনি জাতির জীবনসঙ্কট ও জাতির আত্মিক কল্যাণ—এই দুইয়েরই সমস্যা সমাধান করিয়াছিলেন। আরও দেখাইয়াছি, ঐ প্রেমের সাধনায় সবচেয়ে বড় কথা—প্রথম সোপানটি দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করা ; ভারতীয় সাধনায় মূলতত্ত্ব ইহাই। ভারতের নব-যুগ ও নবজীবনের সাধন-মন্ত্রকে বঙ্কিমচন্দ্র এমনই রূপে আবিষ্কার করিয়াছিলেন ; অতিদূর অতীত ও আসন্ন ভবিষ্যতের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া তিনি এমনি সামচ্ছন্দে ঐ ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

সকল শ্রেষ্ঠ প্রতিভা যে প্রেমের প্রতিভা তাহাতে সন্দেহ নাই ; বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাও প্রেমের প্রতিভা, কারণ নিছক কবি বা সাহিত্যিকের পক্ষে প্রতিভা যে বস্তুই হোক, জাতির প্রতিনিধি ও পরিত্রাতা যে মহাপুরুষ তাঁহার সবচেয়ে বড় শক্তি—ঐ প্রেম। এই প্রবন্ধের পূর্ব্বভাগে আমি বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-প্রতিভাকে পৌরাণিক প্রতিভার সমধর্ম্মী বলিয়াছি, অর্থাৎ তাঁহার সেই প্রতিভা ভারতীয় প্রতিভা ; কিন্তু এখানে তাহাতেও একটা নূতন শক্তি যুক্ত হইয়াছে—মাতৃ-মন্ত্রের প্রেম-শক্তি। এই মাতৃ-মন্ত্র বিশেষভাবে বাঙালীর, অতএব উহাতে ভারতীয় সংস্কা-রের উপরেও একটা গাঢ়তর রং লাগিয়াছে—সেই শাক্ত-তান্ত্রিক সাধনাই উহাকে একটা নব-রূপ দান করিয়াছে। যেন সেই মাতৃ-মন্ত্রের বলেই নবযুগের যুগ-রাক্ষসীকে —সে উন্মদা প্রকৃতি-শক্তিকে—বশে আনিয়া, তাহাকেও বরদাত্রী করা সম্ভব হইয়াছে। প্রকৃতি ও পুরুষের এই বিরোধ-নিরসনের নামই সমন্বয়সাধন ; বাঙালীর বিশিষ্ট সাধনাই ঐরূপ সমন্বয়ের অনুকূল। এ যুগের যুগ-সঙ্কটে উহাই যে একমাত্র উদ্ধার-মন্ত্র, এবং বাংলার বাহিরে আর কোথাও সেইরূপ সমন্বয়প্রতিভার জন্ম

হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ এইকালে অতিশয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গুজরাটী মহাত্মা ও তাঁহার হিন্দুস্থানী শিষ্য-প্রশিষ্যগণ ভিন্নপথে সেই সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া ভারতকে কি বিষম বিপ্লবের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন,—সেই নীতি কেমন নীতি, তাহার ফলাফল কিরূপ হইতে বাধ্য,—এইখানে তাহার বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে, নতুবা বঙ্কিম-প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া যাইবে না। আধুনিক কালে যে পলিটিক্‌স্‌-ই একমাত্র ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ মন্ত্র ও তাহার সাধনা সেই ধর্ম্মের এতই বিরোধী, যে গান্ধীবাদের তথ্য-পরিণাম একটু বিশেষ ভাবেই আলোচনা করিতে হইবে।

গান্ধী পন্থা যে বঙ্কিম-পন্থার সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহার কারণ, উহাতে কোথাও সেই সমন্বয় চিন্তা নাই; বাহিরের শক্তিকে—সেই প্রকৃতিকে—বশ করিয়া তাহাকেই আত্মার সহযোগিনী করিবার দৃষ্টি ও সৃষ্টি-প্রতিভা তাহাতে নাই। তাঁহার নিজের সেই আধ্যাত্মিক আদর্শ ঐ বাস্তবের এমনই বিরোধী যে, রাজনীতির সহিত তাহাকে মিলাইতে গিয়া, সেই আদর্শের পরাজয় ঘটিয়াছে—সেই বাস্তব, সেই ব্রিটিশ রাজশক্তিই প্রকারান্তরে জয়ী হইয়াছে। তাঁহার সেই আদর্শে—সেই ধর্ম্মমন্ত্রে, বাস্তবের—প্রকৃতির—সহিত বোঝাপড়া নাই বলিয়া, তিনি শক্তির সাধনায়, দেহকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া, আত্মাকেই একান্ত করিয়াছেন। উহা সৃষ্টিশক্তির বিরোধী একটা স্ব-গত ভাব-সত্য; তাই বাহিরের জগৎ উহাতে বশ মানে না। তথাপি বশ মানিবেই, এইরূপ দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের অভিমানে যদি তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়—বাস্তবই সেইরূপ বাধ্য করিতেছে, অর্থাৎ প্রকৃতি-শক্তিকেই মানিয়া লইতে হইতেছে ইহা স্বীকার না করিয়া, তাহার সহিত রফা করিতে হয়,—তাহা হইলে একটা মস্ত ফাঁকিকে চোখ না ঠারিয়া গত্যন্তর নাই, কারণ, অবস্থার চক্রে ঐরূপ রফা বা চুক্তি অপরিহার্য্য, রাজনীতির বাস্তব অধ্যাত্মনীতির আদর্শকে খাতির করে না। ঐ বাস্তবকে বশে আনিবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা পুরুষের পৌরুষ-শক্তি,—ন্যায়-অন্যায়-বোধের দৃপ্ত চেতনা; তাহাও প্রকৃতি-শক্তি, অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মেই মনুষ্যহৃদয়ে তাহার জন্ম হইয়াছে। এই শক্তিকেই অধ্যাত্মচেতনার সহিত যুক্ত করিতে হইলে যাহা চাই তাহার নাম—সেই প্রেম, যাহা সমাজরক্ষার জন্য, ধর্ম-রক্ষার জন্য, জাতির জীবন-রক্ষার জন্য অকাতরে সর্ব্বস্বার্থ বিসর্জ্জন করে। এই প্রেম—অহিংসার আধ্যাত্মিক প্রেম নয়, যাহার নামে প্রাণত্যাগ, ভূমিত্যাগ, ন্যায্য-অধিকার ত্যাগ করিতে হয়; আততায়ীর হৃদয় জয় করিবার জন্য তাহার লোভ ও জিঘাংসাকেই প্রশ্রয় দিতে হয়, অন্যায় ও অধর্ম্মের প্রতিকারে বিরত থাকিতে হয়। কারণ, আদর্শ বা উদ্দেশ্য যতই মহৎ হউক—ঐরূপ ধর্ম্মসাধনার পক্ষে যুক্তি যতই সূক্ষ্ম ও দৃঢ় হউক, উহাতে সিদ্ধিলাভ মনোরাজ্যেই হইতে পারে, বা হইয়া থাকে—সৃষ্টির অন্তর্গত মহানিয়মের একান্ত বিরোধী বলিয়াই উহা বাস্তবে জয়ী হইতে পারে না; উহাতে কেবল মানুষের 'বুদ্ধিভেদ'ই হয়—তাহার স্বভাবধর্ম্ম বিকৃত হইয়া পড়ে। অতএব, একটা আধ্যাত্মিক উচ্চভাবের ঘোরে এই যে প্রকৃতি-শক্তিকে সম্পূর্ণ

অস্বীকার করা, ইহাতে সেই সমন্বয়-চিন্তা নাই—ভারতীয় সাধনার সেই দিব্যদৃষ্টি উহাতে নাই। আজিকার এই যুগ-সঙ্কটে যে নীতি বা যে পন্থাই অবলম্বিত হউক, তাহাতে ভারতের সেই চিরাগত সাধনা ও সংস্কৃতি, এবং নবযুগের দাবি ও তাগিদ—এই দুইয়ের সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য চাই; তৎপরিবর্ত্তে একটা ভাবগত আদর্শকে একান্ত করিয়া—ইতিহাস, প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও মানুষের সহজ মানবীয় ধর্ম্মকে অস্বীকার করিয়া—যে পন্থা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার ফলে যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। সমন্বয়ের পরিবর্ত্তে দ্বন্দ্বই বৃদ্ধি পাইতেছে, একদিকের আতিশয্য অপরদিকে একটা বিপরীত আতিশয্যকে উগ্র করিয়া তুলিতেছে; অহিংসার অবাস্তব আদর্শ গভীরতর বাস্তব হিংসার জন্ম দিতেছে; আত্মার অমানুষিক বীরধর্ম্ম অনাত্মার চরম কাপুরুষতায় পর্য্যবসিত হইতেছে; সমাজতান্ত্রিক Utopia-র সেই গান্ধী-পরিকল্পনা বৈজ্ঞানিক যুগধর্ম্মের পরিপন্থী বলিয়া সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং যেন তাহারই তীব্র প্রতিবাদস্বরূপ ঠিক বিপরীত নীতি অবলম্বিত হইতেছে; রাষ্ট্রনীতিও গান্ধীবাদ ও গান্ধীধর্ম্মকে—অহিংসা, গণতন্ত্র, ধনসাম্য, দারিদ্র্যবরণ প্রভৃতিকে—ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক, ইহার জন্য গান্ধীশিষ্যগণকে গালি দেওয়ার অর্থ—সেই বাস্তববুদ্ধিবিবর্জ্জিত গান্ধীবাদকে অন্ধভাবে ধরিয়া থাকা, তাহাকেই বাস্তবে পরিণত করিতে হইবে বলিয়া মহাভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠা; অন্ধভক্তগণ এখনও তাহাই করিতেছে।

৩

মানুষের প্রেম বলিতে প্রাণের ধর্ম্মই বুঝায়, তাহা ঐরূপ আত্মার ধর্ম্ম নয়। যাহারা আত্মধর্ম্মী তাহারা একরূপ কঠোর নীতিবাদী বা moralist;—মানুষের দুর্ব্বলতাকে তাহারা মার্জ্জনা করে না, তাহার প্রাণটার কথা ভাবে না। বুদ্ধও অতি কঠোর নীতিবাদী ছিলেন, তথাপি মানুষের দেহদশার প্রতি তাঁহার করুণার অন্ত ছিল না, তার কারণ, তিনি ঐ 'আত্মা'কেই মানিতেন না, তাই তিনি আত্মধর্ম্মীদের মত নির্ম্মম ছিলেন না। প্রেম পরের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করে—নিজ আত্মার কল্যাণ-চিন্তাও করে না; কিন্তু ঐ আত্মধর্ম্মীরা আত্মার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য পরের প্রাণরক্ষাকে তুচ্ছ বোধ করে। যাহারা এইরূপ নীতি-বাদী moralist, যাহারা মানুষের সবচেয়ে বড় সঙ্কটকেই গ্রাহ্য করে না, তাহারা মানুষের জন্য মানুষের মত কাঁদিবে কেন? তাহা করিতে হইলে হিংসার বশবর্ত্তী হইতে হয়, অর্থাৎ আত্মার অকল্যাণ হয়, আত্মা ছোট হইয়া যায়; পরের প্রাণরক্ষাই বড় নয়, নিজ আত্মার মহিমাবৃদ্ধিই বড়; পরকেও তাহাই করিতে বলে, অর্থাৎ কেহ কাহারও মুখাপেক্ষা করিবে না, প্রত্যেকেই স্ব স্ব মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবে। ঐরূপ সাধনায়, প্রকৃতপক্ষে 'আত্ম' ছাড়া 'পর' বলিয়া কেহ নাই, তাই প্রেম বা পরপ্রীতির কথাই উঠিতে পারে না। ইহার উত্তরে যে সকল যুক্তি ও সূক্ষ্মতত্ত্বের অবতারণা করা হয়, তাহা আমরা জানি; সেইরূপ তর্ককে ইংরাজীতে sophistry বলে; কোন হৃদয়বান মানুষ তাহাতে আশ্বস্ত হইতে পারে

না ; ভারতের জনসাধারণ হয় বটে, তার কারণ, বহুশতাব্দীর রক্তহীন, মনুষ্যত্ব-হীন জীবন তাহাদিগকে ঐ সংস্কারে অভ্যস্ত করিয়াছে। ঐ অহিংসা-ধর্ম্মে যাহারা আত্মার উৎকণ্ঠা নিবারণ করিতে পারে তাহারা প্রায় সকলেই হৃদয়হীন, তর্ককুশল, স্বার্থপর ভাববিলাসী অ-মানুষ—এক্ষণে দিকে দিকে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আমি বলিয়াছি, ইহাদের মানব-প্রেম একরূপ আত্ম-প্রেম ; ইহারা যখন লোক-সেবক বা লোকগুরু হয়, তখন ইহারা মানুষকে মানুষ-হিসাবে শ্রদ্ধা করে না, তাহার প্রাণের ক্ষুৎপিপাসাকে, তাহার দেহদশাঘটিত দুর্ব্বলতাকে কশাঘাত করে ; প্রাণভয়ভীত মানুষের প্রাণরক্ষা না করিয়া তাহাকে ধমক দেয়—চুলের মুঠি ধরিয়া ঐ আধ্যাত্মিক আদর্শের উচ্চদণ্ডে তাহাকে ঝুলাইয়া দেয় ; ঝুলিতে না পারিলে বা না চাহিলে ধিক্কার দেয়, মরিয়া গেলে কোন দুঃখ করে না। তাই বলিয়াছি—ইহা প্রেম নয় ; ইহা সেই পর-প্রীতি নয় যাহা মানুষের সহিত মানুষের প্রাণের সম্বন্ধ স্থাপন করে। সেই পর-প্রীতিকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্বাজাত্যসাধনার প্রথম সোপান করিয়াছিলেন—সেই সহজ মানবীয় হৃদয়বৃত্তির পথেই প্রথমে স্বজন ও স্বজাতির উদ্ধার, পরে তাহা হইতেই হৃদয়ের ক্রমিক বিস্ফার, এবং সর্ব্বশেষে নিজ আত্মার মুক্তিকেও সুনিশ্চিত করিয়াছিলেন।

আসল কথা, গান্ধী নিজেরই মনঃকল্পিত একটা চিন্তাবস্তুকে কেবলমাত্র স্বকীয় ব্যক্তিত্বের জোরে ভারতের জনগণের উপরে চাপাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন, তখনকার মত তাহাতে আশ্চর্য্য ফললাভ হইয়াছিল। অতিশয় অশিক্ষিত ও অন্ধভক্তিপরায়ণ, রাজনীতির চেতনামাত্রহীন নিম্নশ্রেণীর জনারণ্য—এবং অতিশয় কাপুরুষ, স্বার্থপর ও চরিত্রহীন সেই প্রাচীন হিন্দু-সমাজ ঐ ধর্ম্মমন্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিল, তাহাদের মধ্যে যে অভূতপূর্ব্ব সাড়া জাগিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ তামসিক। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক এই ভয়ই পাইয়াছিলেন, তাই তিনি ঐ সমাজের জন্য ঠিক বিপরীত মন্ত্রই নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। ভারতের ঐতিহ্যের, ভারতবাসীর রক্ত-সংস্কারের বিরোধী ঐ পাশ্চাত্ত্য রাজনীতি যে ভারতবাসীর জীবনে সত্যনীতি হইতে পারে না, তাহা তিনি যেমন এক মুহূর্ত্তেই বুঝিয়াছিলেন, তেমনই, তাঁহার সেই দৈবী প্রতিভার বলে ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, ঐ রাজ-নীতিকে ভারতীয় সংস্কারে হজম করিয়া লইতে হইলে, কোন অধ্যাত্মনীতির সহিত গোঁজামিল চলিবে না—একেবারে মানবধর্ম্মনীতিকেই আশ্রয় করিতে হইবে, তাহাকে প্রাণধর্ম্মের সহিত যুক্ত করিতে হইবে ; তবেই তাহা কেবল একটা নীতি নয়—শক্তিরূপে এ জাতির জীবনে ক্রিয়াশীল হইবে ; অর্থাৎ ঐ রাজনীতিকে মানব-হৃদয়ের সহজ ও উৎকৃষ্ট বৃত্তির সহিত যুক্ত করিয়া সেই হৃদ্‌যন্ত্রটাকেই বিস্ফারিত ও বলবান করিতে হইবে,—আধ্যাত্মিক বায়ুবৃদ্ধি, বা আত্মার উদরাধ্মান করিলে চলিবে না। তাই তিনি ঐ প্রেমকে—ঐ স্বজাতি-প্রীতিকেই অসীম শক্তির উৎসরূপে বরণ করিয়াছিলেন। উহাতেই সকল বিরোধের সমন্বয় হয় ; কোন বিষয়ে রফা করিবার প্রয়োজন হয় না ; সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সংঘর্ষও

তাহাতে লোপ পায়,—ঐ প্রেমের প্রবল প্রবাহে সকল ক্ষুদ্রতা, সকল দেনা-পাওনার হিসাব, এবং সকল সন্দেহ ও অবিশ্বাস আপনা হইতে ভাসিয়া যায়, তাহার জন্য পৃথক তপস্যা করিতে বা নিয়ত ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতে হয় না। তিনি ঐ প্রেমের তত্ত্ববিচার ও সাধনপদ্ধতির নির্দ্দেশ যেমন করিয়াছিলেন, তেমনই, আমি যাহাকে পৌরাণিক রীতি বলিয়াছি সেই রীতিতে কাব্যরচনা করিয়া আরও সাক্ষাৎভাবে তাহাকে হৃদয়ে উদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্ত্র যে কত অব্যর্থ, তাহার একটা জলন্ত প্রমাণও আমরা এইকালে পাইয়াছি—অন্তরের অন্তরে সেই মন্ত্রেই দীক্ষিত হইয়া আর একজন মহাসাধক-বীর, বাঙালী সুভাষচন্দ্র সেই প্রেমের অসীম শক্তিবলে ভারতের বাহিরে একটা ক্ষুদ্রতর ভারত-সমাজে, সকল ভেদ, সংশয়, সংকীর্ণতা ঘুচাইয়া যে যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়াছিলেন তাহার প্রভায় সর্ব্বভারত আলোকিত হইয়াছে। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান তিনি যে ভারতের ভিতরে করিতে পারেন নাই, তাহারও কারণ ঐ গান্ধীবাদের বিষম বিরুদ্ধতা। অতএব, ঐ প্রেম যে একটা কত বড় শক্তি এবং উহাই যে সত্যকার সৃষ্টিশক্তি, তাহাতে সন্দেহ কি?

এই সৃষ্টিশক্তি গান্ধীর ছিল না; গান্ধী যদি মহাপুরুষও হন তথাপি তাঁহার সেই প্রেম ছিল না—যে-প্রেমে প্রকৃতি-পুরুষ, দেহ-আত্মা, জীব ও ভগবানে একত্ব-স্থাপন হয়। তাঁহার মত এমন নির্ম্মম আত্মপ্রতিজ্ঞ পুরুষ ধর্ম্ম-গুরুদের মধ্যেও বিরল। কবির—স্রষ্টার—যে-প্রেম, আমি বঙ্কিমচন্দ্রকে যে-প্রেমমন্ত্রের ঋষি ও কবি বলিয়াছি, সেই প্রেম তাঁহার ছিল না; আবার, বিবেকানন্দের মত অধ্যাত্ম-মহান্ পুরুষের সেই বিপুল হৃদয়াবেগও তাঁহার ছিল না। সেইরূপ প্রাণ-শক্তির অভাব তিনি এক প্রকার will বা মনঃশক্তির দ্বারা পূরণ করিয়াছিলেন; সে শক্তি মানুষকে hypnotise বা সম্মোহিত করিতে পারে—উদ্বোধিত করিতে পারে না। করুণাকেও একরূপ স্তম্ভিত করিয়া তিনি অহিংসার সিদ্ধসাধক হইতে পরিয়াছিলেন; লক্ষ লক্ষ নরনারীর পৈশাচিক হত্যা ও নির্য্যাতন তাঁহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই—তর্কের দিক দিয়া যেমনই হোক, বাস্তবের দিক দিয়া ইহা সত্য। যদি সেই করুণা থাকিত তবে নিশ্চয় তিনি ব্যাকুল হইয়া চিন্তা করিতেন—ধর্ম্ম ও পলিটিক্সের ঐ অবৈধ মিলনে কোথায় একটা বিরাট ভুল রহিয়াছে। কিন্তু তিনি সে চিন্তা করেন নাই; মানুষ মরুক, দলে দলে উৎসাদিত হউক, তথাপি তিনি জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য সেই নূতন ধর্ম্মমন্ত্রের এক্সপেরিমেণ্ট হইতে নিবৃত্ত হইবেন না। যদি তাঁহার ঐ মন্ত্র নিষ্ফল হয়, তবে জগৎ ধ্বংস হইবে, তাহাতেও ঐ মন্ত্রের সত্যই প্রমাণিত হইবে—ঐ ধর্ম্ম লঙ্ঘন করার পাপে মনুষ্যজাতি বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল, জগতের এই জন্মগত মৃত্যু-ব্যাধির ঔষধ তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন; এতকাল কোন অবতার, কোন গুরু যাহা পারেন নাই, তিনি তাহা পারিয়াছেন। তাই যুগ, জাতি বা দেশের জন্য তিনি চিন্তা করেন নাই, তিনি সারা জগৎ এবং সমুদয় ভবিষ্যৎকালের জন্য ঐ মন্ত্রটি প্রচার করিয়াছিলেন। ঐ মন্ত্র গ্রহণ করিলে মানুষের সমাজে আর হিংসা-হানাহানি, যুদ্ধ-

বিগ্রহ থাকিবে না, অহিংসার মহাশান্তি বিরাজ করিবে—সৃষ্টির নিয়ম বাতিল হইয়া যাইবে।

ঐ "সৃষ্টির নিয়ম" সম্বন্ধেও এইখানে কিছু বলিব, এবং প্রথমেই একটা ভিন্ন ধরণের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যাটিকে যতদূর সম্ভব সহজ ও সরল করিবার চেষ্টা করিব। মানব-জীবনে প্রকৃতির নিয়মকে অর্থাৎ প্রকৃতি-শক্তির লীলাকে, সেই প্রকৃতির সহিত একাত্ম হইয়াই যে প্রকৃতি-তান্ত্রিক কবি পূর্ণদৃষ্টিতে দেখিতে পারিয়াছিলেন,—সেই মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ারের ট্র্যাজেডিগুলির—অর্থাৎ প্রকৃতির নগ্নমূর্ত্তি-উদ্‌ঘাটনকারী সেই নাটকগুলির—তাৎপর্য্য সম্বন্ধে, একজন খ্যাতিনামা ইংরেজ সমালোচক লিখিয়াছেন—

"Doctrine, theory, metaphysics, morals—how should these help a man at the last encounter? All doctrines and theories concerning the place of man in the universe, and the origin of evil are a poor and partial business compared with that dazzling vision of the pitiful estate of humanity which is revealed by tragedy……Here we have to do with an earthquake, and good conduct is of no avail. Morality is denied; it is overwhelmed and tossed aside by the inrush of the sea……"

"They (these tragedies) deal with greater things than man—with powers and passions, elemental forces and dark abysses of suffering, with the central fire, which breaks through the crust of civilization, and makes a splendour in the sky above the blackness of ruined houses."

["সাম্প্রদায়িক মতবাদ, দার্শনিক সিদ্ধান্ত, ধর্ম্মনীতি—মানুষের সেই অন্তিম সঙ্কটে এ সকল কোন্ কাজে লাগিবে? ট্র্যাজেডি-জাতীয় নাটকে মানুষের চরম-দুর্গতির যে ভীষণোজ্জ্বল দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হয়, তাহার সম্মুখে ঐ সকল তত্ত্ব—সৃষ্টির সহিত মানুষের সম্বন্ধ, অমঙ্গলের উৎপত্তি প্রভৃতির ব্যাখ্যা—নিতান্ত তুচ্ছ ও অসম্পূর্ণ বলিয়াই মনে হয়।…এখানে তো কোন অন্যায়, অসঙ্গতির প্রশ্নই উঠে না, এ যেন একটা ভূমিকম্প; কোন ধর্ম্মাধর্ম্মই মানে না—সকল ধর্ম্ম, সকল নীতি বিপুল সমুদ্র-বন্যায় ডুবিয়া যায়, সেই তরঙ্গ-তাড়নে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।…

"এই ট্র্যাজেডিগুলার বিষয়বস্তু মানুষের কাহিনীই নয়, তার চেয়ে অনেক বড়, যথা,—অন্ধ প্রবৃত্তি ও দুর্দ্দমনীয় আবেগ; প্রাকৃতিক শক্তির প্রচণ্ডলীলা; দুঃখের অতল অসীম অন্ধকার; এবং সৃষ্টির অন্তর্দ্দেশের সেই অগ্নিশিখা—যাহার আকস্মিক উৎপাতে, ধরণীপৃষ্ঠের মতই মনুষ্য-সমাজের শোভনসুন্দর সুদৃঢ় আচ্ছাদনখানি নিমেষে টুটিয়া ফাটিয়া যায়, এবং সেই অনলোদ্‌গারে ভস্মীভূত অগণিত কুটীরের অঙ্গাররাশির উপরে ঊর্দ্ধাকাশ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে।"]

প্রকৃতির অন্ধশক্তি ও তাহার অপ্রতিহত লীলার এই যে চিত্র শেক্‌স্‌পীয়ার চিত্রিত করিয়াছেন তাহা অতিশয় সত্য; উহাই বাস্তব, উহাই নিয়তি। তথাপি উহাও একটা দিক—অপর দিক সম্বন্ধে পরে বলিব। কিন্তু লেখক এই প্রসঙ্গে আরও যাহা বলিয়াছেন তাহাই উপস্থিত অনুধাবনযোগ্য, যথা—

"Because he is a poet and has a true imagination, Shakespeare knows how precarious is man's tenure of the soil, how deceitful are the quiet and orderly habits and his prosaic speech. At any moment by the operation of chance or fate these things may be broken up, and the world given over to the forces that struggled in chaos."

["যেহেতু শেক্‌স্‌পীয়ার একজন কবি, উৎকৃষ্ট কল্পনাশক্তির অধিকারী, অতএব তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মানুষ যে-ভূমির উপর ঘর বাঁধিয়াছে সেই ভূমিতে তাহার দখলী-স্বত্ব কত অনিশ্চিত ; সে যে-সকল বুদ্ধিপূর্ণ বচন এবং শান্ত ও সংযত আচারের পক্ষপাতী তাহা কত মিথ্যা। ঐরূপ জীবনযাত্রা যে কোন মুহূর্ত্তে অদৃষ্টের আঘাতে অথবা একটা দৈব-ঘটনায় ভাঙ্গিয়া যাইবে, এবং সংসার আবার সেই অন্ধ-শক্তির লীলাস্থল হইয়া উঠিবে।"]

ইহাই 'সৃষ্টির নিয়ম' সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির কবি-দৃষ্টির সাক্ষ্য ; ঐ সাক্ষ্য আমাদের হিন্দু-দর্শনের বিরোধী নয়—ঐরূপ কবিদৃষ্টিতে না হউক, সাধকগণের যোগদৃষ্টিতে প্রকৃতির ঐ মূর্ত্তি ধরা দিয়াছে। ঐ প্রকৃতি মিথ্যাভূতা হইলেও সনাতনী ; উহার ঐ লীলাও অনাদি—"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি"। সৃষ্টিকে মানিলে, উহা অনন্তও বটে, অন্ততঃ যতদিন সৃষ্টি আছে ততদিন ঐ শক্তির ঐ লীলাও আছে। উহা যে কেমন, শেক্‌স্‌পীয়ার হইতে তাহার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছি। হিন্দু উহাকে যেমন মানিয়াছে, তেমনই ঐ শক্তির অনুকূলে ও প্রতিকূলে দুইপ্রকার সাধনাই করিয়াছে। সাধারণ মানুষ ঐ শক্তির নিকটে বলির পশুর ন্যায় দুর্ব্বল ও অসহায়—তাই হিন্দু ঐ শক্তিকে স্বীকার করিয়াই মানুষের স্বভাব ও সংস্কারের অনুরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছে। এই প্রকৃতিকে 'মায়া' বলিয়া অস্বীকার করিবার যে দুর্দ্ধর্ষ আত্ম-সাধনা, তাহাই ভারতকে প্রেমহীন, প্রাণহীন করিয়া—সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনকে গৌণ, এবং আত্ম-চর্চ্চাকেই মুখ্য করিয়া—প্রায় হাজার বৎসর এই জাতিকে জীবন্মৃত করিয়া রাখিয়াছে। হিন্দু সেই আর্য্যধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল—বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবেই এইরূপ "অনার্য্যজুষ্টং অস্বর্গ্যং অকীর্ত্তিকরম্‌" অপধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছিল ; অতঃপর সেই জীবন-বিমুখ নিবৃত্তিমূলক সন্ন্যাস-বৈরাগ্যই তাহার স্নায়ুশিরা শীতল করিয়া, পরলোকে আত্মার সদ্‌গতির লোভে ইহলোকে দেহের দুর্গতি ও দাসত্বকে বরণীয় করিয়াছিল। সেই মধ্যযুগীয় সন্ন্যাসকেই একটা নূতন নাম দিয়া, এবং তাহাতে—এবার কেবল পরলোকে নয়—ইহলোকেও সদ্‌গতির আশ্বাস দিয়া, গান্ধী ঐ যে 'অহিংসা'-নামক ধর্ম্ম অধিকার-নির্ব্বিশেষে সকলের পক্ষে সমান পালনীয় করিয়াছেন, উহা সেই সনাতন ধর্ম্ম নয়—মধ্যযুগীয় ধর্ম্মেরই একটা নব-সংস্করণ। উহাতে metaphysics-এর morality আছে, প্রেমের humanity নাই ; এজন্য উহাও একটা poor and partial business। ঐ যে "central fire" এবং তজ্জনিত আকস্মিক ভূমিকম্প ও জলপ্লাবন—তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াও তিনি গ্রাহ্য করেন না, যেন চোখ বুজিলেই তাহাকে উড়াইয়া

দেওয়া যায়। সেই "prosaic speech" ও "orderly habits" তাঁহারও সাধনার প্রধান অঙ্গ; একপ্রকার কঠিন হিসাব-বুদ্ধি আছে—Imagination-এর লেশমাত্র নাই, এবং শেষ পর্য্যন্ত ঐ 'morality'ই একমাত্র আশ্রয়।

৪

এইবার, এযুগে প্রকৃতি-শক্তির সহিত হিন্দুর সেই সাধনাই কোন্ পন্থায় বোঝা-পড়া করিয়াছে, এবং তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙালী-প্রতিভাই কি কারণে জয়যুক্ত হইয়াছে—তাহারই শেষ বিচারণা করিব। আমি বলিয়াছি, হিন্দু ঐ প্রকৃতি-শক্তিকে স্বীকার করিলেও তাহার নিকটে আত্মসমর্পণ করে নাই—সন্ধি-স্থাপন করিয়াছে। দেহের সহিত আত্মার, ইহলোকের সহিত পরলোকের বিরোধ মিটাইবার জন্য সে প্রথম হইতে যে একটি মন্ত্রলাভ করিয়াছিল, যুগে যুগে তাহারই সাধনায়, জ্ঞানকে যেমন, প্রেমকেও তেমনই প্রসারিত করিয়াছে। আমি পূর্ব্বে একস্থানে বলিয়াছি, বেদবাদীদের সেই যজ্ঞধর্ম্মই উত্তরোত্তর নূতনতর মহত্তর অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছে, সেই যজ্ঞতত্ত্ব ভগবদ্গীতায় যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই পরবর্ত্তীকালে হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব হইয়া আছে। উহার নাম—সর্ব্বভূতহিতের জন্য আত্মসুখ-বিসর্জ্জন; উহার দ্বারা ব্যক্তির বা আত্মার কল্যাণও যেমন হইবে, তেমনই সৃষ্টি-রক্ষাও হইবে। প্রকৃতি-শক্তির সহিত পুরুষ-আত্মার এই যে সম্বন্ধ-স্থাপন ইহাই সেই সমন্বয়। কিন্তু গীতার ঐ যজ্ঞধর্ম্মে আত্মতত্ত্বই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে; এইজন্য মধ্যযুগের প্রকৃত-বিমুখ অধ্যাত্মবাদী ধর্ম্মগুরুগণ গীতার সেই দিকটার উপরে জোর দিয়া যে সকল ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে মানুষের হিতসাধনের নামে আত্মহিত-সাধন, অর্থাৎ মুক্তিসাধনাই মুখ্য হইয়াছে। গান্ধীও সেইরূপ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ভারতের পরবর্ত্তী ইতিহাস কাহারও অজ্ঞাত নয়, মানুষ ক্রমেই দুর্ব্বল ও ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িয়াছে—সে একই কালে জীবনকে অবিশ্বাস করে, অথচ ভোগ করিতেও লোলুপ। তাহাতে মানুষের দুঃখ ক্রমেই বাড়িয়াছে; শেষে বাস্তবের কঠিনতম পীড়নে মানুষ নিজেরই দেহ-চেতনায় অপূর্ব্ব বস্তুর সন্ধান পাইল, তাহার নাম Humanism বা মানব-প্রীতি, মানবপূজা; ঐ প্রেম আদৌ অধ্যাত্ম-সংস্কার-বর্জ্জিত, কিন্তু তাই বলিয়া নিছক দেহসংস্কার বা রক্তমাংসের প্রবৃত্তিও নয়। দেহের সহিত আত্মার পূর্ণ মিলনেই উহার জন্ম হইয়াছে। সেই মিলন-মোহানায় দেহের আর্ত্ত-কলস্বর আত্মার অকূল সাগরে স্তব্ধ হইয়া যায়; আবার, দেহের আলিঙ্গন-পাশে আত্মাও আত্মহারা হইয়া পড়ে। বিষ এমনই করিয়া অমৃতে পরিণত হয়। ঐ দেহ-আত্মার মিলনভূমির নাম—হৃদয়, সেই হৃদয়ের বিস্ফারকেই প্রাণশক্তি বলে, তাহারই নাম প্রেম। বাস্তব-জীবনের ক্ষেত্রে উহাই প্রকৃতি ও পুরুষের সামঞ্জস্য—উহাতেই সকল বিরোধের সমন্বয় হয়। আমি এই আলোচনার প্রায় সর্ব্বত্র—প্রকৃতি-পুরুষ, পুরুষ-আত্মা ও প্রকৃতি-শক্তি এইরূপ দার্শনিক পরিভাষা ব্যবহার করিতেছি, তার কারণ, ঐরূপ ভাষায় ব্যাখ্যা করিলে, যখন যে প্রসঙ্গই

আসুক না কেন, একটা মূল-তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাহাতে সিদ্ধান্তগুলি আরও সুদৃঢ় হইয়া উঠে। তাহা ছাড়া, এই ভারতীয় সমস্যার বিচারে ভারতীয় চিন্তা-পদ্ধতিই প্রশস্ত। আমি যে বার বার ঐ ভাষাই ব্যবহার করিতেছি তাহাতে আর একটা সুবিধা হইবে—ঐ শব্দগুলির অর্থ আর অস্পষ্ট থাকিবে না, তত্ত্বটাও সুপরিচিত হইয়া উঠিবে।

অতএব সৃষ্টির যে ভীষণা মূর্ত্তি শেক্‌সপীয়ার এমন করিয়া দেখাইয়াছেন তাহাও যেমন সত্য, মানুষের এই প্রাণ-শক্তির মহিমাও তেমনই সত্য। উহা কোনরূপ Metaphysic বা Morality নয়—মহাপ্রাণের মহাস্ফূর্ত্তি। উহা মানুষকে তাহার দেহ-ধর্ম্ম ত্যাগ বা পীড়িত করিতে বলে না, তাহার পাপ ও দুর্ব্বলতাকে তিরস্কার করে না, মানুষের প্রাণ না বাঁচাইয়া তাহার আত্মার সদ্‌গতি কামনা করে না। ঐ প্রেমের নদীতেই আত্মার মুক্তিস্নান হয়, তখন হিংসা-অহিংসার সংস্কারই থাকে না। অন্যায়, অধর্ম্ম ও অকল্যাণের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ, তাহা দেহের ক্ষেত্রেই করিতে হইবে, কিন্তু সেজন্য আত্মার ক্ষতি হইবে কেন? পরকে—সমাজকে, সৃষ্টিকে—রক্ষা করিবার যে মহতী প্রেরণা, তাহাতে বিদ্বেষ থাকিতে পারে না, তাই যুদ্ধ করিবার কালেও তাহাতে প্রাণীহত্যার পিপাসা নয়, ন্যায়-ধর্ম্মের উদ্দীপনা থাকে। ধর্ম্মযুদ্ধে আত্ম-পর-ভেদ লুপ্ত হইয়া যায়—ইহার প্রমাণেরও অভাব নাই। আবার, ঐ যে স্ব-সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য অত্যাচারী পর-সমাজকে আক্রমণ, উহাতেও সর্ব্বমানুষের পক্ষ অবলম্বন করা হয়, কারণ, ঐরূপ অধর্ম্ম-নিবারণের দ্বারা সর্ব্ব-মানবের কল্যাণসাধন হয়। এইজন্য উহাই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্ম্ম। উহার জন্য যে আত্মহারা প্রেম ও চিত্তশুদ্ধি চাই, তাহাকেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্বাজাত্য-সাধনার মূলমন্ত্র করিয়াছিলেন।

ঐ প্রেম আত্মহারা বটে; আত্মহারা অর্থে—যে প্রেমে আত্ম-চিন্তা থাকে না, অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রেম; কিন্তু আত্মহারা বলিতে আরও কিছু বুঝায়—একপ্রকার উন্মাদনা, বা প্রবল ভাবাবেগ। কিন্তু এই প্রেম অবিমিশ্র ভাবাবেগ নয়; যে-আবেগ জ্ঞানহীন তেমন আবেগকে একটা বড় হৃদয়বৃত্তি বলা যায় না, তাহা দুর্ব্বল ভাব-কাতরতা কিংবা দুর্দ্দমনীয় কামনা মাত্র। তাহা প্রেম নয়—একটা রিপু। কিন্তু এই প্রেমে ভাবাবেগের সহিত আত্মার আকুতি আছে, একটা বড়-কিছুর প্রতি সজ্ঞান শ্রদ্ধা আছে, অর্থাৎ Idealism আছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে বাঙালী-চরিত্রের দোষ ও গুণ দুই-ই উত্তমরূপে অবগত ছিলেন, এবং সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়াই স্বজাতিকে ঐ মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার প্রজ্ঞার পরিচায়ক। গুরু যেমন ব্যক্তিবিশেষের জন্য আধার-অনুযায়ী মন্ত্রের ব্যবস্থা করেন, জাতিবিশেষের জন্যও তেমনই ব্যবস্থা করিতে হয়। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রও বিশেষ করিয়া বাঙালীর মন্ত্র, উহার সাধনায় যে আদর্শগত ভাবোন্মাদনা আছে, তাহা বাঙালী-জাতির সহজাত। বাঙালীর চরিত্রে বহু দোষ, বহু দুর্ব্বলতা আছে, সে সম্বন্ধে সে নিজেই যত সজ্ঞান তেমন আর কেহ নহে; স্বজাতির নিন্দায় সে সর্ব্বদা মুখর হইয়া উঠে। ইহারও কারণ—এমন

আত্ম-সচেতন জাতি আর নাই। তাহার *চরিত্র-শক্তি না থাক্—মস্তিষ্কের* তীক্ষ্নতা আছে, তাই একদিকে প্রবৃত্তির দুর্ব্বলতা বা নিশ্চেষ্টতা এবং অপরদিকে ঐ সজাগ বোধ-শক্তি, এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে দিশাহারা হইয়া সে যেমন অবস্থার দাস হইয়াই থাকে, তেমনই নিজের জাতিকে গালি দিয়া কতকটা যেন সান্ত্বনা পায়; ইহাও তাহার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বাঙালীকে তাহার বহুদোষের মধ্যে একটা দোষের জন্য প্রায়ই নিন্দা করা হয়—অতিরিক্ত ভাব-প্রবণতা। উহাও তাহার একটা বড় দোষ, তাহা সত্য। কিন্তু ঐ ভাব-বাষ্পেরও একটা মূল্য আছে—ঐ বাষ্পই যখন একটা আদর্শের চাপে হৃদয়ের 'বয়লার'-বদ্ধ হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়ের যন্ত্রগুলাকে একমুখে চালিত করে, তখন তাহার গতিবেগে সে বড় বড় অসম্ভবকে পার হইয়া যায়; তাহার প্রমাণ আধুনিক ইতিহাসে বাঙালী দিয়াছে, আরও দিবে। ঐ গান্ধী-ধর্ম্মকে যাহারা নিষ্ঠার সহিত পালন করে, তাহাদের—ভাবপ্রবণতা দূরে থাক—ভাবুকতা বা কল্পনাশক্তিও নাই, তাহাদের জীবনে কোন বড় ভাবের উৎপাত নাই। বাঙালী যে গান্ধীমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল তাহাও সেই স্বভাবসুলভ ভাবোন্মাদনার বশে—উহার মূলমর্ম্ম বুঝিয়া লইবার অবকাশ সে পায় নাই। তাহার সেই ধর্ম্ম-পালনে কোন হিসাব-বুদ্ধি ছিল না—ছিল একটা অত্যুচ্চ, অবাস্তব রোমান্টিক আদর্শের আকর্ষণ। তাই বাঙালী গান্ধীর আদেশ পালন করিয়া যে ক্ষতি নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছে, ভারতের আর কোন জাতি তাহা করে নাই। কিন্তু তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই—ভাবের ঘোর এমনই। এখনও সর্ব্বস্ব-বঞ্চিত হইয়াও সে গান্ধীমন্ত্র ত্যাগ করে নাই। অপর পক্ষে, যাহারা ঐরূপ ভাবোন্মাদনার বশবর্ত্তী হয় নাই, লাভের দিকটাই বরাবর লক্ষ্য রাখিয়াছি ন, তাহারাই গান্ধী-মহাত্মার প্রসাদে সর্ব্বসুখ ভোগ করিতেছে। কিন্তু ঐ ভাবের ঘোর কাটিবেই; বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-সুভাষচন্দ্রের জাতি বেশিদিন গান্ধীবাদের ঐ শুষ্ক-কঠিন অস্থিতে নিজের মুখনিঃসৃত রক্ত মাখাইয়া চর্ব্বণ-সুখ ভোগ করিতে পারিবে না। বঙ্কিমচন্দ্র যে মন্ত্রের আদিগুরু সেই প্রেম-মন্ত্রই বাঙালীর ধাতু-প্রকৃতির অনুকূল; হাজার বৎসরের সাধনায় উহাই তাহার কুলধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে, সেই মন্ত্রকে বঙ্কিমচন্দ্র কেবল যুগোপযোগী একটা নূতন তন্ত্রের দ্বারা নবীভূত করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা আছে। আমরা দেখিয়াছি, এই প্রেম খাঁটি মানবীয় হৃদয়বৃত্তি হইলেও ইহার মূলে একটা বিশিষ্ট সাধনার—সেই ভারতীয় সাধনার ধারা রহিয়াছে, কেবল, এযুগে তাহাতে আত্মার দিকটা বড় না হইয়া দেহের দিকটাও বড় হইয়াছে। তথাপি, আত্মাকে যদি বিশেষ করিয়া আর্য্যের সাধনবস্তু বলা যায়, তবে দেহটাকে অনার্য্যের সাধন-মন্ত্র বলা যাইতে পারে। আত্মার ধ্যানে যেমন অদ্বৈত-জ্ঞানের উদয় হয়, তেমনই দেহ-চেতনার মন্থনে প্রেম-নামক সেই অমৃত-নবনী ভাসিয়া উঠে। ভারতের সুদীর্ঘ সাধনার ইতিহাসও এই আত্মার সহিত দেহের, জ্ঞানের সহিত ভক্তের, তত্ত্বের সহিত রসের সমন্বয়ের ইতিহাস। সেই ইতিহাসের বর্ত্তমান অধ্যায়ে—ঐ প্রেম-সাধনায়—প্রকৃতির সহিত

পুরুষের যে গভীরতর, ঘনিষ্ঠতর মিলনের প্রয়োজন হইয়াছে, তাহার জন্য অপর সকল আর্য্যেতর জাতি অপেক্ষা এই অনার্য্য বাঙালীই অধিকতর উপযুক্ত, তাহার কারণ, ঐ দেহতত্ত্ব বাঙালীরই সাধনতত্ত্ব—বাঙালীর ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা অবৈদিক ; আর কোন জাতি প্রকৃতিশক্তিকে এমন পরা-শক্তিরূপে ভজনা করে নাই। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে ঐ প্রকৃতি-তন্ত্রের সহজিয়া-সাধক বাঙালীর কণ্ঠেই এমন দুইটি সাম-মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে—

শুনহে মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই ॥

[অর্থাৎ, মানুষ-হিসাবে মানুষেরই গৌরব—আত্মার গৌরব নয়]
এবং—

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যেজন
কেহ না চিনয়ে তারে।
প্রেমের আরতি যেজন জানয়ে
সেই সে চিনিতে পারে ॥

তাই আজিকার নবভারতধর্ম্মের গুরু হইয়াছে বাঙালী ; বঙ্কিমচন্দ্রই তাহার আদি ঋষি, এবং বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্র যথাক্রমে সেই যজ্ঞের সোম-আহরণ ও অগ্নি-চয়ন করিয়াছেন, সমগ্র ভারতকে সেই অগ্নিতে আহুতিদান করিতে হইবে। সেই বৈদিক সামযাগই বাঙালীর প্রতিভায় কি নব-রূপ ধারণ করিয়াছে!

ঐ যুগের ঐ ধাক্কা বা আঘাত অনুভব করিবার শক্তিও তখন বাঙলার বাহিরে আর কোথাও ছিল না, পরে যেখানে যেটুকু দেখা দিয়াছে, তাহা বাঙলা হইতে সংক্রামিত হইয়াছে—সে ভূমিকম্পের আদি কম্পন-ক্ষেত্র এই বাঙলাদেশ। ইহা এমনই সত্য যে, আজিও—এই প্রায় একশত বৎসর পরেও ভারতের আর কোন জাতির মধ্যে সেই ভারতীয় আত্মার সম্যক জাগরণ হয় নাই, বাঙলার পরে যদি কোথাও কিছু হইয়া থাকে—তাহা মহারাষ্ট্রে। বরং ভারতের জাতিসকল আরও আত্মভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের সেই শাশ্বত-সাধনা ও তাহার মূলগত সংস্কৃতি কোথাও অন্ধতামসিকতার মোহ সৃষ্টি করিয়াছে—সে যেন বাহিরের একটা বহুজীর্ণ অভ্যস্ত পরিচ্ছদ ; কোথাও সেই পরিচ্ছদ অতিশয় ধৌত-শুভ্র হইলেও, মানুষের চিত্ত অতিশয় মলিন, আত্মা পৌরুষহীন—কেবল মস্তিষ্কের তর্কশক্তি প্রখর অথচ বন্ধ্যা হইয়া আছে। কোথাও বা ইংরেজী-শিক্ষার প্রভাবে সমগ্র শিক্ষিতসমাজ আচারে ব্যবহারে, এমন কি ভাষাতেও ইঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অতিশয় বর্ত্তমানে বাঙালী সম্পর্ক-ত্যাগী যে নেতৃমণ্ডলের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তাহারাও ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলিয়া, পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্র ও পাশ্চাত্ত্য-সমাজের হুবহু অনুকরণে একটা অপ-ভারতের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, ভারতের সেই যুগসঙ্কটে—এক্ষণে যাহা পৃথিবীব্যাপী মন্বন্তরের আকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে—অন্ততঃ ভারতের উদ্ধারকল্পে, সনাতনের সহিত যুগের সঙ্গতিসাধনরূপ সেই মহত্তম কর্ম্মে, বাঙালী এ

পর্য্যন্ত প্রায় এককভাবে কি অসাধ্যসাধন করিয়াছে, এবং ভবিষ্যতের ভারত-ইতিহাসে সে কোন্ স্থান অধিকার করিতে পারিবে।

আমি এই প্রসঙ্গের আরম্ভ করিয়াছিলাম এক কবিকে লইয়া—কেবল এই প্রসঙ্গ কেন, আমার সমস্ত আলোচনাই বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-প্রতিভা ও সৃষ্টিকর্ম্ম সম্বন্ধে; এক্ষণে তাহারই একটি গূঢ়তত্ত্ব উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গ শেষ করিব। কবি-দৃষ্টি ব্যতিরেকে সৃষ্টির কোন অর্থই হয় না। কবিরাই এই সৃষ্টিকে কাব্যের আকারে পুনঃসৃষ্টি করিয়া আমাদের বোধগম্য করেন; আর কোন উপায়ে তাহা করা যায় না। যেখানেই সৃষ্টির অন্তর্গত মহানিয়মটির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সেইখানেই কাব্যসৃষ্টি হইয়াছে। আবার, সেই তত্ত্বকে জীবনে ও জগৎ-ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত করার যে প্রতিভা তাহাও কবি-প্রতিভা। এইজন্য বৈদিক ঋষিরা যেমন কবি, তেমনই সকল শ্রেষ্ঠ জগৎগুরুমাত্রেই কবি। অতএব যাহার এই কবিশক্তি নাই সে কখনই সৃষ্টির ধারা ধরিয়া তাহাতে সনাতনের সহিত যুগের সঙ্গতি বা সমন্বয় সাধন করিতে পারে না, তাহার সকল চেষ্টাই নিষ্ফল।

গন্ধীর চেষ্টাও নিষ্ফল হইয়াছে। ভারত কি সত্যই স্বাধান হইয়াছে? যদি হইয়াও থাকে, তবে তাহা কি—ঐ অহিংসা-ধর্ম্মের দ্বারা হইয়াছে? এই দুই প্রশ্নের কোনটারই উত্তর দুরূহ নয়; যদি আজ উত্তর দিতে বাধে, তবে কাল ইতিহাস কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবে না। কিন্তু শুধু স্বাধীন হওয়ার কথাই নয়, ভারতকে উদ্ধার করার কথাও বটে। যদি গান্ধী-মন্ত্রে ভারতের আত্মার উদ্ধার হইয়া থাকে, তবে আমি বঙ্কিম-প্রতিভার এই যে দীর্ঘ প্রশস্তিপাঠ করিতেছি, তাহা সর্ব্বৈব অকারণ; বঙ্কিমচন্দ্র ঋষি তো নহেনই—একজন স্বপ্নদ্রষ্টা কবি বা মোহান্ধ দেশ-প্রেমিক মাত্র। কিন্তু গান্ধী-মন্ত্রে ভারত কি সত্যই উদ্ধার হইয়াছে? যিনি বাংলার সেই নবযুগ-সংহিতাকে সম্পূর্ণ বাতিল করিয়া—বঙ্কিম-বিবেকানন্দ, এমন কি, রবীন্দ্রনাথকেও পাশ কাটাইয়া—এক নব-মহাভারত-রচনার ভার লইয়াছিলেন, তাঁহার সেই কর্ম্ম সফল হইয়াছে? ধর্ম্মের কথা নয়—ভক্তির কথা নয়, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ-কল্যাণের কথাও নয়—বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ ফলাফলের কথাই বলিতেছি; আশা বা বিশ্বাস নয়—প্রমাণের কথা; বর্ত্তমান কি তেমন কোন ভবিষ্যতের সূচনা করে? সে ভবিষ্যৎ যদি জগতের ভবিষ্যৎ হয়, তাহাতে ভারতের কি? ভারত তো মরিতে বসিয়াছে—মানুষের সহজ জ্ঞান তাহাই বলে। তবেই প্রশ্ন উঠে—গান্ধী কি কোন্ অর্থে স্রষ্টা? যে-মানুষ কালের গতি রোধ করিবার—প্রকৃতির মূল-প্রবৃত্তিকেও উড়াইয়া দিবার স্বপ্ন দেখে, সেই চিরন্তনী মাহেশ্বরী মায়াকে যেন পদাঘাত করিয়া তাহার উপরে আত্মমত প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, সে কি কিছু সৃষ্টি করিতে পারে? গান্ধী-মন্ত্রে ও বঙ্কিম-মন্ত্রে কত তফাৎ তাহা আমরা দেখিয়াছি, একটার ফল যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, আরেকটা এখনও ফলোম্মুখ হইয়া আছে। ভারতের যদি স্থায়ী কল্যাণ হয়, তবে ঐ স্বাজাত্যবাদের প্রেম-মন্ত্রেই তাহা হইবে; সেই প্রেম যে প্রসারশীল তাহাও বলিয়াছি; ঐ 'বন্দেমাতরম্'ই যে একদিন 'জয়হিন্দ্' হইয়া উঠিবে, তাহারও চাক্ষুষ প্রমাণ আমরা পাইয়াছি; যখন

তাহা হইবে তখন উহার আদি-ঋষিরূপে বঙ্কিমচন্দ্রকেই স্মরণ ও বরণ করিতে হইবে।

৫

বঙ্কিম-প্রতিভার মহত্ত্ব কোথায়—তাহারই আলোচনা করিলাম। সেই আলোচনায় আমি একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গি আশ্রয় করিয়াছি; কিন্তু উহা নূতন নয়, বরং পুরাতন—উহাই ভারতীয় পদ্ধতি; আমি নূতনের উপরে সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়াছি। কোন কিছুকে খণ্ড ভাবে দেখা—হিন্দুর 'দর্শন' নয়,—খণ্ডকে অখণ্ডের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে হইবে, বৃহত্তর কাল ও বিস্তৃততর পরিধিতে তাহাকে মেলিয়া ধরিয়া তাহার সত্য নিরূপণ করিতে হইবে। অতএব, যাহা-কিছুর বিচার করি না কেন— হউক সে সাহিত্য, ধর্ম্ম বা সমাজ, কিম্বা রাষ্ট্রনীতির প্রতিভা, ঐ এক দৃষ্টিতে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করিতে হইবে। এইজন্য আমি বঙ্কিম-প্রতিভাকেও —যাহাকে সাধারণতঃ একটা বড় সাহিত্যিক প্রতিভা বলা হইয়া থাকে—তাহাকেও সেই কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া দেখিতে ও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। একথা সত্য যে, সেই প্রতিভার প্রকাশ যে বিশেষ রীতিকে আশ্রয় করিয়াছে তাহার একটা বিশেষ নাম আছে—আমরা তাহাকে সাহিত্য বলি; সেইরূপ সৃষ্টিকর্ম্মে বঙ্কিমচন্দ্রের শক্তিও অসাধারণ। তথাপি সাহিত্যের সেই সংকীর্ণ গণ্ডি পার হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি গভীর ও দূরপ্রসারী ছিল, তাঁহার সেই সাহিত্য সৃষ্টিতেও— শুধু রসসৃষ্টি নয়, কোন্ বৃহত্তর সৃষ্টির ছায়া আছে—এবং তজ্জন্য সেই সাহিত্যও কোন্ পদবীতে আরোহণ করিয়াছে, আমি তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এজন্য এই আলোচনার প্রথম ভাগে ভারতের বিশিষ্ট সাধনা—যে সাধনা কোন জাতি বা যুগের সংকীর্ণ আদর্শে সীমাবদ্ধ নয়—সেই সার্ব্বভৌমিক শাশ্বত-সনাতনের একটু পরিচয় দিয়াছি; তাহাকেই ভারতীয় দৃষ্টি বলিয়াছি, তাহাই ঋষির দৃষ্টি। এইদিক দিয়া ভারতের সাধনা ও ভারতের ইতিহাস পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও জাতির ইতিহাস হইতে স্বতন্ত্র। তারপর বলিয়াছি—ঐ দৃষ্টি-অনুযায়ী যে সৃষ্টি, তাহাতে সেই ঋষির দৃষ্টিই কবির দৃষ্টিতে পরিণত হয়—কবি সেই সনাতনের সত্যকেই যুগ-বিশেষের আধারে একটা মূর্ত্তিদান করেন। ইহাই সৃষ্টিকর্ম্ম, সেই সৃষ্টিকর্ম্মের মূলে আছে সমন্বয়ের শক্তি। সেই সমন্বয় কাহাকে বলে,—কোন্ দুই-এর সমন্বয় করিতে হয়, আমি সকল প্রসঙ্গে সেই দুইয়ের উল্লেখ করিয়াছি। যত-কিছু দ্বন্দ্বকে—সেই প্রকৃতি ও পুরুষ, জড়-শক্তি ও পুরুষ চৈতন্যের—একই দ্বন্দ্বনামে অভিহিত করিয়াছি; উহাও ভারতীয় দর্শনের ভাষা। আবার; বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিও যেমন, তাঁহার সৃষ্টি-প্রতিভাও যে সেই ভারতীয় প্রতিভা, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমি, একদা এক যুগসঙ্কট নিরাকরণের জন্য ঐ ভারতীয় প্রতিভা যে একটি অপূর্ব্ব সাহিত্য-রীতির উদ্ভাবনা করিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্রকেও সেই পৌরাণিক রীতির অনুবর্ত্তী বলিয়াছি।

অতঃপর, এই আলোচনার দ্বিতীয় ভাগে, আমি প্রথমেই ভারতের এই নবযুগ

তাহার সমস্যাকে একটা সুস্পষ্ট আকারে ধরিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি, ভারতের পক্ষে সেই সঙ্কট কেমন তাহাও বলিয়াছি; এবারে সমন্বয়-সাধনের জন্য সেই ভারতীয় প্রতিভারও যে একটি বিশেষ শক্তি বা প্রেরণার প্রয়োজন হইয়াছিল—তথ্য ও তত্ত্ব উভয়-প্রমাণে, আমি সেই শক্তিকেই বঙ্কিম-প্রতিভার মূল প্রেরণা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছি—তাই এই দ্বিতীয়ভাগে আমি সেই প্রেম-শক্তিরই সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি। এ যুগের ঐ যুগ-রাক্ষসীকে বশীভূত করিতে হইলে—উহার ঐ একান্ত আধিভৌতিক আক্রমণ রোধ করিয়া ভারতকে আত্মস্থ করিতে হইলে—যে বস্তুটির প্রয়োজন, তাহা ঐ যুগ-প্রবৃত্তির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে; বিষ যেখানে বিষঘ্ন ঔষধও সেইখানে পাশাপাশি বাস করে, ইহাই সৃষ্টির নিয়ম। ইহাও স্বাভাবিক যে, বিষ যদি নূতন হয় তবে বিষঘ্ন ঔষধটাও নূতন হইবে। আমি উহারই নাম দিয়াছি—প্রেম। কিন্তু প্রেম বস্তুটা তো নূতন নয়—অন্ততঃ উহার বীজ মানুষের প্রকৃতিতে আদি হইতে বিদ্যমান আছে। প্রকৃতির সেই ধ্বংসলীলাকে পুরুষ ঐ প্রেমের দ্বারাই যুগে যুগে প্রতিহত করিতেছে; ওখানেও সেই দ্বন্দ্ব। একদিকে মৃত্যু, অপর দিকে অমৃত; একদিকে সংহার, অপর দিকে রক্ষণ; একদিকে হিংসা, অপর দিকে করুণা (অহিংসা নয়)। এমনও বলা যাইতে পারে যে, ঐরূপ নিত্য-সংগ্রাম সত্ত্বেও ঐ প্রেম বা করুণাই জয়ী হইয়া আছে, নহিলে সৃষ্টির ধারা অব্যাহত থাকিত না; অর্থাৎ ঐ প্রেমই সৃষ্টির মূলাধার। তথাপি এই প্রেমও যুগের প্রয়োজনে যুগোচিত রূপ ধারণ করে—তাহাকে একটা নূতন বস্তুই বলিতে হইবে। এবারকার এই বিষম যুগ-সঙ্কটে রক্ষা পাইবার সেই এক উপায়—সেই সমন্বয়-সাধনরূপ সৃষ্টিকর্ম্মের জন্য, ভারতীয় কবিকে এক নূতন প্রেমের ঋক্ রচনা করিতে হইয়াছে। এই প্রেমে আধ্যাত্মিক অপেক্ষা আধিভৌতিকের দাবিই অধিক; এ প্রেমের সাক্ষাৎ-পরিচয়ের নাম—স্বজাতি-প্রীতি, উহার রাশি-নাম—মানব-প্রেম। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রেমেরই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ও পুরাণকার কবি। এই প্রেমের আদর্শ ও তাহার সাধন-পদ্ধতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও আলোচনা আমি করিয়াছি, এবং ঐ প্রেমের প্রেরণা ব্যতিরেকে সেই কবিকর্ম্ম—যুগের সহিত সনাতনের সমন্বয়, প্রকৃতির সহিত পুরুষের, অর্থাৎ বাস্তবের সহিত আদর্শের সঙ্গতিসাধন যে সম্ভব নয়,—তাহা বুঝাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। অতি আধুনিক ইতিহাস হইতে তাহার প্রমাণও দিয়াছি; গান্ধীর অহিংসা-ধর্ম্ম যে একটা আংশিক তত্ত্ব, সেইজন্য উহা খাঁটি ভারতীয় প্রতিভার নিদর্শন নয়—উহাতে সেই সমন্বয়ের লেশমাত্র নাই, ইহাও আমি তত্ত্ব, যুক্তি ও তথ্যের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছি। ঐ গান্ধীবাদের নিষ্ফল পরিণামই বঙ্কিমচন্দ্রের সেই ঋষি-দৃষ্টির অব্যর্থতার সাক্ষ্য দিতেছে—যে উৎকৃষ্ট কল্পনা-শক্তিই কবিকে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ঋষি করিয়া তোলে, তাহা বঙ্কিমের ছিল, গান্ধীর ছিল না।

আমি আর একটি সত্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি, তাহা এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণা খাঁটি হিন্দু বা ভারতীয় প্রেরণা বলিয়াই তাহা পাশ্চাত্ত্য

পলিটিক্সকে—একটা আধ্যাত্মিক মন্ত্রের দ্বারা পাশ কাটাইবার চেষ্টা করে নাই, অর্থাৎ তাহার দিকে চোখ বুজিয়াই তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করে নাই; এবং তাহার ফলে, ঐ পলিটিক্স্‌কেই প্রকারান্তরে একমাত্র ভাবনা ও সাধনার বস্তু করিয়া তোলে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মমন্ত্রে যেটুকু পলিটিক্স্‌ আছে তাহা গৌণ, সেই মন্ত্রের সাধনায় যে রাজনৈতিক কর্ম্মনীতির প্রয়োজনও আছে তাহা ঐ মন্ত্রকে অতিক্রম করে না,—অর্থাৎ ধর্ম্মের ছদ্মবেশে পলিটিক্স্‌ই সর্ব্বস্ব হইয়া উঠে না। সেই মন্ত্র—আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটা শক্তিমন্ত্র, পৌরুষ-বীর্য্যের সাধন-মন্ত্র। তাহাতে আদৌ মানুষকেই মুখ্য করা হইয়াছে—সমাজনীতি বা রাষ্ট্র-নীতির ভাবনা পরে, মানুষকে 'মানুষ' করিয়া তোলাই আগে। এজন্য তাহাতে ব্রাহ্মণের চিত্তশুদ্ধি এবং ক্ষত্রিয়ের বাহুবল এই দুইয়ের সমান সাধনা আছে; অর্থাৎ উহাতেও সেই দেহ ও আত্মার—দুই পরস্পর-বিরোধী ধর্ম্মের—সমন্বয় আছে, একটাকে উচ্ছেদ করিয়া অপরটার প্রাধান্য-স্থাপন নাই। এই সমন্বয়ই হিন্দুর আবহমান কালের ধর্ম্মশাস্ত্রে স্বীকৃত ও বিহিত হইয়াছে। কিন্তু মধ্যযুগের সেই ধর্ম্মবিপ্লব ও তজ্জনিত সুদীর্ঘ মোহাবস্থার পর, আবার স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য এমন একটা উজ্জীবন-শক্তির প্রয়োজন হইয়াছে, যাহাকে সেই প্রাচীন ভারতীয় প্রেরণার অতিরিক্ত বলা যাইতে পারে; ইহাই সেই প্রেমশক্তি; ইহা যেমন নূতন, তেমনই অতিরিক্ত, কারণ উহা মূলে ভারতীয় হইলেও, উহার প্রবৃত্তি কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র, আমি সে আলোচনাও করিয়াছি।

এই আলোচনায় আমি গান্ধী-মন্ত্রের ও বঙ্কিম-মন্ত্রের যে বিরোধ তাহাই একটু বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শন করিয়াছি; এইরূপ প্রসঙ্গ যে অবান্তর নয়, উহা যে পলিটিক্সের বাদ-বিসম্বাদ নয়, তাহা বুদ্ধিমান পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। ঐ দুই ধর্ম্মের ideology সম্পূর্ণ বিপরীত। এইজন্যই বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্রের সেই স্বাজাত্য-মন্ত্রে যে জাতীয়-জাগরণ ও স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরব্ধ হইয়াছিল, এবং তাহাতেই সারা ভারত সাড়া দিয়াছিল, গান্ধী তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্ববর্তী ৩০ বৎসরের ইতিহাস একরূপ মুছিয়া ফেলিয়া, বাঙালীর ঐ সাধনা ও সাধন-মন্ত্রকে সম্পূর্ণ বাতিল করিয়া, ভারতকে এক নূতন পথে চালিত করিয়াছিলেন। সেই স্বাজাত্য-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সাধক এবং সেই সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ নেতাকে তিনি ত্রিপুরীর যুদ্ধে তাঁহার শিষ্যগণের দ্বারা পরাস্ত করিয়াছিলেন; তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্‌' তথা বাংলার সেই সাধনা ভারত হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে—বাঙালীও তাহার সেই ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। স্বাধীনতা-যজ্ঞে বাঙালীর সেই মহৎ অবদান যেমন প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, তেমনই বাঙালী-জাতিও ভারতের গান্ধীপন্থী সমাজে অপাংক্তেয় হইয়াছে। আমি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহাতে ব্যক্তিগত বা জাতিগত বিদ্বেষ নাই, অথবা বঙ্কিমচন্দ্রকে গান্ধীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক গুরুরূপে খাড়া করিবার অভিপ্রায়ও নাই। আমি বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐরূপ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বহু ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়া, তাঁহার সেই প্রতিভার মহত্ত্ব বিচার করিয়াছি; সে প্রতিভা যে ঐরূপ একটা

সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, তাহার প্রেরণা যে কত গূঢ় ও গভীর, সে দৃষ্টি যে কত দূরপ্রসারী, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। অতএব গান্ধীবাদের ঐ সমালোচনাকে তত্ত্ব-বিচার বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে, বঙ্কিম-প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার জন্যই আমাকে ঐ প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে হইয়াছে।

আরও একটি বিষয়ে আমাকে বারবার ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে—বাংলার সাধনা, বাঙালীর বৈশিষ্ট; তাহাও অবান্তর, অথবা মিথ্যা জাতি-গর্ব্বপ্রসূত নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা—কোন বড় প্রতিভাই—ভুঁইফোড় নয়; প্রতিভার কোন কোন লক্ষণ যতই দৈব বা অতিপ্রাকৃত বলিয়া বিবেচিত হউক,—উহার আবির্ভাবের যেমন একটা ঐতিহাসিক লগ্ন আছে, তেমনই উৎপত্তিরও একটা ভূমি বা ক্ষেত্র আছে; একটা বিশেষ জাতির স্বভাব বা প্রকৃতিতে সেই প্রতিভার গর্ভাধান হয়। বিশ্বজনীনতার যে উচ্চ ভাববাদ (Universalism), তাহা ঐরূপ প্রতিভার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে না—একরূপ অস্বীকার করিতেই বাধ্য হয়। বঙ্কিম-প্রতিভারও একটা মূল আছে, তাহা বাঙালী-জাতির প্রকৃতি ও তাহার বহুকালাগত সাধনার অন্তর্গূঢ় সংস্কার। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সেই জাতিগত সংস্কৃতিরই একটা পূর্ণপ্রস্ফুটিত রূপ। অতএব সেই প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় করিতে হইলে, এইরূপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও মান্য করিতে হইবে। এইজন্য আমি এই প্রবন্ধে বাঙালীর চরিত্র ও তাহার বিশিষ্ট সাধনার সম্বন্ধে সংক্ষেপে ও প্রাসঙ্গিকভাবে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। তাহাতে ভারতীয় সাধনার প্রভাবের কথাও যেমন আছে, তেমনই সে সাধনায় বাঙালীর দান কিরূপ, এবং ভারত-ইতিহাসের বর্ত্তমান অধ্যায়ে বাঙালীর ঐ জাতিগত সাধনা কি কারণে, কতখানি ফলপ্রসূ হইয়াছে ও হইবে, তাহারও বিচার করিয়াছি। আর একটা কারণ সম্প্রতি ঘটিয়াছে। বাঙালীকে তাহার বাঙালীত্ব, অ[illegible] পৃথক জাতি-ধর্ম্ম ভুলাইয়া, একটা রাষ্ট্রিক ঐক্য-চেতনায় আত্মবিলোপ করিবার জন্য বড়ই হাঁক-ডাক পড়িয়া গিয়াছে। ঐরূপ 'নেশন'-বাদ ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্র কিরূপ বিষময় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই পাইতেছি—একটা জাতি আর সকল জাতির উপরে প্রভুত্ব করিতে চায়! আমি বলিয়াছি, উহা ভারতীয় আদর্শের অতিশয় বিরুদ্ধ বলিয়াই জনগণের বুদ্ধিভেদ ঘটিয়াছে। ঐরূপ নিছক রাষ্ট্রনৈতিক একতাবন্ধন ভারতের পক্ষে একরূপ আত্মনিগ্রহ। যুরোপীয় আদর্শের দিক দিয়াও ঐ 'নেশন' সত্যকার নেশন নয়, কারণ, সেইরূপ [illegible]জাতিত্বের যে লক্ষণগুলি আবশ্যক তাহার কোনটাই উহাতে নাই। আবার, হিন্দু-সাধনা ও সংস্কৃতির বশে, ভারতের জাতিগুলা স্বতন্ত্র থাকিয়াও এমন একটা ঐক্যের ভাব পোষণ করে, যাহা ঐ নেশন সংজ্ঞার বহির্ভূত। অতএব আজ যদি রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনে সমগ্র ভারতে একটা ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে তাহার ভিত্তি হইবে অন্যরূপ। এ বিষয়ে আমি যথাস্থানে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ঐ যে 'প্রাদেশিকতা'র নামে একটা মিথ্যা ধূয়া তুলিয়া, এবং একটা কৃত্রিম একরাষ্ট্রের প্রলোভন দেখাইয়া, বাঙালীকে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট করা হইতেছে, উহার অর্থ আর কিছুই নহে—

রাজনৈতিক এক-শাসনের বা এক প্রভুত্বের প্রয়োজনে, বাঙালীকে ঐ রাষ্ট্রের দাসত্ব করিতে হইবে—রাষ্ট্রের সুবিধার জন্য তাহাকে জাতি-হিসাবে মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। ভারতীয় আদর্শের দিক দিয়া ইহার মত মিথ্যাচার আর কিছু হইতে পারে না। আমি ভারতের সেই অদ্বৈত-দৃষ্টির—সেই বহুর মধ্যে যে ঐক্যের উপলব্ধি, এবং তাহা হইতে যে প্রেমের অঙ্কুর ও পূর্ণ-বিকাশের কথা বলিয়াছি, তাহাতে ঐরূপ 'প্রাদেশিকতা'র সংস্কারই থাকিতে পারে না; ঐ পাপ-কথাটা যে এমন প্রসারলাভ করিয়াছে, তাহারও মূলে আছে ঐ 'নেশান'-বাদ। ঐরূপ 'নেশান'-বাদ যতদিন আছে, ততদিন ঐ 'প্রাদেশিকতা'ও থাকিবে। একদিকে বিষটার গুণকীর্ত্তন চাই, অপরদিকে সেই বিষেরই অবশ্যম্ভাবী ফলকে গালি দিতে হইবে—ইহার মত অদ্ভুত কথা কেহ শুনিয়াছে? যাহারা এইরূপ কথা বলে, তাহারা যেমন মূর্খ তেমনই ধর্ম্মহীন; বস্তুতঃ যে সকল স্বয়ংসিদ্ধ বাঙালী-নেতা বাঙালীকে ঐরূপ উপদেশ দেয়, তাহারা জাতিটাকে বিক্রয় করিয়া—হিন্দুস্থানী বণিক-রাজের দাসত্ব করিয়া—ধনশালী হইতে চায়; ঐ ধনলোভ ছাড়া, উহার মূলে আর কিছুই নাই। আসল কথা, ভারতের কল্যাণের জন্যই প্রত্যেক জাতিকে তাহার সর্ব্ববিধ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইবে, তবেই, সেই ভারতীয় সাধনা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইবে, সেই সমন্বয়ের সুমহান্ ঐক্যতান ভারতের জাতিসকলকে গভীরভাবে আশ্বস্ত করিবে। প্রত্যেক জাতির ঐ স্বাতন্ত্র্য-সাধনা বা স্বাতন্ত্র্যরক্ষার যে স্বাজাত্য-ধর্ম্ম—বঙ্কিমচন্দ্রের মন্ত্র তাহাই; তাহার দ্বারাই ভারতের কিরূপ কল্যাণ হইতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' তাহারই সোপান নির্দ্দেশ করিয়াছে—এই আলোচনার প্রায় আদ্যোপান্ত তাহারই ব্যাখ্যান বলা যাইতে পারে। বাঙালী যদি আর কোন ভারতীয় জাতির সহিত একাকার হইয়া যাইত, তবে কি ঐ প্রতিভার জন্ম হইত? এখনও বাঙালী যদি বাঙালী থাকিয়াই ঐ মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তবেই ভারতের মুক্তি হইবে। যদি সেই সত্যকার মুক্তি কখন হয়—শুধুই রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মুক্তি নয়—পূর্ণ আত্মিক মুক্তি তাহার হয়, তবে তাহা যে ঐ বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-সুভাষের প্রতিভায় ও তপস্যায় হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? আজ ভারতময় যে 'জয়-হিন্দ্'-রব উঠিয়াছে, তাহার বীজ ঐ 'বন্দে মাতরম্'; ঐ মন্ত্রের মধ্যেই বঙ্কিম-প্রতিভায় সমগ্র প্রেরণা সংহত হইয়া আছে—যেন একটি ঘনীভূত ভাব-বিন্দুতে সিন্ধুর অকূল-বিস্তার ধরা দিয়াছে!

সেই প্রতিভার মূলে আছে ভারতের সুচিরাগত সাধনার অন্তর্গূঢ় প্রেরণা; ভারত-ইতিহাসের সজ্ঞান ভাবনা; স্বজাতির চরিত্র সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি; অসামান্য কল্পনা-শক্তি; এবং সেই সকলেরও উপরে আছে প্রেম,—যে-প্রেম আদর্শকে উচ্চ ভাব-ভূমি হইতে জীবনের নিম্নভূমিতে নামাইয়া, তাহাকে সাধন-যোগ্য করিবার জন্য বাস্তবকে কখনও বিস্মৃত হয় না। ঐ বাস্তব-বুদ্ধিও ভারতীয় সাধকদের সাধন-মার্গকেই অনুসরণ করিয়াছে; বাঙালীর সাধনায়, ভারতের আগে

বাংলাকেই ইষ্টদেবতারূপে স্থাপন করার অসামান্য দূরদৃষ্টি ও বাস্তব-জ্ঞানের কথা আমি সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। অপর ভারতীয় জাতিসকলের পক্ষেও ঐ সাধন-পন্থাই যে প্রশস্ত তাহা বলিয়াছি—বাঙালীর প্রদর্শিত পথে তাহারাও চিত্তশুদ্ধির দ্বারা ঐরূপ প্রীতির সাধনা করিবে, তদ্দ্বারা নিজের জাতিকে প্রবুদ্ধ ও নিষ্পাপ করিবে; পরে ভারতের মহাজাতি-সমাজে পরস্পর পরমাত্মীয় হইয়া উঠিবে। বলা বাহুল্য, ঐ স্বাজাত্য বিলাতী পলিটিক্সের স্বাজাত্য নয়, কাজেই প্রাদেশিকতার কথা উঠিতেই পারে না।

এই যে প্রতিভার পরিচয় আমি আমার এই ক্ষুদ্র ও ক্ষীয়মাণ শক্তির সাহায্যে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিলাম—ইহা কেমন প্রতিভা? ইহা কি কেবল মণীষার—মননশক্তি ও মেধার—জ্ঞান-গবেষণার ও মৌলিক চিন্তাশক্তির প্রতিভা? না, উপন্যাস-রচনার সাহিত্যিক প্রতিভা? আমি ইহার কোন সংজ্ঞাই নির্দ্দেশ করিব না—উহাতে কোন লেবেল যুক্ত করিব না। যাঁহারা আমার এই সুদীর্ঘ আলোচনা ধৈর্য্য ও শ্রদ্ধা-সহকারে পাঠ করিবেন তাঁহারা অন্তরের মধ্যেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন, এ প্রতিভার মহত্ত্ব কোথায়। কিন্তু আমি আজিকার এই সমাজের বাঙালীর জন্যই ইহা লিখি নাই; এ আলোচনা আমি ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের জন্য রাখিয়া গেলাম—যদি কোন সত্য ইহাতে থাকে, তবে তাহারাই উপকৃত হইবে, যদি না থাকে সেজন্য দুঃখিত বা লজ্জিত হইবার ভয় নাই, কারণ তখন আমিও থাকিব না।

বৈশাখ ১৩৫৬

বঙ্কিম ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের যোগসূত্র

প্রশ্নটা হচ্ছে বঙ্কিম-সাহিত্য আর রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে কি না। আপনারা এরকম একটা প্রশ্নের কথা সব সময়ে চিন্তা করেন না বটে, কিন্তু প্রশ্ন উঠলেই আপনাদের এ বিষয়ে কৌতূহল হবে, কারণ ঐ দুই সাহিত্য যে বড় ভিন্ন বলে মনে হয়। হবারই কথা, রবীন্দ্রনাথের ভাবচিন্তার ধারা বঙ্কিমের চেয়ে যেন আরও এগিয়ে গেছে, কাজেই তাঁর সাহিত্য বঙ্কিমের থেকে স্বতন্ত্র হবে বৈকি। কিন্তু ঐ যে কথাটা বলেছি—'ভাব-চিন্তা এগিয়ে গিয়েছে'—ওরই ভিতরে একটা অর্থ রয়েছে। 'এগিয়ে যাওয়া' মানে একেবারে বদলে যাওয়া নয়, আগে যা ছিল তারই সূত্র ধরে আরও বিস্তৃত এবং বহুমুখী হয়ে ওঠা। সেই সূত্রটার নামই যোগসূত্র।

একথা সত্যি যে, ঐ প্রশ্নটা আদৌ সাহিত্যিক প্রশ্ন নয় অর্থাৎ এখানে সাহিত্যের রস বা রূপের বিচারই মুখ্য নয়। ওটা হচ্ছে সাহিত্যের ইতিহাস ঘটিত প্রশ্ন। ইতিহাসের দিক থেকে মেনে নিতেই হবে যে, একটা যুগের সঙ্গে তার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের যোগ আছেই;—বঙ্কিম-সাহিত্য একটা যুগের বিশিষ্ট এবং বড সাহিত্য; রবীন্দ্র-সাহিত্যও ঠিক তার পরের যুগের তেমনি একটা বড় ও বিশিষ্ট সাহিত্য; অতএব ঐ দুই সাহিত্যের মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকবেই। সেটা কেমন সূত্র তা সাহিত্যের ইতিহাস দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। যেগুলো কোন একটা যুগের প্রভাবে সাহিত্যের লক্ষণ এবং তার প্রেরণা হয়ে উঠে, সেইগুলোই সাহিত্যের ইতিহাসে বিচার করবার বিষয়। ঐ প্রেরণা পরের যুগে, একই ধারায় আরও বিকাশ পেতে পারে, তখন ঐ যোগসূত্রটাও খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবার এমনও হতে পারে, আগের যুগের ঐ প্রেরণা এবং পদ্ধতির একটা প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে, অর্থাৎ আগের সাহিত্যে যে ভাব ও চিন্তার ধারা ছিল, পরের সাহিত্যে ঠিক তারই সমালোচনা এমন কি বিরুদ্ধ আদর্শ দেখা দিয়েছে। সেখানেও, ইতিহাসের দিক দিয়ে একটা যোগসূত্র রয়েছে; কেন না আগের যুগের সেই ভাব-চিন্তা ও সেই আদর্শই পরবর্তী যুগের সাহিত্যকে বিপরীতভাবে ভাবিত করেছে। তাহলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—একটা বড় সাহিত্য যদি আর একটা বড় সাহিত্যের পরে আসে, তাহ'লে দুইয়ের মধ্যে একটা না একটা যোগসূত্র থাকিবেই। বঙ্কিম-সাহিত্য ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যেও তা' আছে—কিন্তু সেটা কি রকম?

প্রথমে ঐ প্রতিক্রিয়ার কথাই বলি। বঙ্কিম-সাহিত্যের ভাব ও চিন্তাগত আদর্শের সঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গির অনেক জায়গায় একটা স্পষ্ট

বিরোধিতা আছে। *এই বিরোধিতাই আমরা একালে স্পষ্ট অনুভব করি।* বঙ্কিমচন্দ্র দেশ ও জাতির উন্নতি-চিন্তা করেছিলেন যে আদর্শ এবং যে চিন্তাভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে—বেশ দেখতে পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের আদর্শ তার বিপরীত; রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দীক্ষা এবং তার নিজস্ব মৌলিক ভাবদৃষ্টি এর জন্যে দায়ী বটে; কিন্তু ঐ কালের সাহিত্যিক-ইতিহাস আলোচনা করলেই বুঝতে পারা যাবে—বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ বয়সের ধর্ম্মমত এবং তাঁর যুক্তি সিদ্ধান্তগুলো রবীন্দ্রনাথের সেই ভিন্নতর ভাব প্রকৃতিকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তা ধর্ম্মের মূলে সমাজধর্ম্মের প্রতি যে অত্যধিক মমতা ছিল, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিধর্ম্মকে সেইটেই বেশী করে আঘাত করল; ফলে রবীন্দ্র-সাহিত্য সমাজ নিরপেক্ষ একটা ব্যক্তি সতন্ত্র আদর্শের লীলাভূমি হয়ে উঠল। আমি একেই প্রতিক্রিয়া নাম দিয়েছি—তার একটা দৃষ্টান্ত দিলাম। বঙ্কিম-সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ওটাও একটা বড় যোগসূত্র।

এইবার আর এক ধরনের যোগসূত্রের সন্ধান করব। এই যোগসূত্র খাঁটি সাহিত্যিক—অর্থাৎ ভাবচিন্তা বা মত-সংক্রান্ত কিছু নয়—নিজ সাহিত্যের ভিৎ-নির্ম্মাণে একজন আর একজনকে কতটা অনুসরণ বা অনুকরণ করেছিলেন, তারি কথা। প্রথমেই আপনাদের মনে করিয়ে দিই যে, বাংলা-সাহিত্যে একেবারে ভিৎ-পত্তন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র—সেখানে তিনি খাঁটি সাহিত্যিক আদর্শই স্থাপন করেছিলেন; তার জন্যে তিনি সাহিত্যের প্রধান বাহন গদ্যের ভাষাকে একরকম মুক্তিদান করেছিলেন—ভাষার প্রাণবস্তু যে ইডিয়ম (Idiom), তাকে পণ্ডিতী শব্দযোজনার সঙ্গে মিলিয়ে তিনি একটি সর্ব্বভাব প্রকাশক্ষম গদ্যভাষার পথ প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। এই ভাষাই হ'ল নবসাহিত্যের প্রতিষ্ঠাভূমি—এর উপরে, এবং একেই আবশ্যকমত নানান ছাঁচে ঢেলে, সাহিত্যের যতকিছু সৃষ্টিকর্ম্ম করা সম্ভব হবে। রবীন্দ্রনাথ শেষের দিকে যেমনই হোক—আগের দিকে, এমন কি, তাঁর সাহিত্যের পূর্ণ-যৌবন পর্য্যন্ত, বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভাষার আদর্শটি ত্যাগ করেননি—কেবল তার উপরে তাঁর ব্যক্তিগত ষ্টাইলের ছাপ দিয়ে দিয়েছিলেন। এটা একটা বড় কাজ, কারণ, এর থেকেই প্রমাণ হয় যে, সাহিত্যের ভাববস্তু যতই বিচিত্র হোক, তার মূল আধার বা বাহন ঐ ভাষাটা রবীন্দ্র-সাহিত্যেও অব্যাহত রয়েছে, এর থেকে সাহিত্যবিদ্ মাত্রেই বুঝতে পারবেন যে, বঙ্কিম-সাহিত্য আর রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে সহসা একটা ছেদ পড়েনি—বরং একটা বড় যোগসূত্র বিদ্যমান ছিল। আগেই বলেছি, একেই বলে খাঁটি সাহিত্যিক যোগসূত্র।

আর একটা যোগসূত্রের কথা বলব—সে হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-ব্রত এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ব্রত, এই দুইয়ের মধ্যে একটা **Continuity** বা

অবিচ্ছিন্নতা। অনেকে হয়তো এটা লক্ষ্য করেন নি, অথচ এইটেই বাংলা সাহিত্যের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় কাজ। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের হাত থেকে সে যুগের সেই সাহিত্যযজ্ঞের অগ্নিপাত্রটি—তখনো দুর্গম সেই যাত্রা-পথের দীপবর্ত্তিকাটি নিজের হাতে নিয়েছিলেন। কথাটা এখনই বুঝিয়ে বলছি। বঙ্কিমচন্দ্রই যে নব্য বাংলা সাহিত্যের পত্তন করেছিলেন, তার একটা বড় প্রমাণ এই যে, তিনিই সর্ব্বপ্রথম সাহিত্যের সর্ব্ববিভাগকে—ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজ, ধর্ম্ম, কাব্য-সমালোচনা প্রভৃতিকে—একই সাহিত্য-ব্রতের অধীন বা অঙ্গীভূত করে সাহিত্যের একটা সর্ব্বাঙ্গীন রূপ দেশবাসীর সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন। শুধু তাই নয়, সে যুগের বিক্ষিপ্ত সাহিত্য চর্চ্চাকে সংঘবদ্ধ করবার জন্যে 'বঙ্গদর্শন' নামে যুগান্তরকারী পত্রিকা প্রকাশিত করে নিজেই সব্যসাচী বা দশভূজার মত সাহিত্যের সকল বিভাগে তাঁর প্রতিভাকে নিয়োজিত করেছিলেন। এ কাজ করবার মত শক্তি আর কারো ছিল না, সম্ভবও নয়; কিন্তু না করলেও বাংলা সাহিত্য অচল হয়ে থাকে। অতএব সে যুগে সাহিত্যের একজন নায়ক চাই, এবং তাকে একাই একশো হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের এই সাধক-মূর্ত্তি দেখেছিলেন, এবং বঙ্কিমচন্দ্রেরই সেই সাহিত্য-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি নিজের প্রতিভাকেও দৃঢ় ও প্রশস্ত করবার জন্যে তাঁর সাহিত্য-সাধনায় কোন বিদ্যাকেই বাদ দেন নি—বঙ্কিম-সাহিত্যের যে ফল-ফুলের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, তিনি সেগুলিকে বিকশিত ও পল্লবিত করে তুলেছিলেন! এখানে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। অতএব, এখানেও একটা যোগসূত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

আজকের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমি কয়েকটি সাধারণ যোগসূত্রের উল্লেখ করলাম। আরও সূক্ষ্ম সাহিত্যিক যোগসূত্র আবিষ্কার করা যেতে পারে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের খুব গোড়ার দিকে, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অপরিণত অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-রীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। কিন্তু সে প্রভাবের কোন মূল্য নেই। আবার, রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের রচনাতেও এমন দু'চারটি ভাবসূত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাতে রবীন্দ্রনাথকে উনবিংশ-শতাব্দীর সেই বঙ্কিম যুগেরই যুগন্ধর বলে নির্দ্দেশ করা যেতে পারে। তারপর, স্বদেশী-যুগের রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে স্বাদেশিকতার প্রবল প্রেরণা আছে, তারও অনেকখানি বঙ্কিমী আদর্শের সঙ্গে মেলে। কিন্তু এই সব চিন্তা ও ভাবধারা বিশ্লেষণ করে যা পাওয়া যায় তার থেকেই আমি বঙ্কিম-সাহিত্য ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের যোগসূত্র আবিষ্কার করব না। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, এবং যে বিশুদ্ধ সাহিত্য-নীতির প্রবর্ত্তন করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে শ্রদ্ধা সহকারে বরণ করে বাংলা সাহিত্যের জাতি ও কুল রক্ষা করেছিলেন—এই কথাটাই আমার আসল কথা রবীন্দ্র-সাহিত্য ও বঙ্কিম-সাহিত্যের মধ্যে এইটে সবচেয়ে বড় যোগসূত্র।